।। দ্বিতীয় অধ্যায় ।।

দার্জিলিঙ :

আদিমকাল থেকে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির পরিচয় । প্রকৃতিকে আশ্রয় করেই মানুষের যাত্রা এবং বাঁচা । তার মনন ও মেধার শাশ্বতরূপ বিকশিত হয়েছে প্রকৃতির বিস্তারিত প্রেক্ষাপটে । সমগ্র পাহাড় বৃক্ষ লতা পাতা কবি ও সাহিত্যিককে কালের অঙ্গনে সৃষ্টির মাধুর্য উপহার দিয়েছে । বিশ্বকবি রবী-দ্রনাথ ঠাকুরের ক্ষেত্রে তার কোন ব্যতিক্রম নেই । তাঁর বহুমুখী প্রতিভা তার সৃষ্টিরস সংগ্রহ করেছে জোড়া সাঁকোর ঠাকুর বংশের যুগনি:সৃত রসধারায় । কি-তু তাঁর সৃষ্টির প্রতিমাগুলি বর্ণময় হয়েছে প্রকৃতি ও পরিবেশের মধুর স্পর্শে । এই স্পর্শ পেয়েই রবী-দ্র বীণায় উঠেছে অপরূপ ঝংকার ।

রবী-দ্রনাথের কবিতায়, গানে, চিত্রে ও উপন্যাসে পাহাড় প্রকৃতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায় । তাঁর পাহাড়ের আকর্ষণ ছোটবেলা থেকে ছিল । পুকুর খনন করার সময় মাটি পুকুরপাড়ের উপর জমা করা হয় । ঐ মাটির ঢিবিকে পাহাড় ভেবে তিনি একদা আনন্দ পেয়েছিলেন । তারই বাস্তব অনুভূতি এবং প্রথম পাহাড় দর্শন এই প্রস্তাবনায় উল্লেখ করা যেতে পারে ।

কবির পইতা উপলক্ষে মাথা মুড়ানো হল । তিনি ইস্কুলে যাবেন কেমন করে, সেই ভাবনা প্রবল আকার ধারণ করেছিল । এমন সময় তাঁর পিতা জিজ্ঞাসা করলেন যে কবি তাঁর সঙ্গে হিমালয় ভ্রমণে যেতে চান কি না ! এই কথার উত্তর তাঁর ভাষায়—

"'চাই' এই কথাটা যদি চীৎকার করিয়া আকাশ ফাটাইয়া বলিতে পারিতাম, তবে মনের ভাবের উপযুক্ত উত্তর হইত । কোথায় বেঙ্গল একাডেমি আর কোথায় হিমালয় ।"

জীবনস্মৃতির 'হিমালয় যাত্রা'[১] পর্বে কবির ডালহৌসি পাহাড়ে যাত্রা স্মরণীয় । তাঁর কথা তুলে ধরা যাক । "অমৃতসরে মাসখানেক ছিলাম । সেখান হইতে চৈত্রমাসের শেষে ড্যালহৌসি পাহাড়ে যাত্রা করা গেল । অমৃতসরে মাস আর কাটিতেছিল না । হিমালয়ের আহ্বান আমাকে অস্থির করিয়া তুলিতেছিল ।

যখন ঝাঁপানে করিয়া পাহাড়ে উঠিতেছিলাম তখন পর্বতের উপত্যকা অধিত্যকাদেশে নানাবিধ চৈত্রালি ফসলে স্তরে স্তরে পঙ্‌ক্তি-তে পঙ্‌ক্তি-তে সৌ-দর্যের আগুন লাগিয়া গিয়াছিল । আমরা প্রাতকালেই দুধ রুটি খাইয়া বাহির হইতাম এবং অপরাহ্নে

ডাকবাংলায় আশ্রয় লইতাম। সমস্ত দিন আমার দুই চোখের বিরাম ছিল না — পাছে কিছু একটা এড়াইয়া যায়, এই আমার ভয়। যেখানে পাহাড়ের কোনো কোণে পথের কোনো বাঁকে, পল্লবভারাচ্ছন্ন বনস্পতির দল নিবিড় ছায়া রচনা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং ধ্যানরত বৃদ্ধ তপস্বীদের কোলের কাছে লীলাময়ী মুনিকন্যাদের মতো দুই-একটি ঝরণার ধারা সেই ছায়াতল দিয়া শৈবালাচ্ছন্ন কালো পাথরগুলোর গা বাহিয়া ঘনশীতল অন্ধকারের নিভৃত নেপথ্য হইতে কল্ কল্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে সেখানে ঝাঁপানিরা ঝাঁপান নামাইয়া বিশ্রাম করিত। আমি লুব্ধভাবে মনে করিতাম, এ সমস্ত জায়গা আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে হইতেছে কেন। এইখানে থাকিলেই তো হয়।"

কবি এক-একদিন দুপুরবেলায় লাঠি হাতে একলা এক পাহাড় থেকে আর এক পাহাড়ে চলে যেতেন। তাঁর পিতা তাতে কোন উদ্‌বেগ প্রকাশ করতেন না। পরবর্তীকালে পাহাড়ের সান্নিধ্য তাঁকে বার বার টেনেছে। পাহাড় তাঁর কাছে শুধু প্রকৃতির একটি অংশ মাত্র নয়, তাঁর জীবনবোধের এক অধ্যায়। বালক রবীন্দ্রনাথের ড্যালহৌসি পাহাড় পরিভ্রমণের আনন্দ ও উচ্ছ্বাস আমরা লক্ষ্য করেছি। এই পাহাড় ভ্রমণের আরো অনেক ঘটনা রবীন্দ্রনাথের কৈশোর থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত বিদ্যমান। দার্জিলিঙ ভ্রমণ তার মধ্যে অন্যতম। দার্জিলিঙ যাওয়ার পথে শিলিগুড়ি। পুরানো আমলের শিলিগুড়ি একটা নগণ্য গ্রাম ছিল। দার্জিলিঙ যাওয়ার সুবিধার জন্য শিলিগুড়ি পর্যন্ত রেললাইন পাতা হয়। শেয়ালদা থেকে রাণাঘাট পর্যন্ত রেলগাড়ির পত্তন হয় ১৮৬২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন এক বছর চার মাস। ১৮৬২ সালের ১৫ নভেম্বর মধ্যেই পোড়াদহ পর্যন্ত ট্রেন চলল। ১৮৭৭ সালের ২৮ আগস্ট তৎকালীন উত্তরবঙ্গ স্টেট রেলওয়ে সারা ঘাট থেকে কয়েক মাইল উত্তর পূবের আত্রাই থেকে জলপাইগুড়ি পর্যন্ত ট্রেন চালায়। ১৮৬৯ সাল থেকে ১৮৭৭ সাল এই সময়ের মধ্যে ভ্রমণকারীরা দুভাবে শিলিগুড়ি পৌঁছতে পারতেন। প্রথমে ই আই আর ট্রেনে করে সাহেব গঞ্জ গিয়ে রাস্তা ধরে শিলিগুড়ি এবং সেখান থেকে টাঙ্গায় করে টুং পর্যন্ত। অন্যভাবে ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের ট্রেনে শেয়ালদা থেকে পোড়াদহ, সেখান থেকে কিছুদূর হেঁটে ভ্যাড়ামারা পৌঁছে নদী পার হয়ে সারা-য় (সাঁড়া) গিয়ে বাকীটা হেঁটে যেতে হত। এই রেলওয়ের চারটি শ্রেণী ছিল। চতুর্থ শ্রেণীতে বসবার বেঞ্চ ছিল না। লোকে বিছানা পেতে বসত। সেখান থেকে বাইরের কিছুই দেখা যেত না। ১৮৭৭ সালে

অপর পারে পৌঁছে আত্রাই পর্য্যন্ত হাঁটতে হত, তারপর সেখান থেকে ট্রেনে করে শিলিগুড়ি যাওয়া যেত। ১৮৮৩ সালে পোড়াদহ থেকে দামুকিয়া ঘাট পর্য্যন্ত রেললাইন পাতার পর হাঁটার দূরত্ব আরও কমে গেল। এইভাবে আস্তে আস্তে দার্জিলিঙ যাওয়ার পথ সহজ হয়ে উঠতে লাগল, আর শিলিগুড়ির প্রাধান্য ক্রমশ: বাড়তে লাগল। তবে শিলিগুড়ি ছিল দার্জিলিঙ যাওয়ার পথে বদলি হওয়ার ষ্টেশন। কলকাতা থেকে দার্জিলিঙ যাতায়াতের মুখ্য মাধ্যম ছিল রেলওয়ে। ইষ্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের এজেন্ট ছিলেন ফ্র্যাংকলিন প্রেস্টেজ (Frankline Prestage) । ১৮৭৮ সালে ১১ আগষ্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল : " Proposal of a Steam tramway from Siligoree to Darjeeling. " আনুমানিক খরচ ধরা হয়েছিল, প্রতি মাইল তিন হাজার পাউণ্ড। এই বছরেই কলকাতার গি মেটাল অ্যাণ্ড রামসে কোম্পানিকে শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিঙ পর্য্যন্ত ট্রামওয়ে তৈরীর ভার দেওয়া হয়। ঐ বছরের শেষে জামালপুর ওয়ার্কশপে টয়ট্রেনের প্রথম ইঞ্জিন তৈরী হয়ে গেল। তার নাম দেওয়া হল 'টাইনি' (Tiny) । ঐ সময়ে গয়াবাড়ি থেকে দিল্ডা পাহাড় পর্য্যন্ত ট্রাম লাইন পাতা হল। টাইনিকে প্রথম কাজে লাগানো হয় ১৮৮০ সালের মার্চ মাসে। যখন ভাইসরয় লর্ড লিটন দার্জিলিঙে এলেন, তখন ক্ষুদে রেললাইনের মাত্র ১৮ মাইল সম্পূর্ণ হয়েছে। ক্ষুদে রেলের ক্ষুদে ইঞ্জিন 'টাইনি' (Tiny) কিন্তু লাট সাহেবের প্রচুর মালপত্র টানতে পারেনি। শেষ পর্য্যন্ত 'ম্যান পাওয়ার'কে কাজে লাগাতে হল। লাইন খোলার তারিখগুলি এই রকম :

ক. শিলিগুড়ি থেকে কার্সিয়াং ২৮.৮.১৮৮০
খ. কার্সিয়াং থেকে সোনাদা ১.২.১৮৮১
গ. সোনাদা থেকে ঘুম ৪.৪.১৮৮১
ঘ. ঘুম থেকে দার্জিলিঙ ৪.৭.১৮৮১

এই সময় দার্জিলিঙ যাওয়া খুব সহজ ছিল না। সে কথা আমাদের জানা। পাহাড়ে উঠতে গরুর গাড়ি, টাট্টু, পাল্কী ব্যবহৃত হত। ১৮৮২ সালে বড় ট্রেন শেয়ালদা থেকে বিকাল ৪টায় ছাড়ত, দামুকিয়ায় (পদ্মার পাড়ে) পৌঁছাতে রাত ১টায়। দামুকিয়া থেকে সারাঘাট এবং তারপর দার্জিলিঙের পর্য্যটনের সঙ্গী 'টাইনি'। এই সময় শিলিগুড়ির জনবসতি নগণ্য ছিল। বাড়ীঘরের সংখ্যা সীমিত। জঙ্গলে ঘেরা। প্রধান রাস্তা বলতে হিলকার্ট ছিল। এই রাস্তার মাঝ বরাবর টাইনির রাস্তা বা ক্ষুদে রেলপথ (D.H.R) ছিল। হিলকার্টের পাশে মুষ্টিমেয় কয়েকটি দোকান ছিল।

মহান-দা ব্রীজটি ছিল লোহার । তারই উপর দিয়ে টাইনি যেত । শিলিগুড়ি টাউন ষ্টেশন তখন শিলিগুড়ির প্রধান ষ্টেশন । মহান-দা পেরোলেই জঙ্গল —শুক্না লগোয়া শুক্না ষ্টেশন ছাড়লেই বাঘ , হরিণ , বানর , হাতির দল চোখে পড়ত । হাতির দল ট্রেন অবরোধ করে দাঁড়াত । এখন প্রায়ই এমন ঘটনা ঘটে রাজাভাতখাওয়া জঙ্গলে । 'মিটার গেজ' ট্রেনকে থামিয়ে দেয় । রেলপথের উপর দাঁড়িয়ে থাকে । এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে , জঙ্গলের মধ্য দিয়ে 'টাইনি'র বীরদর্পে এগিয়ে যাওয়া আনন্দের বিষয় ছিল । এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় । প্রকৃতির অপরূপলীলা ও ভালবাসা মানুষকে কাছে টেনেছে ।

রবী-দ্র-সৃষ্টি সমীক্ষায় দেখা গেছে , রবী-দ্রনাথের মনের গভীরে কিছু কিছু প্রভাব পড়েছে —কখনো পরিবেশ , কখনো কোন ব্যক্তি- বা ঘটনা । তাঁর পাহাড়ের উপর একটা আকর্ষণ কৈশোর থেকে পরিলক্ষিত হয়েছে । এই আকর্ষণই তাঁকে বার বার পাহাড়ে পৌঁছে দিয়েছে । পাহাড় ও তার সংলগ্ন প্রকৃতি তাঁকে অন্য জগতে নিয়ে গেছে । তাঁর সাহিত্য কর্মের শাখা প্রশাখায় সে প্রভাব বিদ্যমান । বলা বাহুল্য , হিমালয়ের দীর্ঘ ছায়ায় তিনি ঋণবদ্ধ । জীবনের প্রথম থেকে শেষ বয়স পর্যন্ত । দার্জিলিঙে বেশ কয়েকবার এসেছেন এবং কিছুদিন করে থেকেছেন । এই অবস্থানের স্মরণে তাঁর রচনা ও চিঠি ।

Lt. General Lloyd দার্জিলিঙ আবিষ্কার করেছিলেন । ইল্যা-ডকে হিমালয়ে বসিয়ে দিতে চেয়েছিলেন বিদেশীরা । ইতিহাসের দীর্ঘরেখায় এই শহরের রূপান্তর লক্ষ্য করা গেছে । প্রাকৃতিক পরিবেশ ও শীতকালের কাঞ্চনজঙ্ঘা কে উপলব্ধির জন্যই যেন এতগুলি পাহাড় ডিঙিয়ে যাওয়া ।

জ্যোতিরি-দ্রনাথ সম্ভবত কার্তিক মাসের শুরুতেই স-ত্রীক দার্জিলিঙ বেড়াতে যান ।(এই বছর ৩ কার্তিক ১২৮১ , বৃহস্পতিবার ১৯ অক্টোবর সপ্তমী পূজার দিন ।) পুরো মাসটিই তাঁরা সেখানে কাটান , ১১ কার্তিক (শনিবার ৪ নভেম্বর) এর পর কিছুদিন সেখানে ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় ঐ দিন কলকাতা থেকে দার্জিলিঙে জ্যোতিরি-দ্রনাথকে একটি চিঠি পাঠানোর হিসাব থেকে । রবী-দ্রনাথ জ্যোতিরি-দ্রনাথ ও কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে দার্জিলিঙ গিয়েছিলেন । শ্রাবণ মাসে কাদম্বরী দেবী কিছু

অসুস্থ হয়ে পড়েন, ক্যাশবহি-র হিসাবে দেখা যায়: "শ্রীমতী নূতন বধূ ঠাকুরানীর পীড়ার জন্য নীল মাধব (হালদার) ডাক্তারকে আনিতে ...১২ শ্রাবণের এক বৌচর ২"। হয়তো এই অসুস্থতার পর বায়ু-পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে দার্জিলিঙ যাত্রা করা হয়। তাছাড়া দেবেন্দ্রনাথের মতই শারদীয়া পূজার সময়ে দেশভ্রমণে বহির্গত হওয়ার অভ্যাস জ্যোতিরিন্দ্রনাথও আয়ত্ত করেছিলেন। এই ভ্রমণ সেই অভ্যাস-বশতও হয়ে থাকতে পারে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের খোঁজও আর একটি কারণ। এই সময় রবীন্দ্রনাথের বয়স একুশ বছর পাঁচ মাস। বিয়ে হয়নি। দাদা বৌদির সঙ্গে শহর থেকে দূরে "রোজভিলা" নামে একটি বাড়ীতে তাঁরা ওঠেন। দার্জিলিঙ শহরে প্রবেশের মুখে বর্তমান আজ আর্ট গ্যালারীর পাশ দিয়ে প্রায় ৫০০ ফুট নীচে উদয় নারায়ণ রোড ধরে নেমে যেতে হবে রোজভিলায়। বাড়ীটির চেহারাই বলে দেবে বয়স। এখান থেকে দার্জিলিঙের পুরো অংশ দেখা যায়। তাছাড়া সান্দাকফু-ফালুট তো বটেই। এই এলাকাকে ওকল্যান্ড বলা হয়। কারণ এক সময় এখানে ওক গাছের প্রাচুর্য ছিল। ওক গাছ সরিয়ে বসতি। বর্তমান রোজ ব্যাঙ্ক বাড়ীটি রোজভিলার নৈকট্য বুঝিয়ে দেবে। রোজ ব্যাঙ্কের নীচে বর্ধমান মহারাজার প্যালেস। রোজ ব্যাঙ্ক অঞ্চলে বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের বাড়ীগুলি ছিল। শুধু শহরে নয়, দার্জিলিঙ জেলায় বহু সম্পত্তি ছিল। ১৮৫০ সালে দার্জিলিঙ স্টেশনের নিকটবর্তী এলাকা তিনি নিয়ে নেন। এই রোজব্যাঙ্ক এলাকার ঠিক আধ-মাইল উত্তরে ভিকটোরিয়া জলপ্রপাত। এই স্থানটিকে ছোট কাকঝোরাও বলে। আবার অনেকে রাজবাড়ী এলাকাও বলে।

কলকাতা শহরের কোলাহল থেকে সরে থাকা এবং শহরের সৌন্দর্য অপেক্ষা হিমালয়ের সৌন্দর্য অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হবে বলে কবির মনে হন। দার্জিলিঙের শারৎকালের তুষার শুভ্র চিরনবীন কাঞ্চনজঙ্ঘা, মেঘ, ঝরনার ধারা, ঝাউ, দেবদারু পাইন, ওক আর হিমেল হাওয়া কবিকে আপ্লুত করল। তাঁর দার্জিলিঙ ১৮৮২ সালের অক্টোবরে আসার আগেই নিম্নলিখিত বাড়ীগুলি তৈরী হয়ে নিয়েছিল।

১৭৬৫ — অবজার ভেটরি হিলের বুদ্ধমন্দির

১৮৪৩ — সেন্ট অ্যানড্রুস চার্চ

১৮৪৭ — লোরেটো কনভেন্ট

১৮৪৮ — জলা পাহাড়ের স্বাস্থ্য উদ্ধার কেন্দ্র

১৮৫১ — হিন্দু মন্দির

১৮৫২—৬২ — সেন্ট পলস্ স্কুল - জলাপাহাড়

১৮৬৫ — কবরখানা (পুরনো)

১৮৬৫ — জেল

১৮৬৭ — জলাপাহাড় ও কাটাপাহাড় সেনানিবাস

১৮৬৮ — দার্জিলিঙ প্ল্যান্টার্স ক্লাব

১৮৬৮ — কনভেন্ট কবরখানা

১৮৬৯ — ইউনিয়ন চ্যাপেল

১৮৭০ — দাতব্য চিকিৎসালয়

১৮৭৪ — ভুটিয়া বোর্ডিং স্কুল

১৮৭৬ — ঘুম এর বুদ্ধ মন্দির

১৮৭৭ — বার্চ হিল পার্ক

১৮৭৮ — লয়েড বোটানিক গার্ডেন

১৮৭৯ — বুদ্ধমন্দির ভুটিয়া বস্তি

১৮৭৯ — সেন্ট জোসেফ চার্চ – জলাপাহাড়

১৮৮০ — ব্রাহ্মমন্দির

এই সব প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের দর্শনীয় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে । আর সঙ্গে নিয়ে আছে দার্জিলিঙের ইতিহাস ।

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের 'পর ,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাত-পাখির গান ।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই সময় প্রভাত সংগীতের কবিতা লিখে চলেছেন । তিনি কলকাতা থাকার সময় গঙ্গার ধারে বসে সন্ধ্যা সংগীত ছাড়া কিছু কিছু পদ্য লিখেছেন ।

সন্ধ্যা সঙ্গীতের কেন্দ্রগত চেতনা বেদনাবোধ । 'সন্ধ্যা' কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ সন্ধ্যার নিকট নিজের দুঃখের কথা জানাচ্ছেন ।

কবি বলছেন :

ব্যথা বড়ো বাজিয়াছে প্রাণ ,
সন্ধ্যা তুই ধীরে ধীরে আয় ।

*** *** ***

সঙ্গী হারা হৃদয় আমার
তোর বুকে লুকাইতে চায় ।

মোহিতচন্দ্র সেন (সম্পাদিত) রবীন্দ্রনাথের কাব্য গ্রন্থাবলীতে সন্ধ্যা সঙ্গীতের বিষাদ , বেদনা ও নৈরাশ্যজনিত কবিতাবলীকে "হৃদয়ারণ্য" বলে আখ্যা দিয়েছিলেন । কবি রবীন্দ্রনাথ সেই কবিতাগুচ্ছের প্রবেশক হিসাবে যে কবিতাটি লিখেছিলেন , তার প্রথম ছত্রটি — "কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে ।" সন্ধ্যা সঙ্গীতের এই বেদনা এক রকম আত্মপ্রকাশের বেদনা-পরিণতিলাভের বেদনা । প্রভাত সঙ্গীতের (১২৯০) প্রথম কবিতা "আত্মান সঙ্গীত" দুঃখবোধের কবিতা এবং সন্ধ্যা সঙ্গীতের গভীর নৈকট্য রেখেছে । কবির আবিষ্ট কল্পনার পট পরিবর্তিত হল । তাঁর জীবনস্মৃতিতে সে সূত্র পাওয়া যায় । রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে বলেছেন , [২] "সদর স্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেইখানে বোধ করি ফ্রি -স্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায় । একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেইদিকে চাহিলাম । তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল । চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল । দেখিলাম , একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন , আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত । আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে-একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমেষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল । সেইদিনই "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" কবিতাটি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল । লেখা শেষ হইয়া গেল , কিন্তু জগতের সেই আনন্দরূপের উপর তখনো যবনিকা পড়িয়া গেল না ।

* * * * * * * * * * *

আমি বারান্দায় দাঁড়াইয়া থাকিতাম, রাস্তা দিয়া যতো মজুর যে কেহ চলিত তাহাদের গতিভঙ্গি, শরীরের গঠন, তাহাদের মুখশ্রী আমার কাছে ভারি আশ্চর্য বলিয়া বোধ হইত; সকলেই যেন নিখিল সমুদ্রের উপর দিয়া তরঙ্গলীলার মতো বহিয়া চলিয়াছে। শিশুকাল হইতে কেবল চোখ দিয়া দেখাই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, আজ যেন একেবারে সমস্ত চৈতন্য দিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম। রাস্তা দিয়া এক যুবক যখন আর-এক যুবকের কাঁধে হাত দিয়া হাসিতে অবলীলাক্রমে চলিয়া যাইত সেটাকে আমি সামান্য ঘটনা বলিয়া মনে করিতে পারিতাম না—বিশ্বজগতের অতলস্পর্শ গভীরতার মধ্যে যে অফুরান রসের উৎস চারিদিকে হাসির ঝরণা ঝরাইতেছে সেইটাকে যেন দেখিতে পাইতাম।"

রবীন্দ্র জীবনীকার কবিতাটি আশ্বিন (১২৮১) মাসে লেখা বলে আভাস দিয়েছেন; কিন্তু সদর স্ট্রীটের বাড়িতে অবস্থান-কালে বিবেচনা করে একটি বৎসরের প্রথম দিকে লেখা হয়েছিল এরূপ সিদ্ধান্তই করাই সঙ্গত। অবশ্য কবিতাটি প্রকাশিত হয় অনেক পরে ভারতীর অগ্রহায়ণ সংখ্যায় (পৃ ৩৬১–৬৪)। এই কবিতারই প্রসঙ্গক্রমে লিখিত অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর "অভিমানিনী নির্ঝরিণী" উক্ত সংখ্যাতেই (পৃ ৪০৭–০৮) প্রকাশিত হয়, প্রভাত সংগীত এর প্রথম সংস্করণে (বৈশাখ ১২৯০) দুটি কবিতাই একত্রে মুদ্রিত হয়।

কবি সদর স্ট্রীটের রাস্তাটার লোকজন, বিশ্বসংসারের অপরূপ রূপ, আনন্দ ও সৌন্দর্য উপলব্ধি করেছেন। এরই মানসিক ফসল "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" যাকে পরবর্তী-কালে তাঁর সমস্ত কাব্যের ভূমিকা[৩] বলে উল্লেখ করেছেন।

এটিকে প্রভাত সংগীতের মূল কবিতা বলা যেতে পারে। কবিতাটির অনুভূতি, ভাষা এবং ছন্দের সাবলীলভঙ্গী কবিতাটিকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতায় কবির অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। কবি পাহাড়ে অবস্থান করেছেন না। কর্মচঞ্চল কলকাতা শহরে প্রকৃতি ও জনজীবন তাঁর নিকটতম। তবু তাঁর পাহাড়ে যাবার আকাঙ্ক্ষা মনে মনে বাসা বেঁধেছে। তারই দোলায় মন দোলা হয়ে উঠেছে। জীবনস্মৃতিতে লক্ষ্য করা গেল: "কিছুকাল আমার এইরূপ আত্মহারা আনন্দের অবস্থা ছিল। .....এমন সময় জ্যোতিদাদারা স্থির করিলেন, তাঁহারা দার্জিলিঙে যাইবেন।" দার্জিলিঙ যাত্রার প্রাককালে নিটোল এই বর্ণনার মাধ্যমে

শহরের চিত্রকল্পের সঙ্গে পাহাড়ের চিত্রকল্পের সুন্দর বর্ণনা পাওয়া গেছে। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতায় পুরো পাহাড়ী ঢল নেমে এসেছে। তার কতকগুলি চরণ বা চরণ অংশ লক্ষ্য করার বিষয়:

যেমন:

১. আঁধার গুহায় ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া
গভীর গুহায় নামিয়া নামিয়া
২. গুহায় দিয়েছে দেখা,
৩. আঁধার সলিলে
৪. পাষাণে রচিত কারাগার মোর,
৫. ফিরে আসে প্রতিধ্বনি নিজেরি শ্রবণ-পরে।
দূর দূর দূর হতে ভেদিয়া আঁধার কারা
৬. ঝর ঝর ঝর ঝর, দিবানিশি তাই শুনি,
৭. কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
৮. শিলা রাশি রাশি পড়িছে খসে,
৯. কেন রে বিধাতা পাষাণ হেন,
১০. কিসের আঁধার, কিসের পাষাণ।
১১. বসিয়া গুহার কোণে।
১২. আমি ভাঙিব পাষাণ কারা,
১৩. শিখর হইতে শিখরে ছুটিব,
১৪. পাষাণ-বাঁধন টুটি,
১৫. বনেরে শ্যামল করি, ফুলেরে ফুটায়ে তুলা,
১৬. ওরে, চারিদিকে মোর
এ কী কারাগার মোর!

এই চরণ বা চরণ অংশ থেকে কয়েকটি শব্দ লক্ষ্য করার বিষয়: গুহা, আঁধার, পাষাণ, শিলা, পাষাণকারা, শিখর, পাষাণ-বাঁধন, শ্যামল এবং কারাগার। কবিতাটির মধ্যে গুহা শব্দটি পাঁচবার, পাষাণ শব্দটিও পাঁচবার ব্যবহৃত হয়েছে। গুহার এবং পাষাণের রূপ বার বার কবির মনে আসছে। কবিতাটির চরণে চরণে

তা পরিস্ফুট হল এবং তার প্রয়োগ বিচিত্র । আর সেই আনন্দের বনস্পতি, শ্যামল লতাগুল্ম, ঝর্ণা, মেঘ কবিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে । কবির দেহ শহর কলকাতায় কিন্তু তাঁর মন প্রকৃতির স্বর্গলোক দার্জিলিঙ পাহাড়ে । একই শব্দ একই কবিতায় চরণে চরণে ব্যবহৃত হওয়ার মধ্যে কবির বিশেষ ভাবকে স্পর্শ করে । মনের গভীরে ঐ শব্দের দ্যোতনা চিত্রকল্পের রূপ নেয় ।

কবি কখনো গুহায় বিচরণ করছেন, গুহায় অবতরণ করছেন, গুহায় ধরা দিচ্ছেন আবার গুহার কোণে আশ্রয় নিচ্ছেন । মনটি গুহার পিছনে দৌড়ে বেড়াচ্ছে । আবার পাষাণ শব্দটি : পাষাণে তৈরী হচ্ছে কারাগার, বিধাতা পাষাণের অনুরূপ, পাষাণরূপ কারা, আবার পাষাণে বাঁধন সৃষ্টি করছে অর্থাৎ গিরি নির্ঝরিণী গুহায় আবদ্ধ, হিমানীতে তার গতি স্তব্ধ । প্রভাতের পাখির কাকলী রাত্রির অবসান ঘটায়, সকালের রোদে বিশ্বজীবন ঝলমল করে—পাষাণে আবদ্ধ জীবনের মুক্তি আসে না কিন্তু আজ এই পাখির মুক্ত আহ্বানে অরুণের আলো রাশি গুহায় প্রবেশ করেছে । রুদ্ধ নির্ঝরিনীর অচল জীবনে সাড়া জাগিয়েছে । কবির স্বপ্ন ভেঙে গেছে । কঠিন শিলায় আবদ্ধ নির্ঝরিনীর মুক্ত হওয়ার গান শোনা যাচ্ছে :

কেনরে বিধাতা পাষাণ হেন,
চারিদিকে তার বাঁধন কেন ?
ভাঙ্‌রে হৃদয় ভাঙ্‌রে বাঁধন,
সাধরে আজিকে প্রাণের সাধন,
লহরীর 'পরে লহরী তুলিয়া
আঘাতের পর আঘাত কর ।

গাঢ় তমসাচ্ছন্ন কারাগার থেকে নির্ঝর বিশ্বে প্রবাহিত হতে চাচ্ছে । তার ক্ষুদ্র জীবন আজ বৃহৎ জীবনের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য ব্যাকুল । আর ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী মহাসমুদ্রের ডাক শুনতে পাচ্ছে । এখানেই রবী-দ্রকাব্যের বিশিষ্টতা—সীমার মধ্যে অসীমের অনুভূতি ধরা পড়েছে ।

কবি নির্ঝরকে জাগিয়ে তোলার অভিব্যক্তি তেজদীপ্ত করেছেন পাষাণ আর গুহার আবদ্ধ সীমার মধ্যে । পাষাণ শব্দটিকে অপূর্বভাবে অর্থবহ করে তুলেছেন । যেমন :

১. পাষাণে রচিত কারাগার মোর
২. কেন রে বিধাতা পাষাণ হেন,
৩. কিসের আঁধার, কিসের পাষাণ !
৪. আমি ভাঙিব পাষাণ কারা,
৫. পাষাণ-বাঁধন টুটি,

আঁধারকে অতিক্রম করার কোন সীমারেখা নেই। সেইরূপ পাষাণ আঁধার স্বরূপ। পাষাণের এই বিচিত্ররূপকে উদ্ভাসিত করতে কারাগার, বাঁধন শব্দাবলী ব্যবহার করা হয়েছে। পাষাণের এই সুন্দর চিত্রকল্প পাহাড়কেন্দ্রিক নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। বলা বাহুল্য, পাষাণ নির্ঝরের প্রতিবন্ধক হল তাকে অসীম স্থানে আবদ্ধ করা যায় না। সমতল বিশ্বে কবি নির্ঝরকে আহ্বান করছেন। আসলে লক্ষ্য করা গেছে, কবি সন্ধ্যা সঙ্গীতে প্রকৃতি ও মানবকে একাত্ম না করতে পেরে, তাঁর বেদনা ও অস্থিরতা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু প্রভাত সঙ্গীতের কবি প্রকৃতি ও মানবকে এক করে আনন্দ উপলব্ধি করছেন। বিশ্বের প্রকৃতি ও মানুষের রূপ, রস ও রহস্যের সন্ধান দিয়েছেন। তারই উদাহরণ – "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ।' তাঁর ঈপ্সিত - "আমার শিশুকালের বিশ্বকে প্রভাত সঙ্গীতে যখন আবার পাইলাম তখন তাহাকে অনেক বেশি পাওয়া গেল। এমনি করিয়া প্রকৃতির সঙ্গে সহজ মিলন, বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলনে জীবনের প্রথম অধ্যায়ের একটা পালা শেষ হইয়া গেল।" প্রতিধ্বনি "কবিতাটি দার্জিলিঙে বসে লেখা। "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" কবিতাটিতে প্রতিধ্বনি কবিতার পূর্বসুর লুকিয়ে আছে। কবিতা দুটির একটা বড় অংশের মিল রয়েছে, সেটা হল প্রকৃতির অপরূপ ক্যানভাস। প্রতিধ্বনি (Echo) আমাদের শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। আর এটি বিশাল প্রান্তরে খুব ভালোভাবে অনুভব করার বিষয়। বিশেষ করে দার্জিলিঙের মত নির্জন পাহাড়-দেশে। বিরাট একটি শব্দ চারিদিকের কাছে দূরের পাহাড় ছুঁয়ে আসে। কবি "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" কবিতায় উচ্চারণ করলেন : "ফিরে আসে প্রতিধ্বনি নিজেরি শ্রবণ ' পরে।" এই দ্যোতনা এবং তার বহির্ভূত তত্ত্বজাল প্রতিধ্বনি কবিতায় বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রজীবনীকার কৃষ্ণ কৃপালিনী তাঁর "Rabindra Nath Tagore — A Biography" গ্রন্থে লিখেছেন "The poet fancies that what he saw as beauty or felt as music — he expressed it in a poem written in Darjeeling which he entitled " The Echo".

কবিতাটি লেখার প্রেরণা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথায় আসা যাক - "যে ভাবে তখন আমাকে আবিষ্ট করেছিল সেটা এই যে-বিশ্ব সৃষ্টি হচ্ছে একটা ধ্বনি আর সে প্রতিধ্বনিরূপে আমাকে মুগ্ধ করছে, ক্ষুব্ধ করছে, আমাকে জাগিয়ে রাখছে, সেই সুন্দর, সেই ভীষণ। সৃষ্টির সমস্ত গতিপ্রবাহ নিত্যই একটা কোন কেন্দ্রস্থলে গিয়ে পড়ছে আর সেখান থেকে প্রতিধ্বনিরূপে নির্ঝরিত হচ্ছে আলো হয়ে, রূপ হয়ে, ধ্বনি হয়ে।"

কবিতাটির ইতিহাস প্রসঙ্গে জীবনস্মৃতিতে তিনি বলেছেন,[৪] "কিছুকাল আমার এইরূপ আনন্দের অবস্থা (নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতাটি লিখবার সময়কার অবস্থা) ছিল। এমন সময় জ্যোতিদাদা স্থির করিলেন তাঁহারা দার্জিলিঙে যাইবেন।'[৪]
আমি ভাবিলাম এই হইল আমার ভালো - সদর স্ট্রীটের সহরে ভিড়ের মধ্যে যাহা দেখিলাম - হিমালয়ের উদার শৈলশিখরে তাহাই আরো ভালো করিয়া গভীর করিয়া দেখিতে পাইব। অ-তত এই সৃষ্টিতে হিমালয় আপনাকে কেমন করিয়া প্রকাশ করে তাহা জানা যাইবে। কি-তু সদর স্ট্রীটের সেই তুচ্ছ বাড়িটারই জিত হইল। হিমালয়ের উপর চড়িয়া যখন তাকাইলাম তখন হঠাৎ দেখি আর সেই দৃষ্টি নাই।

আমি দেবদারু বনে ঘুরিলাম, ঝরনার ধারে বসিলাম, তাহার জলে স্নান করিলাম, কাঞ্চনজঙ্ঘার মেঘমুক্ত মহিমার দিকে তাকাইয়া রহিলাম –কি-তু যেখানে পাওয়া সুসাধ্য মনে করিয়াছিলাম সেইখানেই কিছু খুঁজিয়া পাইলাম না। পরিচয় পাইয়াছি কি-তু আর দেখা পাই না। রত্ন দেখিতে ছিলাম, হঠাৎ তাহা ব-ধ হইয়া এখন কৌটা দেখিতেছি। কি-তু কৌটার উপরকার কারুকার্য যতই থাক—তাহাকে আর কেবল শূন্য কৌটামাত্র বলিয়া ভ্রম করিবার আশঙ্কা রহিল না।

প্রভাত সঙ্গীতের গান থামিয়া গেল শুধু তার দূর প্রতিধ্বনি স্বরূপ "প্রতিধ্বনি" নামে একটি কবিতা দার্জিলিঙে লিখিয়াছিলাম। ....আসল কথা হৃদয়ের মধ্যে যে ব্যাকুলতা জন্মিয়াছিল সে নিজেকে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছে। যাহার জন্য ব্যাকুলতা তাহার কোনো নাম খুঁজিয়া না পাইয়া তাহাকে বলিয়াছে প্রতিধ্বনি এবং কহিয়াছে—

ওগো প্রতিধ্বনি,
বুঝি আমি তোরে ভালোবাসি
বুঝি আর কারেও বাসি না।

বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে সে কোন গানের ধ্বনি জাগিতেছে—প্রিয়মুখ হইতে, বিশ্বের সমুদয় সুন্দর সামগ্রী হইতে প্রতিঘাত পাইয়া যাহার প্রতিধ্বনি আমাদের হৃদয়ের ভিতরে গিয়া প্রবেশ করিতেছে। কোনো বস্তুকে নয় কিন্তু সেই প্রতিধ্বনিকেই বুঝি আমরা ভালোবাসি কেননা ইহা যে দেখা গেছে, একদিন যাহার দিকে তাকাই নাই আর একদিন সেই একই বস্তু আমাদের সমস্ত মন ভুলাইয়াছে।

....একদিন হঠাৎ আমার অন্তরের যেন একটা গভীর কেন্দ্রস্থল হইতে একটা আলোক রশ্মি মুক্ত হইয়া সমস্ত বিশ্বের উপর যখন ছড়াইয়া পড়িল তখন সেই জগৎকে আর কেবল ঘটনাপুঞ্জ ও বস্তুপুঞ্জ করিয়া দেখা গেল না, তাহাকে আগাগোড়া পরিপূর্ণ করিয়া দেখিলাম। ইহা হইতেই একটা অনুভূতি আমার মনের মধ্যে আসিয়াছিল যে, অন্তরের কোন-একটি গভীরতম গুহা হইতে সুরের ধারা আসিয়া দেশে-কালে ছড়াইয়া পড়িতেছে - এবং প্রতিধ্বনি রূপে সমস্ত দেশকাল হইতে প্রত্যাহত হইয়া সেইখানেই আনন্দ স্রোতে ফিরিয়া যাইতেছে। সেই অসীমের দিকে ফেরার মুখের প্রতিধ্বনিই আমাদে মনকে সৌন্দর্যে ব্যাকুল করে।

.... সৌন্দর্যের ব্যাকুলতার ইহাই তাৎপর্য। যে-সুর অসীম হইতে বাহির হইয়া সীমার দিকে আসিতেছে তাহাই সত্য, তাহাই মঙ্গল, তাহা নিয়মে বাঁধা, আকারে নির্দিষ্ট, তাহারই যে প্রতিধ্বনি সীমা হইতে অসীমের দিকে পুনশ্চ ফিরিয়া যাইতেছে তাহাই সৌন্দর্য, তাহাই আনন্দ। তাহাকে ধরা ছোঁয়ার মধ্যে আনা অসম্ভব, তাই সে এমন করিয়া ঘরছাড়া করিয়া দেয়। প্রতিধ্বনি কবিতার মধ্যে আমার মনের এই অনুভূতিই রূপকে ও গানে ব্যক্ত হইবার চেষ্টা করিয়াছে।"

প্রভাত সংগীত "প্রতিধ্বনি" কবিতাটির রচনার সময় রবীন্দ্রনাথের মানসিক অবস্থা এবং অনুভূতির একটি বিশেষ তাৎপর্য লক্ষণীয়। কবির জীবনের এই অধ্যায়কে কাব্য প্রতিভা উন্মেষের কাল বলা যেতে পারে। বস্তু জগৎ থেকে ধ্বনি উত্থিত হওয়ার মূলে সঙ্গীত বিদ্যমান। এই সঙ্গীত আবহকাল থেকে অন্তহীন। সব সময় এই সঙ্গীত আমরা শুনতে পাই না। কেবলমাত্র পাখির গান, নির্ঝরের কলশব্দ, সমুদ্রের গান অথবা ষড় ধাতুর পরিবর্তনের ফলশ্রুতি প্রতিধ্বনি হয়ে আমাদের কানে বাজে। এই পৃথিবীর যা কিছু সুন্দর আনন্দের বিষয় তাই মহা সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি। কবি জগতের আনন্দময় সত্তাকে উপলব্ধি করেছেন। আর রূপ —রস —গানের অন্তর্নিহিত ফল্গুধারাকেও

ভালবাসেন । কেননা, এই রূপ – রস – গানের বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করার কোন পথ নেই । অসীম সৌ-দর্য ও সংগীত সীমা রেখায় পর্যবসিত হয়ে বস্তুগত সত্যে পরিণত হয় ঠিকই, কি-তু তার মধ্যে আশ্চর্য প্রত্যয় ও লোক জীবনের অতিরিক্ত একটা অতীত সৌ-দর্য ও সংগীত আনন্দের কথাও বলে দেয় । আমরা এই খ-ড রূপ –রস–গানের বস্তুগত রূপের বাইরে অপার রূপবত্তা, খ-ড রসের বাইরে অলৌকিক সৌ-দর্যময়তা আর খ-ডগানের বাইরে বিস্ময়কর চমৎকারিত্ব উপলব্ধি করি ; কবি সেই মূলকে অখ-ডরূপের প্রতিধ্বনিরূপে দেখেছেন । আসলে রবী-দ্রনাথের কল্পনায় ও অনুভূতিতে প্রতিধ্বনি সৌ-দর্য মহিমায় উদ্ভাসিত । এবং সেই সৌ-দর্যকে তিনি সংগীতের মর্মমূলে পৌছে দিয়েছেন । এই সংগীতের প্রতিধ্বনি বিশ্বের সকল সৌ-দর্যের অ-তরে অহরহ বেজে চলেছে । এখানে তাদের অ-তরের ইঙ্গিত –সীমার মধ্যে অসীমের কল্পনা । রবী-দ্রনাথ 'ছবি ও গানে 'র সময়কার একটা প্রবন্ধে সু-দরভাবে বলেছেন : "শঙ্খকে সমুদ্র হইতে তুলিয়া আনিলেও সে সমুদ্রের গান ভুলিতে পারে না । উহা কানের কাছে ধরো, উহা হইতে অবিশ্রাম সমুদ্রের ধ্বনি শুনিতে পাইবে । পৃথিবীর সৌ-দর্যের মর্মস্থলে তেমনি সুরের গান বাজিতে থাকে ।.....পৃথিবীর পাখীর গানে পাখীর গানের অতীত আরেকটি গান শুনা যায়, প্রভাতের আলোকে প্রভাতের আলোক অতিক্রম করিয়া আরেকটি আলোক দেখিতে পাই, সু-দর কবিতায় কবিতার অতীত আরেকটি সৌ-দর্য–মহাদেশের তীরভূমি চোখের সম্মুখে রেখার মতো পড়ে ।" প্রতিধ্বনি কবিতাটিতে কবি প্রতিভার স্বাক্ষর পরিপূর্ণরূপে স্থাপিত হয়নি সত্য, কি-তু কবির প্রাঞ্জল অনুভূতিতে কাব্যরূপ শিল্পীসত্তার পরিচয় বহন করছে নি:সন্দেহে বলা যায় ।

প্রভাত সংগীতে বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বমানবকে ফিরে পাবার আন-দ কবির মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে । জড় জগতের সঙ্গে চলমান মানবজীবনের নৈকট্য কবির মনে সন্দেহ জাগিয়েছে ।

নাম কবিতাটি[৫] (প্রতিধ্বনি) শাখা প্রশাখায় ছড়িয়ে পড়েছে ১২৮ চরণে । এবার দেখা যাক দার্জিলিঙ পাহাড়ের পরিবেশ এই কবিতায় কতখানি প্রভাব ফেলেছে । প্রকৃতিকে বুঝতে কিছু চিত্রকল্প আমরা পেয়ে যাচ্ছি । এই কবিতায় কবি সরাসরি প্রতিধ্বনিকে ডেকে নিচ্ছেন । প্রথম স্তবকে দুটো সুরের ঝঙ্কার ফুটে উঠেছে । প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং তার অ-তরালে সংগীত । প্রতিধ্বনির সাহায্যে পাখির কাকলি শোনা সম্ভব হচ্ছে ।

আর সেই সঙ্গে ঝর্ণার কল কল শব্দ, রহস্যাবৃত অরণ্যের গান। এখানে "নির্ঝরের শুনিয়া ঝর্ঝর" চরণ চিত্রকল্পের নিদর্শন। নির্ঝরের গতিকে বুঝাবার পক্ষে ঝর্ঝর শব্দটি অপূর্ব। পাহাড়ে ক্যাম্পিভাসের কথা মনে আসবে। রবী-দ্রনাথ পৃথিবীর সংগীত শুনতে পাচ্ছেন সে কেবল ভালবাসার ফসলমাত্র। নিটোল পাহাড় পরিম-ডলের মধ্যে মহাসংগীত যা নাকি বিশ্বচেতনায় মুখর, তা একমাত্র রবী-দ্রনাথের ক্ষেত্রে সম্ভব। কবি বললেন, "শুনিব রে আঁখি মুদি বিশ্বের সংগীত।" সীমার মধ্যে অসীমের দ্যোতনা এনে দেয়। প্রতিধ্বনির (Echo) অস্তিত্ব শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের পক্ষে সম্ভব, কবি সে কথা স্বীকার করার অপেক্ষা রাখেন না।

রোজভিলায় কবির অবস্থান। সেখান থেকে তিনি স্পষ্টই বুঝতে পারছেন যে প্রতিধ্বনিকে ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে আনা অসম্ভব, কেননা সে কবিকে ঘর ছাড়া করেছে। তাঁর গীতোচ্ছ্বাসের জন্য প্রকৃতি প্রবল। বিশ্ব সংগীতের সূত্রগুলি - অরণ্য, পর্বত, সমুদ্র, বটিকা, দিন, রাত্রি, বসন্ত, বর্ষা, শরৎ, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারকা ইত্যাদি মনে রাখার মত এবং সেগুলি নিছক চিত্রকল্পের সহায়ক। "অরণ্যের পর্বতের সমুদ্রের গান", –রবী-দ্রনাথ খুব নিকট থেকে অরণ্যের পর্বতের এবং সমুদ্রের গান শুনতে আগ্রহী। প্রকৃতিকে কবি অনুধাবন করলেও নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে দেখছেন না। পর্বতের মধ্যিখানে অরণ্যের কথা ভাবতে কষ্ট হয় না। কি-তু ঐ ভাবনার পাশাপাশি দূরাগত সাগরের চি-তা কবির গানের গভীরতাকে ব্যক্ত করেছে। মূলত: প্রকৃতি এখানে কাজ করছে। অন্য চিত্রকল্প দুটি : "চেতনার নিদ্রার মর্মর, জীবনের মরণের সুর," খুবই গভীর জীবনবোধের কথা মনে করিয়ে দেয়। এই মগ্ন-চৈতন্যে কবি যথেষ্ট আন-দ পেয়েছেন। এ দুটি চরণের উত্তর রবী-দ্রনাথ স্বীকার করেছেন, "জীবন সব-কিছুকে রাখে, আর মৃত্যু সব-কিছুকে চালায়। প্রতি মুহূর্তেই মরছি আমি, আর সেই মরার ভিতর দিয়েই আমি বাঁচার রাস্তায় এগোচ্ছি, যেন আমার মধ্যে সেলাইয়ের কাজ চলছে–গাঁথা পড়ছে অতীত ভবিষ্যৎ বর্তমান। মুহূর্তকালীন মৃত্যু পরম্পরা দিয়ে মর্তজীবন এই যেমন বেড়ে চলেছে প্রবালদ্বীপের মতো, তেমনি মৃত্যুর পর মৃত্যু আমাকে দিয়ে লোক-লোকা-তরের অভিজ্ঞতার জাল বিস্তার করে চলবে - আমার চেতনার সূত্রটিকে নিয়ে মৃত্যু এক–এক ফোঁড়ে এক–এক লোককে সম্বন্ধ সূত্রে গাঁথবে।"

কবি নির্জনতা খুঁজে বেড়ান । দার্জিলিঙ বাসকালে তিনি লিখছেন :

"বাতাসে সৌরভ ভাসে আঁধারে কত-না তারা,
আকাশে অসীম নীরবতা"—

এই নির্জনতার ছায়া অন্যত্র অব্যক্ত ভঙ্গীতে আরোপ করেছেন । গভীর ভাবনায় তিনি মগ্ন । নির্জনতা প্রকাশ পেয়েছে । যেমন :

" এই বিশ্বজগতের মাঝখানে দাঁড়াইয়া
বাজাইবি সৌ-দর্য্যের বাঁশি,
অন-ত জীবন পথে খুঁজিয়া চলিব তোরে,
প্রাণ মন হইবে উদাসী ।"

রবী-দ্রনাথ অনেক কিছু দেখতে পান । প্রতিধ্বনিকে অন্বেষণ করতে গিয়ে বিশ্বজীবন বোধকে দেখতে পাচ্ছেন এবং ঐ চেতনায় সৌ-দর্যের জয়ডঙ্কা কবি শুনছেন । আর ঐ চেতনার সূত্র ধরে কবি এগিয়ে যাবেন । এই বিশ্বের মধ্যে অনুপ্রবেশকালে তিনি মগ্ন হয়ে যাচ্ছেন । বহির্জগতের কোন ধ্যান তাঁর নেই । শুধু উদাস হয়ে পড়েছেন, যেখানে এই পাহাড় পরিবেশে তাঁর প্রাণ-মন শরীরীরূপে নেই । কবি বললেন,

"তেমনি প্রাণের মাঝে অশরীরী আশাগুলি
ভ্রমে কোন হেথায় হোথায় —
সে কি তোরে চায় ?"

স্থানের অনুষঙ্গ প্রতিধ্বনি কবিতাটিতে একটি পরিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করেছে । ছায়াময় চিত্রকল্পকে অস্বীকার করবার উপায় নেই ।

জগতের গানগুলি দূর—দূরা-তর হতে
দলে দলে তোর কাছে যায়,
যেন তারা বহি- হেরি পতঙ্গের মতো
পদতলে মরিবারে চায় ।

সমতলভূমি থেকে অনেক উর্ধ্বে কবির অবস্থান । সেখান থেকে তিনি পৃথিবীর গানগুলি শুনতে পাচ্ছেন । অবশ্য সে গানগুলি প্রতিধ্বনির নিকট আত্ম সমর্পণ করছে । যেমন পতঙ্গ আগুনের কাছে করে । এমন একটি সু-দর অবস্থানের মাধ্যমে কবি দূরের কথা ভাবতে পারছেন । সসীমের মধ্যে অসীমের প্রকাশ বলা যেতে পারে । অন্য আর একটি

চিত্রকল্প লক্ষ্য করার বিষয়। কবি বলছেন,

না জানি কী গুহার মাঝারে
অস্ফুট মেঘের উপবনে,
স্মৃতি ও আশায় বিজড়িত
আলোক-ছায়ার সিংহাসনে,
ছায়াময়ী মূর্তিখানি আপনে আপনি মিশি
আপনি বিস্মিত আপনায়
কার পানে শূন্য পানে চায়!

এখানে গুহার মধ্যে অস্পষ্ট মেঘের দলকে কবি অবলোকন করছেন। আলো ও আঁধারের খেলা পাহাড়ী পরিবেশে পরিলক্ষিত হচ্ছে। তারই অবসরে স্মৃতিতে নির্ভর করছেন তিনি। ছায়াময় মেঘের দল যে মূর্তি এতক্ষণ কবিকে আপ্লুত করে রেখেছিল, তাদের আর স্থিতি নেই। দীর্ঘ সময় কবি গভীর ভাবনায় বিভোর ছিলেন, মেঘরাশি সরে যাওয়ায় কবির শূন্যতা দেখা দিয়েছে। এ যেন রবীন্দ্রনাথের আন-দচেতনা থেকে দুঃখ বোধে নেমে আসা। এই ইমেজের পরেই দেখা যাচ্ছে:

সায়াহ্নে প্রশান্ত রবি স্বর্ণময় মেঘ মাঝে
পশ্চিমের সমুদ্রসীমায়

শৈল শহরের বুকে সূর্য অস্ত প্রায়, এমন মুহূর্তে যে মেঘের দল ভিড় করছে -তারা যে সোনার রঙে ভরে আছে এবং পশ্চিমের আকাশ সমুদ্র সৃষ্টি করে আছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। এই বর্ণাঢ্য ইমেজ দার্জিলিঙের পরিবেশে সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথ রোজভিলার মত নিরালা বাসগৃহে অবস্থান করে দূরের পাহাড় থেকে ভেসে আসা গান শুনতে পাচ্ছেন। তিনি সন্ধ্যাবেলায় তারকাগুলিকে আকাশে সুন্দর ভাবে ছড়িয়ে থাকতে দেখছেন। কবি কল্পনা করছেন এই তারকাগুলি এলানো চুল নিয়ে অবস্থান করছে। আর কবির গান শোনার সঙ্গে সঙ্গে তারাও গান শুনছেন। তারা চোখ বুজিয়ে আছে। এই রূপ বা inanimate object কে প্রাণবন্ত করে তোলার মধ্যে কবির অপূর্ব অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় মেলে। কবি বলছেন,

"কোথা হতে আসিতেছে গান—
এলানো কুন্তলজালে সন্ধ্যার তারকাগুলি
গান শুনে মুদিছে নয়ান।"

তিনি আরো বলছেন,

কত বার আর্ত স্বরে শুধায়েছি প্রাণ পণে,
ওগো তুমি কোথায় - কোথায় —
অমনি সুদূর হতে কেন তুমি বলিয়াছ
কে জানে কোথায় ?"

প্রতিধ্বনির রূপ রবীন্দ্রনাথ অতি সুন্দর ভাবে পরিবেশন করেছেন। অমর্ত্যরূপের কথা বলতে রহস্যের কথা বলছেন। সৌন্দর্যের মরীচিকা প্রতিধ্বনির কথা মনে করিয়ে দেয় সত্য, কিন্তু সুন্দর চিত্রকল্পের মূলে অপূর্ব প্রকৃতি পরিবেশের কথা অবশ্যই কবির মনে ছিল। মরীচিকার ছবি আসে বিস্তৃত সীমারেখায়। রোজভিলা থেকে পাহাড় ঘেরা দার্জিলিঙ দেখা যায়। আকাশ দিগন্তরেখা সৃষ্টি করে পাহাড়কে সামনে রেখে। এই অবস্থায় সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় কবির মনে মরীচিকার কথা আসা স্বাভাবিক ছিল।

কবি স্বীকার করেছেন,

মাঝে মাঝে কারো মুখে সহসা দেখে সে যেন
অতুল রূপের প্রতিধ্বনি,
কাছে গেলে মিলাইয়া যায়
নিরাশের হাসিটির প্রায় —
সৌন্দর্যের মরীচিকা এ কাহার মায়া,
এ কি তোর ছায়া।

প্রতিধ্বনি কবিতায় আরো একটা সূত্রে প্রতিধ্বনির রূপের কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। তিনি গীতি কবি। হৃদয়াবেগকে সুরের কাছাকাছি পৌঁছে দেওয়া তাঁর কাজ। গানের সুরে কবির একটি পরিবর্তন আসে। ক্ষণকালের জন্য সুরের জগৎ—কানে শোনা জগৎ—সবই বিশ্ব স্পন্দনকে আলো বা বস্তুর রূপে না দেখে সংগীতময়তায় ধরে অপূর্ব চেতনার রঙ কবি দেখেন। গানের জগৎ যে সৌন্দর্য আসে তার অপরূপ রূপ। এ যেন সংগীত,

রূপ রস গন্ধ জগতে যা কিছু বিদ্যমান সবই প্রতিধ্বনিময়। আর প্রতিধ্বনির আশ্রয়, তা অতীত সৌন্দর্যের আধার। কবি-প্রাণে ছায়ার মত ভাসে। অব্যক্ত ভাষায় তাঁর হৃদয়ে গুমরে মরে। অস্পষ্ট, অর্থ দ্যোতনায় মিষ্টিকতার আশ্রয় নিয়ে কবি যেমন ধরা দিতে চান না, তেমনি প্রতিধ্বনির রূপ চোখের আড়ালে সঙ্গীতে আপ্লুত। তাই কবিকে বলতে শোনা গেল,

সঙ্গীত, সৌরভ, শোভা জগতে যা-কিছু আছে
সবি হেথা প্রতিধ্বনিময়।
প্রতিধ্বনি, তব নিকেতন,
তোমার সে সৌন্দর্য অতুল,
প্রাণে জাগে ছায়ার মতন—
ভাষা হয় আকুল ব্যাকুল।

আসলে রবীন্দ্রনাথের চিত্তে চিরকাল একজন ভাবুক ও দার্শনিক বসে আছে। তারই প্রতিশ্রুতি প্রভাত সঙ্গীতের বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বমানবকে ঘিরে পাবার আকৃতি এবং আনন্দ আমরা লক্ষ্য করেছি। পর্বত, ঝাউ, লতাগুল্ম, হিমেল হাওয়া, নির্জনতা সমস্তই একুশ বছরের যুবককে স্পর্শ করার মত। অবশ্য প্রকৃত কবি-হৃদয়ই সে কথা বলতে পারে।

সবশেষে প্রভাত সঙ্গীতের একটি সমালোচনার কথা উল্লেখ করি। এই সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি বর্ণনার সুন্দর চিত্র পাওয়া যাবে। প্রভাত সঙ্গীতের একটি সমালোচনা প্রকাশিত হয় সঞ্জীবনী পত্রিকায় (১।১৪, ৩১ আষাঢ়, ১২৯০ সাল, পৃ ৫৫), দুষ্প্রাপ্য—বোধে এটি উদ্ধৃত করে দেওয়া হ'ল।

সমালোচনা। প্রভাত সঙ্গীত—বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত মূল্য ।৷০ আনা। কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকের দোকানে প্রাপ্তব্য।

বাবু রবীন্দ্রনাথ স্বভাবের কবি-প্রকৃতি বর্ণনায় আধুনিক বঙ্গীয় কবিদিগের কাহাকেও আমরা এ পর্যন্ত তাঁহার সমকক্ষ দেখি নাই। আমাদের উক্তির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন জন্য তাঁহার প্রাকৃতিক বর্ণনার কোন অংশটুকু ছাড়িয়া কোন অংশটুকু উদ্ধৃত করিব, তাহা বুঝিয়া উঠিতেছি না। শীত, শরতে প্রকৃতি, স্রোত, নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ, পুনর্মিলন প্রভৃতি কবিতার স্থানে স্থানে যে প্রাকৃতিক বর্ণনা আছে, তাহাতে পাঠক দেখিতে পাইবেন, রচনা কেমন সরল ও স্বাভাবিক;—অথচ তাহাতে কত কবিত্ব, কল্পনার

কেমন চাতুর্য্য, চি-তার কিরূপ বিকাশ । উপহারটী কেমন স্বাভাবিক, কেমন সুন্দর যাহার হৃদয় কবির উপাদানে গঠিত নহে, বাবু রবী-দ্রনাথের কবিতার মধ্যে যে প্রবেশ করিতে পারে না —রসাস্বাদন করিতে সমর্থ হয় না । প্রভাত সঙ্গীতের কবিতা পাঠ করিতে ২ অনেক সময় কবির স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বোধ থাকে না, —কবির চি-তা ও পাঠকের চি-তা এক হইয়া যায় —যদি এরূপ না হইবে, তবে আর কবির কবিত্ব কি সে ? তাই একদিন বলিয়াছিলাম, এই অসাধারণ প্রতিভা যদি স্বভাব সঙ্গীত ও ভালবাসার "একঘেয়ে" কবিতায় পর্য্যবসিত না হইয়া দেশে হিতৈষণা ও স্বদেশানুরাগ সঙ্গীতে নিয়োজিত হইত, তবে বাঙ্গালীর নিদ্রিত হৃদয়ে ও জড় দেহে তাড়িত বেগ সঞ্চারিত হইত ।

বাঙ্গালি কবিদিগের রুচিবিকৃতি দেখিয়া আমরা অনেক সময় সন্তপ্ত হইয়া থাকি ; সুখের বিষয়, রবী-দ্রনাথের কবিতার রুচি দিন দিনই পরিমার্জ্জিত হইতেছে । নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ, মহাস্বপ্ন, সাধ, অনন্তজীবন ও অনন্ত মরণের স্থানে স্থানে অতি উচ্চ দরের কবিত্ব আছে । স্থানাভাব বশতঃ ইচ্ছা সত্ত্বেও আমরা তাহা পাঠকদিগকে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারিলাম না ।

রবী-দ্রনাথ দ্বিতীয়বার দার্জ্জিলিঙ এলেন ১২৯৪ সালের ২৯ ভাদ্র (সেপ্টেম্বর ১৮৮৭) । তাঁর সঙ্গে এবার স্ত্রী (১৪), এক বছরের শিশু একমাত্র কন্যা বেলা, সৌদামিনী দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী, স্বর্ণকুমারীর দুই কন্যা হিরন্ময়ী (১১) ও সরলা (১৫) ছিলেন । তিনি প্রায় একমাস দার্জ্জিলিঙ ছিলেন । এখানে আসার আগে তিনি প্রিয়নাথ সেনকে একটি পত্রে লিখছেন : "রবিবারে যাওয়া একেবারে ঠিক হয়ে গেছে । অতএব টাকাটা আজই কিম্বা কাল বেলা দুটোর মধ্যে পেলে বড়ই সুবিধে হয় ।....কাপড় চোপড় কর্ত্তে অনেক ধার হয়ে গেছে এই সময়ে না পেলে বিদেশে বড় মুস্কিল হবে"— আমাদের মনে হয় পত্রটি এই সময়ে লেখা । শীতের দেশে যাচ্ছেন, সুতরাং যথোপযুক্ত পোশাক -পরিচ্ছদের প্রয়োজনে ধার করতে হয়েছে । সত্য প্রসাদের হিসাব খাতাতেও দেখা যায় ৩১ ভাদ্র তারিখে : "রবি মামাকে হাওলাত ৫০ (২ পৌষ শোধ হয়), ঋণ কয়েকদিন আগেই দেওয়া হয়েছিল, কারণ এই দিনই ইন্দিরা দেবী দার্জ্জিলিঙ থেকে লেখা রবী-দ্রনাথের চিঠি পান ।"[৬] ১৮৮২ সালে রবী-দ্রনাথের দার্জ্জিলিঙ আসার পথের কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে । ১৮৮৩ সালে

পোড়াদহ থেকে দামুকিয়া ঘাট পর্যন্ত রেল লাইন পাতার পর পায়ে হাঁটার দূরত্ব অনেকখানি কমে আসে। এবার রবী-দ্রনাথ দামুকিয়া স্টেশনে নেমে স্টীমার যোগে পদ্মা পার হলেন। পরপারে সারাঘাট, সেখান থেকে মিটার গেজের ছোট ট্রেন যোগে শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন ও সেখান থেকে ন্যারো গেজের ছোট ট্রেন চড়ে হিমালয়ে শরীরে চড়াই পথ অতিক্রম। উল্লেখ্য, এই টয় ট্রেনের কামরাগুলির ছাদ ছিল না।

রবী-দ্রনাথের এই ভ্রমণপর্বে প্রাণের স্পন্দন, সরলতা এবং কৌতুক প্রিয়তা জানা হয়ে গেল। সাহিত্যকর্মের অনেক গভীরে তিনি চলে গেছেন এই সময়ে —মানসী পর্বে। ব্যবহারিক চলমান জগতে কত সহজ মানুষ রবী-দ্রনাথ এবং এই যাত্রাকালে তাঁর কবি স্বভাব কেমন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল তার পরিচয় ১৮৮৭ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর (?) ইন্দিরাকে (১৪) কলকাতায় লিখিত একটি চিঠিতে মিলবে: "এই তো দার্জিলিং এসে পড়লুম। পথে বেলি খুব ভালো রকম behave করেছে। বড়ো একটা কাঁদেনি। খুব চেঁচামেচি গোলমালও করেছে, উলুও দিয়েছে, হাতও ঘুরিয়েছে এবং পাখিকে ডেকেছে যদিও পাখি কোথায় দেখতে পাওয়া গেল না। সারা-ঘাটে স্টিমারে ওঠবার সময় মহাহাঙ্গাম। রাত্রি দশটা —জিনিস -পত্র সহস্র, কুলি গোটাকতক, মেয়েমানুষ পাঁচটা এবং পুরুষ মানুষ একটিমাত্র। নদী পেরিয়ে একটি ছোটো রেলগাড়িতে ওঠা গেল —তাতে চারটে করে শয্যা, আমরা (মাথন—সুদ্ধ) ছটা মনিষ্যি। মেয়েদের এবং অন্যান্য জিনিস পত্র Ladies Compartment এ তোলা গেল —কথাটা শুনতে যত সংক্ষেপ হল কাজে ঠিক তেমনটা হয়নি। ডাকাডাকি হাঁকা-হাঁকি ছুটোছুটি নিতান্ত অল্প হয়নি —তবু না দিদি বলেন আমি কিছুই করিনি। অর্থাৎ আমার মতো ডাগর পুরুষ মানুষের পক্ষে পাঁচ জন মেয়ে নিয়ে এর চেয়ে ঢের বেশি ডাকাডাকি হাঁকা হাঁকি এবং ছুটোছুটি করা উচিত ছিল; মাঝে মাঝে যেখানে সেখানে নেবে হি-দুস্থানি বুলিতে Platform- ময় দাপিয়ে বেড়ানো উচিত ছিল। .....আমার ঠাণ্ডা ভাব দেখে না দিদি নিতান্ত disappointed. । কি-তু এই দুদিনে আমি এত বাক্স খুলেছি এবং বন্ধ করেছি এবং বেঞ্চির নীচে ঠেলে গুঁজেছি এবং উক্ত স্থান থেকে টেনে বের করেছি, এত বাক্স এবং পুঁটুলি আমার পিছনে অভিশাপের মতো ফিরেছে, এত হারিয়েছে এবং এত ফের পাওয়া গেছে এবং এত পাওয়া যায়নি এবং পাবার জন্যে এত চেষ্টা করা গেছে এবং যাচ্ছে যে, কোন ছাব্বিশ বৎসর

বয়সে ভদ্র সন্তানের অদৃষ্টে এ মনটা ঘটেনি । আমার ঠিক বাক্স — phobia হয়েছে বাক্স দেখলে আমার দাঁতে দাঁতে লাগে ।...যাক । তারপরে আমি আর একটা গাড়িতে গিয়ে শুলুম । সে গাড়িতে আর দুটি বাঙালি ছিলেন । তাঁরা ঢাকা থেকে আসছেন, দেখেই কেমন ঢাকাই বলে মনে হয় —তাঁদের মধ্যে একজনের মাথা টাকে পরিপূর্ণ এবং ভাষা অত্যন্ত বাঁকা—তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার পিতা দার্জিলিঙে ছিল ?" লক্ষ্মী থাকলে এর যথোচিত উত্তর দিতে পারত; সে হয়তো বলত, তিনি দার্জিলিঙে ছিল কিন্তু এখন দার্জিলিঙ বড়ো ঠান্ডা ছিলেন ব'লে তিনি বাড়ি ফিরে গেছে .....

শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিঙ পর্যন্ত ক্রমাগত সরলার উচ্ছ্বাস উক্তি — exclamatio "ওমা কী চমৎকার' 'কী আশ্চর্য' ? 'কী সুন্দর'—কেবলই আমাকে ঠেলে আর বলে, 'রবি মামা, দেখো দেখো'। কী করি, যা দেখায় তা দেখতেই হয় - কখনো বা গাছ কখনো বা মেঘ, কখনো বা একটা দুর্জয় খাঁদা - নাক -ওয়ালী পাহাড়ী মেয়ে, কখনো বা এমন কত কী যা দেখতে না দেখতেই গাড়ি চলে যাচ্ছে এবং সরলা দুঃখ করছে যে রবিমামা দেখতে পেলে না, কিন্তু তার জন্যে রবিমামা কিছুমাত্র দুঃখিত নয় । গাড়ি চলতে লাগল । বেলি ঘুমোতে লাগল, বন পাহাড় পর্বত ঝর্না মেঘ এবং বিস্তর খাঁদা নাক এবং বাঁকা চোখ দেখা দিতে লাগল । ক্রমে ঠান্ডা, তারপরে মেঘ, তারপরে ন দিদির সর্দি, তারপরে বড়দিদির হাঁচি, তারপরে শাল কম্বল বালাপোষ, মোটা মোজা, পা কন্ কন্, হাত ঠান্ডা, মুখ নীল, গলা ভার-ভার, এবং ঠিক তারপরেই দার্জিলিং । আবার সেই বাক্স, সেই ব্যাগ, সেই বিছানা, সেই পুঁটুলি । মোটের উপর মোট, মুটের উপর মুটে । ব্রেক থেকে জিনিস -পত্র দেখে নেওয়া, চিনে নেওয়া, মুটের মাথায় চাপানো, সাহেবকে রসিদ দেখানো, সাহেবের সঙ্গে তর্কবিতর্ক, জিনিস খুঁজে না পাওয়া, এবং সেই হারানো জিনিস পুনরুদ্ধারের জন্যে বিবিধ বন্দোবস্ত করা—এতে আমার ঘন্টা দুয়েক লেগেছিল, ততক্ষণ ন দিদিরা ডুলিতে চ'ড়ে, বাড়িতে গিয়ে, শালটি মুড়ি দিয়ে, সোফায় শুয়ে, বিশ্রাম করছিলেন এবং কল্পনা করছিলেন যে রবি ঠিক পুরুষ মানুষের মতো নয় ।"

দার্জিলিঙের কাসলটন হাউস মহর্ষির জন্য মাসিক ২৪০ টাকায় ভাড়া নেওয়া হয়েছিল । তিনি ফিরে গেলেও বাড়িটি ছেড়ে দেওয়া হয়নি, নিয়মিত ভাড়া দিয়ে

কাসলটন হাউস

যাওয়া হয়েছে । রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পরিবার পরিজন দার্জিলিঙে এই বাড়িটিতে ওঠেন । বাড়িটির বর্ণনা দিয়ে স্বর্ণকুমারী লিখেছেন : "লেপ্টেনেন্ট গভর্নরের বাড়ী ছাড়া দার্জিলিঙে শুনতে পাই এত বড় বাড়ী আর নেই, সেইজন্য এর নাম হচ্ছে কাসলটন হাউস । যখন লেপ্টেনেন্ট গভর্নরের দারজিলিং-এ স্বতন্ত্র বাড়ী তৈয়ার হয়নি—তখন নাকি তিনি এই খানেই থাকতেন । কিন্তু আসলে ধরতে গেলে এ বাড়ীটি তত বড় নয় বাড়ীর হলটা যত বড়"। কাসলটন হাউসের মালিক এক ইউরোপিয়ান ছিলেন । তাঁর কাছ থেকে তদানীন্তন কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ —এই বাড়িটি কেনেন । এখন ঐ বাড়িটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার অধিগ্রহণ (acquisition) করে নিয়েছেন এবং ওখানে এখন স্থানীয় সরকারী মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রী নিবাস । বার্চ হিল সংলগ্ন, রাজভবনের প্রধান প্রবেশ দ্বারকে ডাইনে রেখে সামান্য কিছুটা গিয়েই বামপাশে এবং এর নীচে হিলকার্ট রোড । বাড়িটার গাড়ি বারান্দায় দাঁড়িয়ে সকুরু হ্যাপী ভ্যালি চা বাগান-দূরের সান্দাক ফু -ফালুট, ঘুমের পাহাড় সুন্দরভাবে দেখা যায় । আর পাহাড়ের শরীর থেকে বয়ে যাওয়া নিম্নগামী ঝর্ণাগুলি অপূর্ব মনে হয় । এই প্রাকৃতিক পরিবেশ কবিকে মুগ্ধ করেছিল । তাই তো এই সুখী পরিবারের সন্ধ্যাগুলি অতিবাহিত হওয়ার কথা স্বর্ণকুমারীর রচনায় জানতে পারি । তিনি বলেছেন, "বাড়ির .....হলটা বড় । সেই মস্ত হলে ...সন্ধ্যা বেলা সমস্ত চৌকি একখানা কৌচের কাছে জড় হয়, আর মধ্যে একটা ছোটো টিপয়ে আলো জ্বলে তার চারদিকে কেহ চৌকিতে কেহ কৌচে সুবিধামত বসে শুয়ে নিলে আমাদের সঙ্গী অভিভাবকটি (রবীন্দ্রনাথ) টেনিসন থেকে ব্রাউনিং থেকে কবিতা পড়ে শোনান । বাস্তবিক তিনি কি সুন্দর পড়েন ...টেনিসনের লেখা কোমল-মধুর, বসন্তের বাতাসের মত তাতে একটা মৃদু-উল্লসিত ভাব । টেনিসন শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে যখন কান্না পায় তখন শিশিরের মত দু-এক ফোঁটা জল ধীরে ধীরে দেখা যায় । কিন্তু ব্রাউনিংয়ের লেখা কি জোরালো । শুনতে শুনতে হৃদয়ের মধ্যে একটা কারখানা হতে থাকে । ব্রাউনিংয়ের লেখা অনেকটা জর্জ এলিয়টি ধরণের । এক-একটা কার্যের অনিবার্য ফল, মনুষ্য হৃদয়ের সূক্ষ্মভাবের খেলা তিনি জ্বলন্তরূপে চিত্রিত করেছেন । পাপের প্রতি তাঁর কি ঘৃণা । কোন কোন কবি অন্যায় কাজকেও এমন কোমল তুলি দিয়ে আঁকেন যে সেই অন্যায়ের প্রতিও এখনকার মত কেমন একটা মমতা জন্মে । কিন্তু পাপের অনিবার্য

ভীষণ ফলের প্রতি ব্রাউনিং এর মর্মগত বিশ্বাস দেখা যায় । ব্রাউনিং পড়তে পড়তে যে কান্না পায় সে যেন জমাট বরফ গলতে আরম্ভ হয়, সে কান্না হঠাৎ থামান যায় না তাঁর A Blot in the 'scutcheon[৭] একবার পড়ে দেখ । এমন সুন্দর কাব্যনাট আর পড়েছি মনে হয় না ।" এই প্রসঙ্গে সরলাদেবীর ব্যক্তব্য কম হৃদয়গ্রাহী নয় । তিনি বলেছেন, "সাহিত্যগত রুচি গড়ে দিয়েছিলেন রবিমামা । ম্যাথু আর্নল্ড, ব্রাউনিং, কীটস, শেলি প্রভৃতির রসভান্ডার যিনি আমার চিত্তে খুলে দেন সে রবিমামা মনে পড়ে দার্জিলিঙের Castleton House -এ যখন মাসকতক রবিমামা, মা, ব মাসিমা, দিদি ও আমি ছিলুম—প্রতি সন্ধ্যাবেলায় Browning এর A Blot i the 'scutcheon মানে করে করে বুঝিয়ে বুঝিয়ে পড়ে শোনাতেন ।"

রবীন্দ্রনাথ টেনিসনের De profundis[৮] নামে দীর্ঘ কবিতার মনোজ্ঞ সমালোচনা "ভারতী" আশ্বিন ১২৮৮ (অক্টোবর ১৮৮১) প্রকাশ করেন । এই কবিতাটি অনেকেই বিরূপ সমালোচনা করেন, এমন কি ইংলন্ডের হাস্য রসাত্মক সাপ্তাহিক পত্র "পঞ্চ" এই কবিতাটিকে বিদ্রূপ করে De Rotundis নামে একটি পদ্য প্রকাশিত করে । কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এটিকে সুন্দর ভাবে গ্রহণ করেছেন । প্রথমত: তিনি "ডি প্রোফন্ডিস্" নামে দীর্ঘ একটি রচনায় তা বিধৃত করেছেন । দ্বিতীয়ত: তিনি শৈলশহর দার্জিলিঙ বাসকালে আত্মীয় বর্গের নিকট De profundis আবৃত্তি করছেন এবং তার অর্থ বুঝিয়ে দিচ্ছেন । মূলত: এই কবিতাটির মর্মমূলে ভারতীয় ভাবধারা পরিলক্ষিত হচ্ছে, যা নাকি রবীন্দ্র রচনার সাদৃশ্য মান একটি বিশেষ দিক । রবীন্দ্রনাথের De profundis আলোচনার মধ্য দিয়ে সেই লক্ষ্যে পৌঁছে যাব ।

De profundis কবিতাটি কবি টেনিসন সন্তানের জন্মোপলক্ষে আগষ্ট ১১, ১৮৫২ সালে লিখতে শুরু করেন এবং শেষ করেন ১৮৮০ সালে । রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "সন্তানের জন্মোপলক্ষে লিখিত কবিতা সাধারণ লোকে যে ভাবে পড়িতে যায়, এই কবিতায় সহসা তাহাতে বাধা পায় । কচি মুখ, মিষ্টি হাসি, আধ-আধ কথা ইহার বিষয় নহে । একটি ক্ষুদ্রকায়া সদ্যোজাত শিশুর মধ্যে মিষ্টভাব কচিভাব ব্যতীত আরেকটি ভাব প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা সকলের চোখে পড়ে না কিন্তু তাহা ভাবুক কবির চক্ষে পড়ে । সদ্যোজাত শিশুর মধ্যে একটি অপরিসীম মহান্ ভাব, অপরিমেয় রহস্য আবদ্ধ আছে, টেনিসন তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন ।"

টেনিসন এই কবিতাটিকে "The Two Greetings বলেছেন। অর্থাৎ এখানে তাঁর স-তানটিকে দুভাবে তিনি সম্ভাষণ করেছেন। প্রথমত তাঁর নিজের স-তান বলে। দ্বিতীয়ত তাঁর আপনাকে তফাৎ করে। এক, মর্ত্য জীবন ধরে আর-এক তার অস্তিত্ব ধরে। একটিতে, তাকে আংশিক ভাবে দেখে, আর একটিতে তাকে সর্বতোভাবে দেখে আবার তাঁর স-তানের মধ্যে দুটি ভাগ দেখতে পেয়েছেন। একটি ভাগকে তিনি স্নেহ করেন আর একটি ভাগকে তিনি ভক্তি করেন।

কবি শিশুর জ-মবৃত্তা-ত ভাবছেন। শিশু কোথা থেকে এল? এর সদুত্তর বেদ উপনিষদ দিয়েছে। বিশ্বকবি রবী-দ্রনাথ বেদ উপনিষদকে গভীর, গুরুতররূপে উপলব্ধি ক'রছেন। পৃথিবীর সকল জীবকুল ও বস্তুর নিয়-তা পরমপুরুষ। তিনি এক, অভিন্ন। তাঁকে বাদ দিয়ে জগতের কোন সত্তার কথা চি-তা করা যায় না। এক কথায় বলা যায়, আমাদের সকল কর্ম ও জীবন ঘিরে সেই অদৃশ্য পুরুষ। শিশুর ভূমিষ্ঠ কাল থেকে মরণের অ-তিম মুহূর্ত পর্যন্ত প্রসারিত এই পরম-পুরুষের হাত। তারপর মরণের পরপারের কথা মনে করতেই প্রাচীন ভারতের অধ্যাত্ম ভাবনার কথা এসে যায়। এরই সমীক্ষা ও জীবনদর্শন বেদ-উপনিষদের পাতায় বিধৃত। রবী-দ্র সাহিত্যে এরই ভাব ও মর্মকথা নানা প্রসঙ্গে এসেছে। প্রসঙ্গক্রমে তাঁর অনুবাদ-কর্ম উল্লেখ্য:

য: প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈক ইদ্রাজা জগতো বভূব।
য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদ: কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥

ঋক্‌বেদ ১০.১২১.৩

"যিনি মহামহিমায়
জগতের একমাত্র পতি,
দেহবান্ প্রাণবান্
সকলের একমাত্র গতি,
যেথা যত জীব আছে
রহিতেছে যাঁহার শাসন,
সেই কোন্ দেবতারে
হবি মোরা করি সমর্পণ॥"

এ ছাড়া উপনিষদের দৃষ্টা-ত তোলা যায়।

১. যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অ-ন্তরো যং পৃথিবী
ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীম-ন্তরো
যময়ত্যেষ ত আত্মা হ-ন্তর্যাম্য মৃত ।
(বৃহদারণ্যক - ৩।৭।৩)

যিনি পৃথিবীতে থেকে ও পৃথিবী থেকে পৃথক , যাঁকে পৃথিবী জানে না , অথচ পৃথিবী যাঁর শরীর , যিনি পৃথিবীর ভিতরে থেকে পৃথিবীকে নিয়মিত করছেন তিনিই তোমার আত্মা , তিনি অ-ন্তর্যামী , তিনি অমৃত ।

২. ঈশা বাস্য মিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ ।
(ঈশ – প্রথম শ্লোক)

জগতে যা কিছু চলমান , পরিবর্তনশীল বিকারশীল , তার সব কিছুই এক পরমসত্যের দ্বারা আবৃত । এই প্রসঙ্গে হেম-ন্তবালা দেবীকে দার্জিলিঙ থেকে রবী-দ্রনাথের লেখা একটি চিঠি উল্লেখ করা যায় । তিনি লিখছেন , "আমার জীবনের মহাম-ত্র পেয়েছি উপনিষদ থেকে , যে-উপনিষদকে একদা বাংলাদেশের বেদ–বর্জিত নৈয়ায়িক পণ্ডিতেরা বলেছিল রামমোহন রায়ের জাল–করা , যে উপনিষদ মানুষের আত্মার মধ্যেই পরমাত্মার স-ধান পেয়েছিলেন , যে উপনিষদের অনুপ্রেরণায় বুদ্ধদেব বলে গিয়েছেন জীবের প্রতি অপরিমেয় প্রীতিই ব্রহ্মবিহার , সেই পরম চরিতার্থতা দেউলে দরোগায় নয় , পাণ্ডা পুরোহিতের পদসেবায় নয় ।" আমরা লক্ষ্য করেছি কবি ছেলেবেলায় পিতা দেবে-দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে হিমালয় পাহাড়ে আশ্রয় নিয়ে ছিলেন । পিতা তাঁকে উপনিষদের বাণী শুনিয়ে ছিলেন । তারই প্রতিফলন কি দীর্ঘকাল পরে নিজের জীবনে ফিরে এল এবং স্নেহাস্পদ হেম-ন্তবালা দেবীকে উপনিষদের সেই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করলেন ।

এই চি-ত্রর সূত্রে ধরে তিনি মহা অ-ন্ধকারের রাজ্যে এবং দিগ-ত বিস্তৃত সমুদ্র গর্ভ থেকে তরুণ সূর্যকে দেখতে পাচ্ছেন এবং অতীতের মহা গঙ্গোত্রী শিখরকে ভাবতে তাঁর কষ্ট হচ্ছে না । শিশু পৃথিবীতে জ-ন্মগ্রহণ করে । পৃথিবী তার ভাই । মহা সৌর জগতের যমজ ভাইরূপে এদের দেখা হয়েছে । এই মহা সৌরজগতে অনাদিকাল থেকে চ-ন্দ্র , সূর্য , অন্যান্য গ্রহ এবং পৃথিবী অবস্থান করছে । অতীতের সেই উমাগর্ভে কবি প্রবেশ করছেন । অপরিস্ফুট পৃথিবীর কারণপুঞ্জ এবং আজকের শিশুর জীবনবৃত্তের

কারণপুঞ্জ আবর্তিত হতে দেখা যাচ্ছে । উভয়ের বয়স এক , কেবলমাত্র একদিন আগে এবং অন্যজনের আসতে বিলম্ব ঘটেছে । বর্তমান চিন্তায় কবি দেখছেন , শিশুকে লালন পালন করে বড় করতে হয়েছে । চন্দ্র , সূর্য , গ্রহতারার সঙ্গে অতীত-যতো শিশুর দায়িত্ব নিজ হাতে নিয়েছেন । একই সঙ্গে তাদের জীবন উৎসারিত হয়েছে । কবির নিকট আজ শিশুর জন্মরহস্য বহুদিনের প্রকৃতির যত্নের ফসল । প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে পৃথিবীর কোন অস্তিত্ব নেই । কবি আরো দেখতে পাচ্ছেন , শিশুর রূপলাবণ্যের জ্যোতির্ময় দোলায় বয়স্ক পুরুষের ভবিষ্যৎ দুলতে । কবি ও তাঁর স্ত্রীর দেহগঠনের সঙ্গে পুত্রের দেহগঠনের অপরূপ মিল । তাঁরা একসূত্র থেকে উদ্ভূত ।

টেনিসের মর্ত্যজীবনের তিনটি অবস্থার সমালোচনা করেছেন । প্রথমে মর্ত্য জীবনের আদি কারণ আলোচনা করলেন , পরে তার জন্ম অর্থাৎ মনুষ্য শরীর বৃত্তান্ত ও পরে তার পার্থিব জীবন আলোচনা করলেন । কবি বললেন , "তুমি বাঁচিয়া থাক , তুমি কাজ কর , তোমার জীবন পূর্ণতা প্রাপ্ত হউক ও অবশেষে যথাসময়ে অতি ধীরে ক্রমে তাহার অবসান হউক ।" স্পষ্টত: দেখা গেল , জীবনের সূচনা হল , জীবন শেষ ও হল । জীবনের সমাধিস্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে দূরান্তের দিকে তাকিয়ে কবি দেখলেন , তাঁর জীবন শেষ হল এবং সন্তানের জীবন দীপও নিভে গেল । কিন্তু সন্তানের এই পৃথিবীতে আগমনের সূত্র থেকে গেল । কবি অনন্তপথের পথিককে দেখলেন। পথের মধ্যে তার বাস , পৃথিবীর অতিথি সে । এই অতিথিকে সন্তান বা মনুষ্য বলা যেতে পারে । এই অতিথি , সন্তান বা মনুষ্য ফুরায় , কিন্তু পথিক ফুরায় না । আসলে , তিনি মহাকালের অতিথিকে সম্ভাষণ করলেন । তিনি দেখলেন , এই পথিক সৌর জগতের জ্যেষ্ঠ ভাই । রবীন্দ্রনাথ বলেছেন , "প্রথম সম্ভাষণে তিনি (টেনিসন) কোটি কোটি যুগ ও আবর্ত্যমান আলোকেও নির্মাণ শালার উল্লেখ করিয়াছেন , অপরিবর্তনীয় পরিবর্তনের জগতে ক্রমোন্মানশীল জীবনের উল্লেখ করিয়াছেন এবং কহিয়াছেন --

With this last moon, this crescent-her dark orb
Touch'd with earth's light-thou Comest

অর্থাৎ মানুষের জন্মও এইরূপ চন্দ্রকলার ন্যায় ; তাহার একাংশ পৃথিবীর জীবন , পৃথিবীর বুদ্ধি পাইয়া আলোকিত হয় । দ্বিতীয় ভাগে যাহাকে সম্ভাষণ করিতেছেন

তাহার কারণ আলোচনা করিতে গিয়া কবি সময়ের সংখ্যা গণনা করেন নাই , নির্মাণের উপাদান করেন নাই । এইবার তিনি কহিতেছেন--

Out of the deep, my child, out of the deep,

....

Where of our world is but the bounding shore-

out of the deep, spirit, out of the deep

....

এবার কবি যে সমুদ্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন , তাহা আলোকের সমুদ্র নহে , অতীত বা ভবিষ্যৎ কালের দিকে তাহার উপকূল নাই , তাহা তিন কাল মগ্ন করিয়া বিরাজ করিতেছে । জগতের অন্তরস্থিত যথার্থ জগতের কথা বলিতেছেন । বাহ্য জগৎ সেই অন্তর্জগৎকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে মাত্র ।

Out of the deep, spirit, out of the deep,

With this ninth moon, that sends the hidden Sun

Down you dark sea, thou Comest, darling boy.

সেই সমুদ্র হইতে তুমি আসিতেছ । জ্যোতির্ময় সূর্যকে সমুদ্রতলে বিসর্জন দিয়া ক্ষীণালোকে চন্দ্র উদিত হইল । তাহার সঙ্গে সঙ্গে তুমিও উদিত হইলে , তুমিও মহাজ্যোতিকে বিসর্জন করিয়া আসিলে । পূর্বে যে মনুষ্যকে কবি সম্ভাষণ করিয়াছিলেন , সে অপরিস্ফুট এর অবস্থা হইতে পরিস্ফুটতা প্রাপ্ত হইয়াছে , এবারে যে আত্মাকে সম্ভাষণ করিতেছেন সে পূর্ণ অবস্থা হইতে অপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে ।" টেনিসন আত্মার আগমন সম্পর্কে বলেছেন যে আত্মা একজগৎ থেকে আর এক জগতে এসেছে । পূর্বের জগতকে গণনা করা যায় না , এখন যে জগতে এসেছে , সেখানে সূর্য নক্ষত্র ইত্যাদি আছে , শেষ করা না গেলেও গণনা করা যেতে পারে । আর অসীম দেশে অসীম কালে ছিল, এখন যে জগতে সে বিদ্যমান তার সীমা পাওয়া যাচ্ছে ।

অর্থাৎ সীমা–বিভক্ত অসীম ।

টেনিসন প্রথম সম্ভাষণে মনুষ্যভাবে তাঁর সন্তানকে বলেছিলেন :

Live, and be happy in thy self, and serve

This mortal race thy kin .....

বেঁচে থাক , তুমি সুখী হও , তোমার স্বজাতীয় জীবদিগকে সুখী কর ও অবশেষে বিনা কষ্টে ধীরে ধীরে মৃত্যু লাভ কর । মানুষের পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর কি আশীর্বাদ আছে ।

দ্বিতীয় সম্ভাষণে কবি বলছেন : "বাঁচিয়া থাক ।" এখানে বেঁচে থাকার অর্থ মর্ত্য জীবন নয় , অন-ত চেতনা । রবী-দ্রনাথ বলেছেন , জন্মে জন্মে যাহা ভাল তাহাই গ্রহণ কর , যাহা ম-দ তাহাই পরিত্যাগ কর । ও পদে পদে মৃত্যুর দ্বার সমূহ অতিক্রম করিয়া অমৃতের দিকে ধাবমান হও । দুইটি সম্ভাষণে দুই প্রকারের বিভিন্ন আশীর্বাদ কেন করিলাম ? না , প্রথমবারে আমি বস্তু (matter) ও সসীম অসীমকে সম্বোধন করিয়াছিলাম । দ্বিতীয়বার আমি তোকে সম্ভাষণ করিতেছি ; Who art "not matter, nor the finite - infinite, but this main miracle, that thou art thou, with power on thine own act and on the world."

কবি টেনিসন স-তানের কথা ভাবতে ভাবতে অন-তজগতে উপস্থিত হয়েছেন । এই অন-তমন্দিরে সেই গান শুনতে পেলেন তিনি , যে গান বৈদিক ঋষিরা গেয়েছেন ।

Hallowed be Thy name - Halleluiah !

Infinite Ideality !

Im measurable Reality !

Infinite personality !

অন-তভাব । অপরিমেয় সত্য । অপরিসীম পুরুষ । অন-তভাবে আমাদের নিকটবর্তী নয় । কিছুতেই তার নিকট পৌঁছানো যায় না । অবশ্য তাকে সত্য বলতে বাধা নেই । অনেকটা তা কাছে মনে হয় । কি-তু তাতে আমাদের তৃপ্তি নেই । কবির পৌত্র Charles Tennyson এটিকে " Forces in time and space, as nearly infinitive." বলেছেন । এই সত্য অ-ধ শক্তি- , অ-ধকারণ বলে মনে করি । আবার যখন তাঁকে অসীম পুরুষ বলে ভাবি , তখন তাঁর একটা সত্তার কথা মনে করে আন-দ অনুভব করি ।

টেনিসন De profundis কবিতায় বলেছেন , " We feel we are nothing - for all is Thou and in Thee."

যখন আমরা তোমার মধ্যে ছিলাম তখন আমরা অনুভব করতাম না যে আমরা কিছু, সকলেই তুমি। ইহাই আমাদের ভাবমাত্র। তোমার মধ্যে আমরা ভাবমাত্রে অবস্থান করতাম। এই অতীত চিন্তা থেকে বর্তমান সময়ে এসে টেনিসন বললেন :

" We feel we are something - that also has come from Thee."
এটি বর্তমানের কথা, এটি আমাদের সত্য। আবার ভবিষ্যৎ ভাবনা নিয়ে কবি বললেন : "We know we are nothing - but Thou wilt help us to be
অপূর্ণ থেকে পূর্ণতার মধ্যে প্রবেশের আনন্দ আমরা চিরকালই ভোগ করব।

রবীন্দ্রনাথ সেই সব খ্রীষ্টানদের উপর বিরক্তি প্রকাশ করেছেন যাঁরা এই কবিতার ভিতরে প্রবেশ করতে পারেননি। অথচ বিদ্রূপ করেছেন। তিনি De profoundis কে কখনো ছোট মনে করেননি বরং Paradise Lost অপেক্ষা মহান মনে করেছেন। রবীন্দ্র আলোচনার এই পরিপ্রেক্ষিতে লক্ষ্য করা গেল বেদ উপনিষদের চিন্তাধারা টেনিসনের De profundis কে ঘিরে আছে। আর রবীন্দ্রনাথের সৃজনধর্মী গদ্য এবং কবিতা রচনাবলীর মধ্যে ভাবসূত্রের পরিচয় অঢেল।

রবীন্দ্রনাথ গ্লেন এডেন থেকে ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০ (২৯ মে ১৯৩৩) কল্যাণীয়া শ্রীমতী রমা দেবীকে আশীর্বাদ জানিয়ে "উত্তিষ্ঠত নিবোধত" কবিতাটি পাঠিয়ে দেন। এই কবিতাটির মর্মবাণী এবং টেনিসনের De profundis এর মর্মবাণী এক-ভাবনায় বিধৃত। সরাসরি মিলের কথাই বলা যায় বিশেষত
এর প্রথম সম্ভাষণ অংশে। সমুন্নত ভাবনায় জেগে ওঠার গান গেয়ে যাওয়ার পিছনে রবীন্দ্রনাথের পাহাড়-প্রকৃতির অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর ঘুম ভাঙার গান শুনলেই পাহাড়, দেবদারু, পাইন, ঝাউ যেন যাদুমন্ত্রে ঢেউ তোলে। রবীন্দ্র সাহিত্যে এই স্পর্শ ছড়িয়ে আছে, একটু লক্ষ্য করলেই অনুভব করা যায়। এই ব্যঞ্জনার সঙ্গে টেনিসনের De profundis এর অপূর্ব মিল। এই মিলযুক্ত অংশগুলি পাশাপাশি দেখানো হল। মিলের সূত্র টেনিসনের কবিতা পাঠে রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া এবং স্থানানুষঙ্গ খুব কাজ করেছে।

Out of the deep, my child, out of the deep,
Where all that was to be, in all that was,
Whirl'd for a million aeons thro' the vast

Waste dawn of multitudinous - eddying light -
Out of the deep, my child, out of the deep,
Thro' all this changing world of changeless law,
And every phase of ever - heightening life,
Perfect, and prophet of the perfect man;
... ...
Live, and be happy in thyself, and serve
This mortal race thy kin so well, that men
May bless thee as we bless thee,
... ...

'জয় করে নিতে হয় আপনার জীবন মরণ
আপন অক্লান্ত বলে দিনে দিনে ; যা পেয়েছ দান
তার মূল্য দিতে হবে , দিতে হবে তাহার সম্মান
নিত্য তব নির্মল নিষ্ঠায় । নহে ভোগ , নহে খেলা
এ জীবন, নহে ইহা কালস্রোত ভাসাইতে ভেলা
খেয়ালের পাল তুলে । আপনারে দীপ করি জ্বালো ,
দুর্গম সংসার পথে অন্ধকারে দিতে হবে আলো ,
সত্য লক্ষ্যে যেতে হবে অসত্যের বিঘ্ন করি দূর ,
....
অনিত্যের যত আবর্জনা
পূজার প্রাঙ্গণ হতে নিরালস্যে করিবে মার্জনা
প্রতিক্ষণে সাবধানে , এই মন্ত্র বাজুক নিয়ত
চিন্তায় বচনে কর্মে তব —উত্তিষ্ঠত নিবোধত ।''

ব্রাউনিং ১৮৪৩ সালে A Blot in the 'Scutcheon কাব্যনাট্যটি রচনা করেন । এটিকে বাংলা ''একটি পারিবারিক কলঙ্ক'' বলা যেতে পারে । ব্রাউনিং এটিকে ট্রাজেডি রূপে অভিহিত করেছেন । কাহিনী অংশে দেখা যাচ্ছে , মিলড্রেড

ট্রেশহাম সুরূপা কুমারী অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন । তিনি শিক্ষিতা এবং মাতৃপিতৃহীনা । তাঁর দাদা থোরোল্ড , আর্ল ট্রেশহাম বাড়ীর অভিভাবক । প্রাচুর্য্যের মধ্যে তাঁরা লালিত পালিত । মিলড্রেড ট্রেশহাম , হেনরী আর্ল মারটাউন এর ভালবাসার জালে জড়িয়ে পড়েন । হেরী আর্ল মার টাউন সুশ্রী শিক্ষিত যুবক , অভিজাত বংশে জন্ম এবং বিশাল সম্পত্তির মালিক । ট্রেশহাম ও মারটাউন পরিবারের জমিজমা পাশাপাশি অবস্থিত । একদিন হেরী আর্ল মারটাউন পাখি শিকার করতে এসে মিলড্রেডকে দেখেন । প্রথম দর্শনেই তাঁকে ভালোবাসেন । কালক্রমে মিলড্রেড ও হেনরী আর্ল মারটাউন রাতের গভীরে প্রায়ই মিলড্রেডের ঘরে মিলিত হন । মিলড্রেডের ঘরই উপযুক্ত স্থান । মিলড্রেডের ঘরের পাশে একটি গাছকে অবলম্বন করে জানালা গলে হেনরী মিলড্রেডের ঘরে প্রবেশ করেন । একদিন ট্রেশহাম পরিবারের বৃদ্ধ প্রধান কর্মচারী তাঁদের এই মিলনের কথা জানতে পারে । সে একদিন যথারীতি প্রভুকে (থোরোল্ড , আর্ল ট্রেশহাম) এই বিষয়ে অবহিত করে । থোরোল্ড জানেন না , রাতের অনুপ্রবেশকারী ও তাঁর পছন্দ করা হেনরী , আর্ল মারটাউন একই ব্যক্তি । এদিকে তিনি তাঁর সঙ্গে মিলড্রেডের বিয়ের প্রস্তাব সরাসরি রাখেন । মিলড্রেড তাতে কোন আপত্তি তোলেন না । সম্মতি জানান । থোরোল্ড অবাক হয়ে যায় , কি করে তা সম্ভব । তিনি ভাবলেন , রাতের প্রণয়ীকে আগে দেখা দরকার । তাই তিনি লুকিয়ে হেনরী আর্ল মার টাউনকে ধরে ফেলেন এবং পাপকর্মের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাঁকে (হেনরী) হত্যা করেন । মারটাউনের জীবনের শেষ মুহূর্তের অনুরোধ এবং তাঁর প্রাণের কথা থোরোল্ড মিলড্রেডের নিকট পৌঁছে দেন । থোরোল্ড তাঁর বোনের নিকট গিয়ে দেখেন , মিলড্রেড বিষ পান করেছেন এবং মৃত্যুর প্রহর গুণছেন । দুই মৃত্যুর পাশাপাশি থোরোল্ডও আত্মহত্যা করেন ।

রবী-দ্রনাথ এই কাব্যনাট্যটি দার্জিলিঙের কাসলটন হাউসে আত্মীয় পরিজনকে আবৃত্তি করে শোনাচ্ছেন এবং অর্থ বুঝিয়ে দিচ্ছেন । কাসলটন হাউসের দিকে তাকালে A Blot in the 'Scutcheon-এর ঘটনাভূমি বলে মনে হবে । পাহাড়ের কোণে দ্বিতলবাড়ীর ঘরের কাঁচের জানালা সবটাই খোলা যায় এবং অনায়াসেই কল্পনা করা যায় , হেনরী আর্ল মার টাউনের মত ব্যক্তি-র এখানে অনুপ্রবেশের কোন বাধা নেই । ট্রেশহাম পরিবারের বিরাট বাড়ীর অনেকখানি মিল খুঁজতে পাঠক ও দর্শকের

কষ্ট হবে না। বিশেষ করে রবী-দ্রনাথের মত উজ্জ্বল অ-তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির কথা আলোচনাতীত। পাহাড় প্রকৃতির মাঝে নির্জনতা এবং করুণ রসের কাহিনী পড়ে, অন্যান্যদের বলতে তাঁর ভালই লেগেছিল। কাব্যনাট্যটির মধ্যে বিরাট কিছু ব্যঞ্জ-ব্য নেই। তবু এই সু-দর পরিবেশের মধ্যে বিশেষ করে প্রকৃতির অকৃপণ হাতছানি তাঁকে কাব্যনাট্য পাঠে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং তাঁর কাব্যনাট্য পাঠের সূত্র খুঁজতে পাঠককে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।

ব্রাউনিং এই কাব্যনাট্যটি করুণ রসসিক্ত এবং প্রথমেই ট্রাজেডি বলে উচ্চারণ করেছেন। মিলড্রেড ট্রেশহাম ও হেনরী আর্ল মারটাউনের পরস্পর মিলনের মধ্যে পাপবোধ কবি উপলব্ধি করেছেন। ভিকটোরীয় যুগে নীতিবোধ প্রবল ছিল। কবি তার বাইরে আসতে পারেন নি।

রবী-দ্রনাথের চি-তাধারায় এবং তাঁর সাহিত্যে নীতিবোধ যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রাচ্য ভাবধারার এই তো সূত্র। A Blot in the 'Scutcheon- এর ভাবগত ঐক্য রবী-দ্র সাহিত্যে সাদৃশ্যমান থাকায়, এই কাব্যনাট্যটি সততই রবী-দ্র-নাথের ভাললাগার কারণ। এ ছাড়া রবী-দ্রনাথ উল্লিখিত কাহিনীর মধ্যে ট্রাজেডির উপলক্ষণ দেখতে পেয়েছেন। যেমন স্মরণ করা যায়।

১. imitation of an action that is serious :
২. in language embellished with each kind of artistic ornament ..
৩. in the form of action, not narrative
৪. through pity and fear .....

বিষয়বস্তুর দিক থেকে ট্রাজেডির উপস্থাপ্য বিষয়— " action that is serious" অর্থাৎ মানুষের জীবনের সেই সমস্ত ঘটনা যা মানুষের মনে ভয় ও করুণা উদ্রেক করতে সাহায্য করে। এখানে মিলড্রেড, থোরোল্ড ও হেনরী আর্ল মারটাউনের জীবনবৃত্তের কথা জানা হয়ে গেল। এঁদের মধ্যে মৃত্যু বা বিচ্ছেদ অপূর্বভাবে খেলা করেছে। মার টাউন ও ট্রেশহাম এক পরিবারভুক্ত না হলেও তাঁদের মধ্যে গভীর সম্পর্ক গড়ার সুযোগ ছিল। এই ধরণের কাজকে সাংঘাতিক বলে মনে করতে দ্বিধা নেই। তাঁদের ঘটনাবলীর সূত্র পর্যবেক্ষণে মনে হবে -- " these are the situations to be looked for by the poet."

তবে এই ঘটনার মাধ্যমে মহিমাবোধ, নীতিবোধ ও শ্রেয়োবোধ অতি সুন্দরভাবে এসে পড়েছে। মিলড্রেড ও হেনরীর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব গভীর ও তীব্র যেন দুই পক্ষের সমান সমান শক্তি। তাঁদের মানসিক ও দৈহিক দুঃখবেদনা জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে এবং এই কাহিনী "have done or suffered something terrible." উভয়েই জীবনের কামনাবশে, জীবনের উচ্ছল মুহূর্তে ভবিষ্যতের মহৎ দিনগুলিকে অকালে হারালেন। আত্মহনন ও মৃত্যুর নিকট নিজেকে সঁপে দিয়ে শোচনীয় রিক্ততার সমাপ্তি তাঁরা ঘটিয়েছেন। এখানে জীবন " does something terrible."

ট্রাজেডির নায়ক হেনরী আর্ল মার টাউনের কথা অবশ্যই স্মতব্য। তাঁর প্রসঙ্গে মনে করা যায়: " imitations which excite pity and fear, this being the distinctive mark of tragic imitation."
ট্রাজেডির নায়ক "সিরিয়াস" অর্থাৎ ট্রাজেডি নায়কের গৌরব থাকা চাই, গুরুত্ব থাকা চাই, অবশ্যই চিত্তাকর্ষক হওয়া চাই। এ কথা ঠিক হেনরীকে highly renowned and prosperous বলে চিহ্নিত করা সমীচীন নয়। এ ধরণের চরিত্রকে higher type বলা যায়। মোটের উপর সদ্‌গুণসম্পন্ন বললে ভুল হয় না। হেনরীর মধ্যে ধন, মান এবং গুণ বিদ্যমান। তাঁকে ট্রাজেডির নায়ক বলতে বাধা নেই। তবে তাঁর মধ্যে ট্রাজেডির উপযুক্ত রস tragic impression (ভয় ও করুণা) উল্লেখ্য নয়। বলিষ্ঠ নায়কের গুণাবলী ব্রাউনিং উপস্থিত করতে পারেননি। তাঁর কথা চিন্তা করবার সময় ইডিপাস, অরিস্টিস, মিলিশের প্রিয়েস্টিস, টেলিফাস প্রভৃতির কথা নিশ্চয়ই ব্রাউনিঙের মনে ছিল। এটিকে এথিকাল ট্রাজেডি (নীতি প্রধান) বলা উচিত। ঘটনাই এই কথা বলে দেবে। A Blot In the 'Scutcheon পাশ্চাত্য ট্রাজেডিরস রবী-দ্রমানসে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল নিঃসন্দেহে বলা যায়। তির্যক মিলের অনুমঙ্গ উপলব্ধির বিষয়। এই কাব্যনাট্যের ব্যথার সুর মানসী-কাব্যের একটা স্তরে বিধৃত হয়েছে। নিষ্ফল কামনা, বিচ্ছেদের শান্তি, সংশয়ের আবেগ, তবু কবিতাবলী উল্লেখ্য।

দার্জিলিঙ বাসকালে রবী-দ্রনাথ সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। সরলা রায় (ডকটর পি.কে.রায়ের স্ত্রী) তাঁকে মেয়েদের জন্য গীতিনাট্য লেখার আবেদন করেন। এই অনুরোধ

রাখতে তিনি এখানেই "মায়ার খেলা"[১] গান রচনা শুরু করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে সরলা দেবী তাঁর "জীবনের ঝরাপাতা" গ্রন্থে লিখেছেন "সেই সময় পিঠে একটা ফোড়ায় যখন শয্যাশায়ী তখন শুয়ে শুয়ে "মায়ার খেলা" গীতিনাট্য রচনা আরম্ভ করেন। প্রতিদিন একটি দুটি করে গান রচনা করতেন ও সঙ্গে সঙ্গে আমায় লিখিয়ে দিতেন।" মানসীর কবিতাবলীর একটি অংশ এই সময় রবীন্দ্রনাথ লিখছেন। তারিখের উল্লেখ না থাকলেও পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে দার্জিলিঙের নিসর্গ পুরোপুরি রচনায় প্রভাব ফেলেছে। মানসী কাব্যে তাঁর কাব্যশিল্প মর্যাদা লাভ করল। সাধারণভাবে লক্ষ্য করা গেছে যে, "মানসী" থেকে "ক্ষণিকা' পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-মানব সমন্বিত-শিল্পযুগ। প্রকৃতির সঙ্গে মানবের সৌন্দর্য প্রেমের বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে। এই পর্বে কাব্যের গঠন বৈচিত্র্য, ভাবময়তার স্বীকৃতি দেখা গেল। নিঃসন্দেহে রোমান্টিকতায় এই কাব্যকে শ্রেষ্ঠ বলা যায়। শব্দ চয়ন, ছন্দ, ভাব ও কল্পনাকে সার্থকরূপ দিতে তিনি নিপুণ। এই কাব্যে সৌন্দর্যকে ইন্দ্রিয় চেতনার অতীত, অসীম ও অখণ্ডরূপে তিনি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। প্রেম জন্ম জন্মান্তরে অনন্ত এবং সাধনার বিষয় তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন। সন্ধ্যা সঙ্গীতে তিনি হৃদয়-গুহার অন্ধকারের আবদ্ধ-বিশ্ব ও প্রাণ তরঙ্গের বিচ্ছিন্নভাবে দুঃস্বপ্ন দেখছেন। 'প্রভাত সঙ্গীতে' এসে তিনি বিশ্ব-প্রকৃতি ও বিশ্ব মানবের সঙ্গে মিলিত হলেন। 'ছবি ও গানে' কবি প্রকৃতি ও মানবের সাবলীল সৌন্দর্য নিজের মনে রঙীন করে উপভোগ করলেন। 'কড়ি ও কোমলে' কল্পনার রঙীন ব্যবধান মুছিয়ে দিয়ে মানবজীবনের মুখোমুখি উপস্থিত হলেন। এর পরই কবিকে মানসীতে পেলাম।

রবীন্দ্রনাথের এই ভ্রমণ পর্ব কতখানি আনন্দের ও উপভোগের বিষয় হয়ে উঠেছিল, তা তাঁর সঙ্গী স্বর্ণকুমারী দেবী দার্জিলিঙ থেকে বিদায় নেওয়ার প্রাক্কালে তাঁর ব্যথাভরা মনের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন, "সৌন্দর্যের পূর্ণ অনুভবই যদি ভালবাসা হয়, আর সুন্দরের সহিত মিলনলাভই যদি ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা হয়, তবে এমন সুন্দর এমন মধুর যে দৃশ্য তাহার নিকট হইতে বিদায় লইতে যদি প্রাণ না কাঁদিবে ত কাঁদিবে কিসে ? ......এখানকার দৃশ্য দেখিয়া আমার এখনো আশা মেটে নাই। গাছপালা মেঘ পর্বত যা দেখি তাহাতেই ভোর হইয়া থাকি, আর নূতন প্রেমিকের মত মনে হয়, চিরদিন এই দৃশ্যের মধ্যে থাকিলেও আমার নিকট ইহা পুরাতন হইবে না।"

এইবার দার্জিলিঙে অবস্থানকালে কবির সঙ্গে দেখা হয়েছিল কোচবিহারের মহারানী সুনীতিদেবীর। দার্জিলিঙে কোচবিহারের রাজপরিবারের দুটো বিখ্যাত বাড়ি ছিল - ক্যাসলটন ও হার্মিটেজ। এই বাড়ি দুটোতে বসে কবি সুনীতিদেবীকে গান শোনাতেন। এ ছাড়া দার্জিলিঙের রাস্তায় বেড়ানোর সময় সুনীতিদেবীকে গল্প শোনাতেন। এ প্রসঙ্গে মহারানী সুচারুদেবীর জীবনীকার প্রভাত বসুর লেখা থেকে জানা যায়, "সেবার রবী-দ্রনাথ দার্জিলিঙে গিয়েছেন। কুচবিহারের মহারাণী সুনীতিদেবী ছিলেন সেখানে। কেবলই রবী-দ্রনাথের মুখে গল্প শুনতে চাইতেন তিনি। .....সুনীতি দেবীর তাগিদে মুখে মুখে রচিত হল রবী-দ্রনাথের মণিহারা।" রবী-দ্রনাথ মাসখানেকের বেশী দার্জিলিঙে থাকেন নি। ক্যাশবহি-র হিসাবে দেখা যায় "রবী-দ্রবাবু মহাশয় মাসিক সমাজ উপলক্ষ্যে ৭ কার্তিক (রবি 23 Oct.) আসিবার গাড়ি ভাড়া"—সুতরাং এর পূর্বেই তিনি ফিরে এসেছিলেন। আর একটি হিসাবে দেখি "শ্রীযুক্ত দ্বিপে-দ্রনাথ ঠাকুর ও বাবু অরুণে-দ্রনাথ ঠাকুর ও বাবু নীলমাধব হালদার দিগের আশ্বিন মাসে দারজিলিং বেড়াইতে যাতায়াত ব্যয় .....৪০৮ ।৵৩।" ডা: নীলমাধব হালদার ঠাকুর বাড়ির বেতনভোগী চিকিৎসক —তবে কি রবী-দ্রনাথের অসুস্থতা এতদূর হয়েছিল যে, কলকাতা থেকে ডাক্তার পাঠাতে হয়েছিল তাঁকে নিয়ে আসার জন্য ?

যাই হোক, আসার সময়ে স্ত্রী—কন্যাদিকে দার্জিলিঙেই দ্বিজে-দ্রনাথ --অরুণে-দ্র-নাথদের হেফাজতে রেখে এসেছিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর লেখাতেও এই তথ্য পাওয়া যায়: "তোমাকে যখন চিঠি লিখি, তারপর থেকে আমাদের এখানকার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে, তখন আমরা এখানে যে কয়জন ছিলাম তার মধ্যে কেহ কেহ বাড়ী গিয়াছেন, আবার বাড়ী হইতেও কেহ কেহ এখানে আসিয়াছেন। আমাদের সে পড়াশুনার মজলিস অনেকদিন ব-ধ হইয়াছে।"[১০]

কলকাতায় ফিরে এসে রবী-দ্রনাথ পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতেই ওঠেন। কি-ন্তু কোমরের বাত তখনও তাঁকে ছাড়েনি। পার্ক স্ট্রীট থেকে লেখা একটি পত্রে শ্রীশচ-দ্র মজুমদারকে এই খবর দিয়ে লিখছেন: "আমি প্রায় এক মাস কাল দার্জিলিঙে কাটিয়ে এলুম।...আমার কোমরে বাত হয়ে কিছুকাল শয্যাগত হয়ে পড়েছিলুম, এখনো ভালো করে সারিনি। তবে এখন বিছানা থেকে উঠে বসেছি। কি-ন্তু বেশিক্ষণ চৌকিতে বসে থাকতে পারি নে। পা টন্ টন করে। আমার কোমর ছাড়া পৃথিবীতে আর আর সমস্ত মঙ্গল। আমার স্ত্রী

কন্যা দার্জিলিঙে, আমি কলকাতায় ঘরে ব'সে বিরহ ভোগ করছি —কি-তু বিরহের চেয়ে কোমরে বাতটা বেশি গুরুতর বোধ হচ্ছে। কবিরা যাই বলুন, আমি এবার টের পেয়েছি বাতের কাছে বিরহ লাগে না।"

রবী-দ্রনাথ ১৮৯৫ (১৩০২) সালে একবার দার্জিলিঙ যান। তাঁর যাওয়া ও ফিরে আসার তারিখ অনুমান-নির্ভর হলেও তিনি যে এই সময়েই দার্জিলিঙ গিয়েছিলেন, সেটি জানা যায় সাধনার ক্যাশবহি-র ৫ জ্যৈষ্ঠ (শনি ১৮ মে) তারিখের হিসাব থেকে "বাবু রবী-দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট সাধনার বৈশাখ মাসে মাসকাবার পত্রিকা দার্জিলিং রেজিষ্টরি বুক পোস্টে পাঠান ব্যয় ৵৬। ২৬ বৈশাখ সত্যপ্রসাদ ১০০ টাকা 'রবি মামাকে হাওলাতে' দিয়েছিলেন, হয়তো দার্জিলিং যাওয়ার জন্যই রবী-দ্রনাথকে এই ঋণ গ্রহণ করতে হয়েছিল।

রবী-দ্রনাথ ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়কে একটি তারিখ-হীন চিঠিতে (শনিবার) লিখেছিলেন : "আমার একটি রুগ্না ভাতুষ্পুত্রীকে লইয়া আজই আমাকে দার্জিলিং যাইতে হইতেছে।" চিঠিটা এই সময়ে লেখা হওয়াই সম্ভব, কারণ এর পরেই তিনি লিখেছেন : "শীঘ্র বাড়ি বদল করা আপনার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক সন্দেহ নাই। যোড়াসাঁকোর কাছে হইলেই ভাল।" ঠাকুরদাসের স্ত্রীর বস-ত রোগ হওয়ায় তাঁর জোড়াসাঁকোর কাছে বাসা নিতে বলছেন। এই অনুমান সঠিক হলে রবী-দ্রনাথের দার্জিলিঙ যাত্রার তারিখটি ২১ বৈশাখ (শনি ১৮ মে, ১৮৯৫) বলে নির্ধারণ করা যায়। সম্ভবত ২৩ আশ্বিন ১৩০৩ (বৃহ ৮ অক্টোবর) ১৮৯৬ সালে রবী-দ্রনাথ রথী-দ্রনাথ ও দিনে-দ্রনাথকে নিয়ে দার্জিলিং যাত্রা করেন। এই অনুমানের কারণ ক্যাশ বহির উক্ত তারিখের একটি হিসাব; এদিন 'জায়' খাতে লেখা হয়েছে : "খোদ বাবু মহাশয়ের সঙ্গে ৩৫০৲ বাদ রেলভাড়া ২০০৲। ১৫০৲ সেয়ালদহায় গাড়ি ভাড়া ১৸৬। ৪৭৸৵ হিসাবটির সূচনা ১৮ আশ্বিন : দারজিলিং গমন জন্য ১১৵৬। শ্রীযুক্ত রবী-দ্র বাবু মহাশয় ও শ্রীযুক্ত রথী-দ্রবাবু ও শ্রীযুক্ত দিনে-দ্রবাবু মহাশয়দিগের দারজিলিং যাতায়তের ব্যয় ৫১৭।৵০"।

এই অনুমানকে যথার্থ ভেবে নেওয়ার কারণ বিদ্যমান। 'দুরাশা'[১১] গল্পটির রচনা-প্রসঙ্গে রবী-দ্রনাথ বিপিনবিহারী গুপ্তকে বলেছিলেন : "দার্জিলিঙে একদিন কুচবিহারের মহারানী বলিলেন — "আসুন সকলে মিলিয়া একটা গল্প রচনা করা যাক,

আগে আপনি আরম্ভ করুন।" আমি আমাদের বাঙ্গালী - সমাজ ছাড়া একটা romantic গল্পের অবতারণা করিবার প্রয়াসে বলিলাম – "আচ্ছা, বেশ" এই বলিয়া আরম্ভ করিয়া দিলাম — "দার্জিলিঙে ক্যালকাটা রোডের ধারে ঘন কুজ্ঝটিকার মধ্যে বসিয়া একটি হিন্দুস্থানী রমণী কাঁদিতেছে।" এই বলিয়া আমি ছাড়িয়া দিলাম। কিন্তু দেখিলাম, গল্পটা অন্যের মুখে অগ্রসর হইতে চাহিল না; অগত্যা আমাকেই সমস্তটা রচনা করিয়া লইতে হইল; এই রকম করিয়া আমার 'দুরাশা' গল্পটি রচিত হইয়াছে।"

'দুরাশা' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল বৈশাখ ১৩০৫ এ।এর আগে আশ্বিন-কার্তিক ১৩০৩এ দার্জিলিঙ অঞ্চলে যাওয়া ছাড়া এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ আর সেখানে যান নি। তাহলে অনুমান করতে হয় যে, ২৩ আশ্বিন ১৩০৩ এ রথীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথকে নিয়ে তাঁর দার্জিলিঙ যাওয়ার যে হিসাব ক্যাশবহি-তে পাওয়া যায় তা ঠিক—তখন তাঁরা দার্জিলিঙেই গিয়েছিলেন, সেখান থেকে ত্রিপুরা-রাজের আম-ত্রণে কার্তিকের শুরুতে যান কার্শিয়াঙে। রবীন্দ্রনাথ ২২ ভাদ্র ১৩১১(৭ সেপ্টেম্বর ১৯০৪) একটি পত্রে সুনীতি দেবীকে লিখেছেন: "এ বৎসরে দার্জিলিঙে যাইবার সম্ভাবনা আমি ত দেখি না। মেজো বৌঠাকরুণের সঙ্গে দীনু সেখানে যাইতেছে –তাহার কাছ হইতে অনেক গান শুনিতে পাইবেন। তখন আমাদের সেই আর একবার দার্জিলিঙে সম্মিলনের কথা স্মরণ করিবেন।" এখানে রবীন্দ্রনাথ এই বৎসরের দার্জিলিঙে ভ্রমণের কথা উল্লেখ করেছেন। ৭ আশ্বিন ১৩০৮ হেমন্ত বালা দেবীকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "অনেক কাল পূর্ব্বে একবার যখন দার্জ্জিলিঙে গিয়েছিলুম, সেখানে ছিলেন কুচবিহারের মহারাণী। তিনি আমাকে গল্প বলতে কেবলি জেদ করতেন। এই গল্পটা (দুরাশা) তাঁর সঙ্গে দার্জ্জিলিঙের রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে মুখে মুখে বলেছিলুম। মাস্টার মশায় গল্পের ভূমিকা অংশটা এবং মণিহারা গল্পটিও এমনি করে তাঁরই তাগিদে মুখে মুখে রচিত।"[১২]

"দুরাশা" গল্প প্রসঙ্গে আসা যাক। "দুরাশা' গল্পে প্রারম্ভেও উল্লেখ্য:
"দার্জিলিঙে গিয়া দেখিলাম, মেঘে বৃষ্টিতে দশ দিক আচ্ছন্ন। ঘরের বাহির হইতে ইচ্ছা হয় না, ঘরের মধ্যে থাকিতে আরো অনিচ্ছা জন্মে।" এই গল্পে পাহাড়ে পরিবেশের চিত্র অতি নিপুণভাবে গল্পকার রবীন্দ্রনাথ ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রকৃতি বর্ণনার স্থান অনেকখানি। আবার উল্লেখ করি, "হোটেলে প্রাতঃকালের আহার সমাধা করিয়া পায়ে মোটা বুট এবং আপাদমস্তক ম্যাকিন্টশ পরিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছে।

ক্ষণে ক্ষণে টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে এবং সর্বত্র ঘন মেঘের কুজ্ঝটিকায় মনে হইতেছে যেন বিধাতা হিমালয় পর্বতসুদ্ধ সমস্ত বিশ্বচিত্র রবার দিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া মুছিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছেন ।

জনশূন্য ক্যাল্‌কাটা রোডে একাকী পদচারণ করিতে করিতে ভাবিতেছিলাম — অবলম্বনহীন মেঘরাজ্যে আর তো ভালো লাগে না, শব্দ স্পর্শ রূপময়ী বিচিত্রা ধরণী মাতাকে পুনরায় পাঁচ ইন্দ্রিয় দ্বারা পাঁচ রকমে আঁকড়িয়া ধরিবার জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে ।

এমন সময়ে অনতিদূরে রমণীকণ্ঠের সকরুণ রোদনগুঞ্জন ধ্বনি শুনিতে পাইলাম । রোগশোক সঙ্কুল সংসারে রোদনধ্বনিটা কিছুই বিচিত্র নহে, অন্যত্র অন্য সময় হইলে ফিরিয়া চাহিতাম কি না সন্দেহ, কিন্তু এই অসীম মেঘরাজ্যের মধ্যে সে-রোদন সমস্ত লুপ্ত জগতের একমাত্র রোদনের মতো আমার কানে আসিয়া প্রবেশ করিল, তাহাকে তুচ্ছ বলিয়া মনে হইল না ।"

গল্পটি শেষ হয়েছে দার্জিলিঙের ভুটিয়া পল্লীর প্রসঙ্গ দিয়ে । যে মেঘাচ্ছন্ন পরিবেশ দিয়ে সুরটা তৈরী হয়েছিল, সেই মেঘ কেটে গিয়ে "স্নিগ্ধ রৌদ্রে নির্মল আকাশ' ঝলমল করতে লাগল ; তখন "এই সূর্যালোকিত অনাবৃত জগত দৃশ্যের মধ্যে সেই মেঘাচ্ছন্ন কাহিনীকে আর সত্য বলিয়া মনে হইল না ।"

পাহাড়ে আলো আঁধারের খেলা । আসলে কবির রোমান্টিক মনের রোমান্টিক পরিবেশ । রবী-দ্রনাথ খুব সু-দরভাবে দার্জিলিঙের আবহাওয়াকে কাজে লাগিয়েছেন ।

পাহাড় পরিবেশের চিত্র ফুটে উঠেছে । গল্পকার নিজেকে ঐ পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছেন একথা জোর করে বলা যায় ।

১৯০০ সাল দশ দিনের জন্য ত্রিপুরেশ্বর রাধা কিশোর দেব মাণিক্যের নিম-ত্রণে কবি দার্জিলিঙে যান । এর ঠিক পরের বছর ১৯০১ সালে মে মাসে রবী-দ্রনাথ দার্জিলিঙ আসেন । এবারে তাঁকে অনেকগুলি চিঠি লিখতে দেখছি । তাঁর চিঠিগুলি যেন নীহারিকার আলো, তাঁর চলমান জীবনের নানা পথের টুকরো টুকরো খবর আলো হয়ে দেখা যায় । এবার তাঁর আসার কারণ জগদীশ চ-দ্র বসুকে লেখা চিঠি থেকে বোঝা যাচ্ছে ।

মে ১৯০১

ব-ধু ,

অনেক দিন তোমার পত্র পাই নাই , আমিও লিখি নাই । তুমি লেখ নাই তাহার ভাল জবাবদিহি আছে – আমি যে লিখি নাই তাহার কারণ অতি ক্ষুদ্র অথচ বিপুল । নানা সাংসারিক সঙ্কটে বিজড়িত হইয়া আমি অত্য-ত পীড়িত চিত্তে আছি — কোন রকমে মনের অবসাদ ঝাড়িয়া ফেলিয়া লেখা পড়ায় মন দিতে চাই– কি-তু কম্‌লি নেই ছোড়তা ।

শরীরটা কিছু ক্লিষ্ট হওয়ায় সম্প্রতি মহারাজের সঙ্গে দার্জিলিঙে আসিয়াছি । তাঁহার আতিথ্যে ও প্রকৃতির শুশ্রূষায় শরীর ও মনের স্বাস্থ্য লাভ করিব প্রত্যাশা করিতেছি । কি-তু অধিক থাকিবার সম্ভাবনা নাই । কেন নাই , সে খবরটা তোমাকে দেওয়া যাক ।

বেলার বিবাহ এই মাসেই স্থির হইয়াছে । আর তিন সপ্তাহ মাত্র অবশিষ্ট আছে । আমি এমনি হতভাগ্য , আমার কোন ব-ধুই বিবাহে উপস্থিত থাকিবেন না । তুমি বিলাতে , লোকেন অষ্ট্রেবচ , মহারাজ সে সময় বোধ করি আগর তলায় , নাটোর নীল গিরিতে । আমার গৃহে এই প্রথম বড় কাজ - কি-তু তোমাদের অভাবে আমার উৎসব নিরান-দ হইবে । কি-তু তুমি এমন কোন ও তারহীন বিদ্যুদ্-যান এখনো কি প্রস্তুত কর নাই যাহা অবলম্বন করিয়া ব-ধুর আন-দ - উৎসবে প্রসন্ন মঙ্গলহাস্য বিকীর্ণ করিতে পার ? নব দম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করিয়ো। তোমাকে একটি কাজের ভার দিতে চাই । যুবরাজের জন্য বিলাত হইতে একটি ভাল শিক্ষক নির্ব্বাচন করিয়া পাঠাইতে হইবে । যুবরাজ ত্রিপুরা হইতে দূরে থাকিয়া সম্পূর্ণ তাঁহার শাসনাধীনে শিক্ষালাভ করিবেন । শিক্ষকটি বিজ্ঞান বিৎ হইলেই ভাল হয় । এরূপ গুরুতর দায়িত্ব সকন্ধে লইতে তুমি সঙ্কোচ বোধ করিতে , আমি জানি , কি-তু তবু তোমাকে লইতে হইবে । অবশ্য , তুমি যাহাকে ভাল মনে করিয়া বাছিয়া দিবে ভারতবর্ষের জল হাওয়ার গুণে দুই দিনেই সে ম-দ হইয়া দাঁড়াইতে পারে --মহারাজা সেজন্য তোমাকে দোষী করিবেন না । বর্তমানে তুমি যাঁহাকে যোগ্য এবং ভাল মনে করিবে , যিনি যুবরাজকে যথোচিত সংযমে রাখিতে পারিবেন , অথচ অনাবশ্যক উদ্ধত হইবেন না এমন একটি লোক দেখিয়া , তাহার বেতন প্রভৃতি কিরূপ হইতে পারে জানিয়া লিখিবে ।

বঙ্গদর্শন কাগজখানি পুনর্জীবিত হইতেছে । আমাকে তাহার সম্পাদক করিয়াছে । মহারাজও এই পত্রটিকে আশ্রয় দান করিয়াছেন । কন্যাকে বিদায় দিয়া এই পত্রের প্রতি মন দিতে হইবে ।

তোমাকে বেলার হাতে কবির কপি-করা একখানি খাতা পাঠাইয়াছি, নিশ্চয়ই পাইয়াছ ।

বধূ জায়াকে আমার নববর্ষের সাদর অভিবাদন জানাইবে । শুনিলাম, তিনি অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে প্রবাসী বাঙ্গালীকে মাছের ঝোল ভাত খাওয়াইয়া পুণ্য লাভ করিতেছেন — তাঁহার মাছের ঝোল এখন ও ভুলি নাই ।

তোমার রবি

প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত একটি চিঠি উল্লেখ করা যায় ।

মে ১৯০১

ভাই,

আমার চিঠির উত্তর এই খানেই দিয়ো । দার্জিলিঙে আমার ঠিকানা কি এখনো তা জানিনে । ইচ্ছা ছিল দীর্ঘকাল দার্জিলিঙে কাটাব কি-ন্তু বেলার এই বিবাহের উদ্যোগে চট্‌পট্ চলে আসতে হবে ।

তুমি ফস্ করে দার্জিলিঙে এসে পড় না । স্যানিটোরি য়ামে উঠে পড়তে পারে । বোধ হয় মহিমের প্রসাদ রাজাশ্রয় ও পেতে পারবে । তাহ'লে পরিচয়েরও সুবিধা হবে । এ প্রস্তাব যদি সমীচীন বোধ কর তাহলে যেদিন চিঠি পাবে সেই দিনই ছাড়লে একত্রে দার্জিলিং যাওয়া যেতে পারবে । নচেৎ তার পরদিন ছেড়ো । কারণ আমি হয়ত দিন চারেক থাকব । কি-ন্তু বিবাহের দিন যখন নিশ্চয়ই পিছবে তখন তাড়াতাড়ি ফেরবার কি দরকার আছে ? ৬ মাসের রিটার্ণ টিকিটই নেই তার পরে যা থাকে অদৃষ্টে ।

বাঁকা করে ধরার দরুন চিঠিখানা বেঁকে গেল নইলে (সুভ)াবত আমার বাঁকা চাল নয় সে তোমাকে বলা বাহুল্য ।

তোমার রবি

ও

দার্জিলিং ১ মে

১৯০১

দার্জিলিঙে। খবরাদি পেতে নিতা-ত উৎসুক। ঠিকানা : C/O H.H.The Maharaja of Tippera. অবিলম্বে চি-তা দূর করবে।

শ্রী

এই প্রসঙ্গে আর একটি চিঠি উল্লেখ করা যায়। ত্রিপুরার মহারাজা রাধা কিশোর মাণিক্য ১৩০৮ সালে ১৪ বৈশাখ (শনি 27 Apr) তারিখে রবী-দ্রনাথকে একটি পত্রে লিখছেন :

"আপনার পত্র পাঠে আপনি দার্জিলিং যাইতে ইচ্ছুক আছেন জানিতে পারিয়া বড় সুখী হইলাম। অনেক দিনের পর এখানকার ঝঞ্ঝাটগুলি এক প্রকার সুবিধা করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছি। এক্ষণে কিছু দিনের জন্য যথাসাধ্য বিশ্রাম লাভের চেষ্টায় আছি। হিমালয়ের মহান সৌ-দর্য্যের সহিত আপনার কবিতা ও সঙ্গীত সংযোগে আমার অবসর-কালের বিশ্রাম কত যে মধুময় হইবে তাহাই ভাবিয়া উৎসাহিত আছি। আপনার কবিতার খাতা ও দুই একখানা বই সঙ্গে লইবেন। আমিও দু'চারখানা সঙ্গে আনিতেছি।.... ২৩শে তারিখ সোমবার এখান হইতে যাত্রা করিব। মঙ্গলবার বিকালবেলা অনুমান ৪।।০ টার সময় কুষ্টিয়া ষ্টেশনে পৌঁছিব। তথা হইতে আমরা একত্রে যাইতে পারি। দার্জিলিংএ আমাদের জন্য যে বাড়ী ভাড়া করা হইয়াছে, তাহাতে আমাদের সকলেরই সঙ্কুলন হইবে।" –

দার্জিলিঙে রবী-দ্রনাথের স্বল্পকালীন অবস্থানের সময়ে কাব্যচর্চা ছাড়াও তিনি ত্রিপুরার রাজনৈতিক অবস্থা ও রাজকুমারদের শিক্ষা বিষয়ে রাধা কিশোরের সঙ্গে আলোচনা করেন। দার্জিলিঙে এবার কবির সঙ্গে কোচবিহারের মহারাজা নৃপে-দ্র-নারায়ণ ভূপ বাহাদুর ও মহারাণী সুনীতি দেবীর দেখা হয়েছিল।

গ্রীষ্মকালীন রাজধানী দার্জিলিঙে তখন বাংলার লেফটেনা-ট গবর্ণর স্যার জন উডবার্ণ থেকে আরম্ভ করে কলকাতার ইংরেজ –ভাবাপন্ন বহু নরনারী উপস্থিত ছিলেন। কেশবচ-দ্র সেনের দুই পুত্র করুণাচ-দ্র ও নির্মলচ-দ্রও তখন দার্জিলিঙে। এঁরা রবী-দ্র-নাথের ব-ধু স্থানীয় ছিলেন। এঁদেরই সাহায্যে রবী-দ্রনাথ দুই রাজার সম্মিলন ঘটান। কি-তু অসুস্থতা ও মাধরীলতার বিবাহের আয়োজনের জন্য তাঁকে সম্ভবত ৪ জ্যৈষ্ঠ (শনি 18 May, 1901) শিলাইদহে ফিরে আসতে হয়। কুষ্টিয়া থেকে তিনি রাধা কিশোর কে লেখেন : "কোচবিহারের মহারাজের সহিত মহারাজের

কিরূপ সম্মিলন ও পরামর্শ হইল তাহা জানিবার জন্য আমি নিরতিশয় উৎসুক আছি। দুই মহারাজের মধ্যে বন্ধুত্ব হইলে মন্ত্রণাদি দ্বারা উভয়ে বললাভ করিবেন। ইহা মনে করিয়া আমি পরিশেষে উদ্যোগী হইয়াছিলাম এবং করুণা ও নির্ম্মলের সহায়তায় এই অভিলষিত মিলন সংঘটনের উপায় উদ্ভাবন করিতে ছিলাম। এই মিলনে আমি উপস্থিত থাকিতে পারিলে বড়ই আনন্দ লাভ করিতে পারিতাম। আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য ঠিক সময়টিতে আমাকে চলিয়া আসিতে হইল। রাজকার্য্য সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের সহিত কোন গুরুতর আন্দোলন উপস্থিত হইলে নিঃস্বার্থ, নিরপেক্ষ ও মহারাজের সমশ্রেণীর ব্যক্তিদের সহিত পরামর্শ যোগে মহারাজের সেই অভাব মোচন হইবে কল্পনা করিয়া আমি আশ্বস্ত হইতেছি।" এই চিঠিটি দার্জিলিঙে কবির অবস্থান কালের সূত্র ধরে তুলে ধরা হ'ল।

রবী-দ্রনাথ ১৯১৪ সালে পূজোর ছুটিতে দার্জিলিঙ আসেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন পুত্র রথী-দ্রনাথ ও পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "কবি উডল্যা-ড হোটেলে উঠেছেন এবং কবির সঙ্গে ছিলেন, রথী-দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবী।" কি-তু সোমেন গুপ্ত ('অমৃত" বিনোদন (১৩৮৪) সংখ্যা) তাঁর "প্রীতিস্নিগ্ধ রবী-দ্রনাথ - অতুলপ্রসাদ "প্রবন্ধে লিখেছেন, "কবিগুরু অবনী-দ্রনাথ –গগনে-দ্রনাথের অতিথি হয়ে "আসানটুলি" নামক বাড়িতে উঠেছিলেন।" সাহানা দেবী "স্মৃতির খেয়া" গ্রন্থে লিখেছেন, "হঠাৎ শুনলাম দার্জিলিঙে এসেছেন। আছেন "আসানটুলি" নামক বাড়িতে গগনে-দ্রনাথ অবনী-দ্রনাথের অতিথি হয়ে। সঙ্গে এসেছেন রথীবাবু ও প্রতিমাদেবী। তাঁরা উঠেছেন হোটেলে।

কবির সঙ্গে এবার দার্জিলিঙে দেখা হয়েছিল অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ ও কবি অতুল প্রসাদ সেনের। অতুল প্রসাদ উঠেছিলেন ডা: প্রসন্ন কুমার রায়ের "রুবি হল" নামক বাড়িতে। সাহানা দেবীও এসময় দার্জিলিঙে এসেছিলেন। কবির এ সময়ের দার্জিলিঙ বাসের ঘটনা সু-দরভাবে বর্ণনা করেছেন সাহানাদেবী তাঁর "স্মৃতির খেয়া" গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন, "অতুলদা আর আমি গেলাম কবির সঙ্গে দেখা করতে। বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে দেখি সামনে বসবার ঘরে একা বসে গগনে-দ্রনাথের কন্যা হাসি পিয়ানো বাজিয়ে গাইছেন রবী-দ্রনাথের গান - "চলি গো চলি গো যাই গো চলে"। অতুলদাকে দেখে কবি খুবই খুশী হলেন, ভারী স্নেহে করতেন তাঁকে। সেদিন কবি

বেশির ভাগ তাঁর বিদেশ ভ্রমণের কাহিনীটাই সবিস্তারে অনেকক্ষণ ধরে বলছিলেন । ....সেই আসরে সেদিন গগনেন্দ্রনাথ , অবনীন্দ্রনাথ , অতুলদা , অতুলপ্রসাদের জামাতা মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন । সাহানা দেবী আবার লিখেছেন , "একবার স্থির হলো "ঘুম রুক " বলে যে পাহাড়ের চূড়া আছে সেখানে বনভোজন খাওয়া হবে । স্যার নীলরতনের মেয়েরাও যাবে আমাদের সঙ্গে । দলে ছিলেন , প্রতিমাদি , রথীবাবু , অতুলদা , ডাক্তার দ্বিজেন মৈত্র ও আমি ।....তারপর চলল গান গাইবার জন্য অনুরোধ উপরোধ ...অতুলদা গাইলেন - "মিছে তুই ভাবিস মন । আকাশী দি (নীলরতন সরকারের মেজ মেয়ে) গাইলেন , আমিও গাইলাম । রথীবাবু গাইলেন রবীন্দ্রনাথের - তোমার কাছে শান্তি চাব না-গানটি ..."....।

এবার দার্জিলিঙ ভ্রমণ পর্বে বাংলাদেশের গভর্ণর লর্ড কার মাইকেল এবং লেডি কারমাইকেল দার্জিলিঙের রাজভবনে শরৎকালের সৌন্দর্য উপভোগ করছিলেন । লর্ড কারমাইকেল একদিন কবিকে গভর্ণর হাউসে তিব্বতী নাচ দেখার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন । এ ছাড়া লেডি কার মাইকেল কবিকে একদিন ভোজে নিমন্ত্রণ করেছিলেন ।

কবি ১৯১৫ সালে ১১ জুন দার্জিলিঙ থেকে এন্ড্রুজকে চিঠি লিখছেন । তার উত্তরে এন্ড্রুজ তাঁকে যে চিঠি লিখছেন তা লক্ষ্য করার বিষয় ।

ইন্ভেরার্ম , সিমলা ।
১৫ জুন ১৯১৫

পরম প্রিয় বন্ধু , ...

এইমাত্র দার্জিলিঙ থেকে লেখা আপনার চিঠিখানি পেয়েছি ।

....আজ সকালে আপনার চিঠিখানি হাতে নিয়ে এই বারান্দায় এসে বসেছি । বৃষ্টির পরে সূর্যের আলোয় এই পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে অনুভব করছি আমার হৃদয়াকাশ ও কত উজ্জ্বল , কত পবিত্র সুষমামন্ডিত হয়ে উঠেছে । আমার অন্তর্দেবতার গভীর কণ্ঠস্বর আমায় ডেকে বলছে — আজ যে সুখের স্পর্শ আপনার হাতে পেলাম —তা তাঁরই খুশির দান , তাঁর আপন আনন্দ এত রূপ পরিগ্রহ করছে ।

....মৃত্যুর পরে ও মৃত ব্যক্তির ব্যক্তিগত সংস্পর্শ এবং পূর্ব পরিচিতির নিদর্শনের জন্য ইংরেজ কবি টেনিসনের মনে যে আকাঙ্ক্ষা ছিল তা যে সম্পূর্ণ অর্থহীন ও অসুস্থ মনের

পরিচায়ক — সে আপনি ঠিকই বলেছেন। এতে করে যে-প্রেম বস্তুতঃ অসীম, তার উপরে সীমারেখা টেনে দেওয়া হয়। অসুখে পড়ে থেকে এ-বিষয়ে আমি বার বার ভাবছি। সত্য ও সহজ প্রেমের যিনি দেবতা, তিনি একে বন্ধনমুক্ত করতে চান। অবশেষে অহং এর বন্ধন থেকেও তা মুক্ত হবে। যে আনন্দ সীমাহীন তারই মধ্যে সে তার সার্থক স্বর্গ খুঁজে পাবে। সেই অসীমে পৌঁছবার প্রয়াসে তারমধ্যে যে টুকু মানবীয় — যা স্থান কালের সীমায় আবদ্ধ তাও অমরতা লাভ করবে। সে-টপলের একটি উক্তির ইঙ্গিত বার বার মনে লেগেছে। তিনি একবার বলেছিলেন "যীশুর অন্তরেই তোমাদের পাবার যে একান্ত কামনা— আমার — তার সাক্ষী স্বয়ং ভগবান।" তাঁর নিজের অন্তরে নয়, মহত্তম প্রেমের অন্তরে।.....

কখনো যদি সিমলা আসেন, এ বাড়িতে এ সেই নিশ্চয় থাকবেন। বড়ো শান্ত নিরালা এর পরিবেশ।

একান্ত শ্রদ্ধানুরক্ত
আপনার চার্লি

রবীন্দ্রনাথ ১৯১৭ সালে জুন মাসে দার্জিলিঙ আসেন। তাঁর আসার কারণ কাদম্বিনী দেবী কে লেখা চিঠিতে মিলবে।

২৪ জুন ১৯১৭

কল্যাণীয়াসু

কিছুদিন দার্জিলিঙে ছিলাম। শরীর ভাল ছিল না। আমার বড় মেয়ে মাধুরীলতাকে জ্বরোগে ধরিয়াছে। সেইজন্য উদ্বিগ্ন আছি। বোধ করি কিছুকাল কলিকাতায় থাকিতে হইবে অথবা বায়ু পরিবর্তনের জন্য তাহাকে লইয়া অন্যত্র যাওয়ার প্রয়োজন হইবে। ইতি

১০ আষাঢ় ১৩২৪
শুভানুধ্যায়ী
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সীতাদেবী তাঁর "পুণ্য স্মৃতি" গ্রন্থে এর উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "এই সময় কবি কিছুদিন শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার মহাশয়ের বাড়ি Glen Eden

এ ছিলেন। .....এই সময় তাঁহার প্রথমা কন্যা বেলা দেবী অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহা কবির ঘোরতর উদ্‌বেগ ও অশান্তির কারণ হইয়াছিল। বেলা দেবীর অসুখ বেশী বাড়িয়া যাওয়ায় রবী-দ্রনাথ দার্জিলিং হইতে অল্প কিছুদিন পরেই কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন।" এই সময় স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুও দার্জিলিঙে গিয়েছিলেন এবং নীলরতন সরকারের বাড়ী Glen Eden এ উঠেছিলেন। তবে কবির সঙ্গে আচার্যের দেখা হয়েছিল কিনা জানা যায় না। এই সময়কার দার্জিলিঙের সামাজিক পরিবেশের চিত্র ধরা পড়েছে দিবাকর সেনের "ভারতীয় বিজ্ঞান চর্চার জনক জগদীশচন্দ্র" গ্রন্থে। দিবাকর সেন লিখেছেন, "সে সময় শুধু জগদীশ চন্দ্রই নন, বহু বিখ্যাত ব্যক্তিরাও নিয়মিত দার্জিলিং যেতেন। তাঁদের মধ্যে রবী-দ্রনাথ ঠাকুর, নীলরতন সরকার, গগনে-দ্রনাথ ঠাকুর, অবনী-দ্রনাথ ঠাকুর, প্রভাসচন্দ্র মিত্র, ভূপে-দ্রনাথ দত্ত, ব্রজেন শীল, অধ্যাপক মনমোহন ঘোষ, রথী-দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ। এঁরা প্রায়ই মিলিত হতেন। নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। নানা শিক্ষামূলক বক্তৃতারও বন্দোবস্ত হতো।"

রবী-দ্রনাথ এবার দার্জিলিঙ এলেন, ১৯৩১ সালের ১৭ মে (১৩৩৮ জ্যৈষ্ঠ ৩) এবং ১লা জুলাই (১৬ আষাঢ়) পর্যন্ত অবস্থান করেন। এই সালেই আবার তিনি ২৩ অক্টোবর (৬ কার্তিক, বিজয়া দশমী) এই শৈল শহরে আসেন এবং ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত থাকেন। এই দুই পর্বে তিনি দার্জিলিঙের আসানটুলি ও গ্লেন ইডেনে ছিলেন। এই বাড়ী দুটি শৈলশহরে প্রবেশের মুখে হিকার্ট রোড থেকে প্রায় হাজার ফুট উপরে অবস্থিত। আসানটুলির বাড়ীটি বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লেবার অফিসের হলিডে হোম হয়েছে। বাড়ীটির মধ্যকার অধিকাংশই ঠিক আছে। চারপাশের অংশগুলি সংস্কার করা হয়েছে। এই বাড়ীটি প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদারের ছিল। এখান থেকে দার্জিলিঙের অপূর্ব শোভা দেখা যায়। কাঞ্চনজঙ্ঘার রূপ ও সুন্দর ভাবে প্রতীয়মান হয়। আসানটুলির পাশে গ্লেন ইডেন। বর্তমান সেখানে পুরানো বাড়ীটি নেই, যেখানে রবী-দ্রনাথ উঠেছিলেন। যে বাড়ীতে তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন সেটি ছিল প্রখ্যাত ডাক্তার নীলরতন সরকারের। দার্জিলিঙে তাঁর দুটো বাড়ী ছিল। তারই একখানা রথী-দ্রনাথ পাঁচ বছরের জন্য লীজ নিয়ে আমূল সংস্কার করেছিলেন। এখন গ্লেন ইডেন ছোট একটা এলাকাকে বোঝায়। সেখানে অস্থায়ী কয়েকটি বাড়ী বিদ্যমান।

ভারতীয় ডাক (Posts) বিভাগ ঐ এলাকা অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন । কিন্তু কয়েকটি পরিবার ওখানে বসে পড়েছেন । হোল্ডিং নম্বর ১৭ , ১৮ এবং ১৮এ ইত্যাদি । এই আসানটুলিও গ্লেন ইডেন এই সময় কোচবিহার মহারাজার অধীন ছিল । মহারাজা ভূপ বাহাদুর অক্ল্যান্ড রোডের উপর Colinton এ দার্জিলিঙ বাসস্থান করেছিলেন । দার্জিলিঙের দক্ষিণ অংশ অর্থাৎ মোট ৭৫ একর জমি তিনি সরকারের কাছ থেকে নিয়েছিলেন । কবির সঙ্গে বিজ্ঞানাচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর এবার দেখা হয়েছিল । গ্লেন ইডেনের নিকটেই আচার্য বসুর "মায়াপুরী" স্বাস্থ্য নিবাস ও গবেষণা কেন্দ্র । তিনি কবিকে ২৪শে জুন এক মধ্যাহ্ন ভোজে নিমন্ত্রণ করেছিলেন । এ সম্পর্কে কবি হেমন্তবালা দেবীকে এক পত্রে লিখেছেন , "কোথাও বেরই নে এরকম ভোজেও আমার রুচি নেই ; কিন্তু জগদীশচন্দ্রের আহ্বান এড়াতে পারি নে ।"

রবীন্দ্রনাথের বৈচিত্র্যময় জীবন । ২০ মে ১৯৩১ সালে তিনি হেমন্ত বালা দেবীকে একখানি চিঠি লিখছেন , "যদিও জ্বর ভোগ করছিলুম তবুও পারস্য যাত্রার আয়োজনে প্রবৃত্ত ছিলুম । যাত্রার পূর্বদিনে অসুখ বেড়ে উঠল –ডাক্তার পথরোধ করে দাঁড়াল । তাই পারস্যের বদলে শয্যার শরণ নিয়েছি ।" এই শয্যার শরণ অবশ্যই তিনি দার্জিলিঙে আসানটুলিতে নিয়েছেন । রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনে পত্রধারার মধ্যে শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত পত্রাবলী কেবল যে সংখ্যা গৌরবেই বিশিষ্ট এমন নয় , রবীন্দ্রনাথের ধর্মমত ও আত্মপরিচয়ের ব্যাখ্যানের দিক দিয়েও একটি স্বতন্ত্র স্থানও মর্যাদা অধিকার করে আছে । হেমন্তবালা দেবী ময়মনসিংহ গৌরীপুরের সুবিখ্যাত ভূম্যধিকারী দেশ প্রেমিক ব্রজেন্দ্র কিশোরের কন্যা । দার্জিলিঙের আসানটুলিতে বসে তাঁর লেখা আর একটি চিঠি স্মর্তব্য । ৩০মে ১৯৩১ , রবীন্দ্রনাথ লিখছেন , "অবশেষে দেবাত্মা নগাধিরাজের শরণ নিয়েছি । নিরে নব্বইয়ের ধাক্কাটা এখানে এসে কেটেছে । আমার শরীরের জন্যে মনে কোনো উদ্বেগ রেখো না । ঘোরতর কুঁড়েমিতে পেয়ে বসেচে -- কুঁড়েমির দুর্গে আছি বললেই হয় – এমন কি ছবি আঁকার দুর্নিবার নেশাও আমাকে নাগালে পাচ্ছে না ।"

সমতল শহরের কর্মব্যস্ততা শৈল শহরে নেই । নির্জন নিসর্গ কবিকে অলস করে তুলেছে । এই প্রসঙ্গে আর একটি চিঠি উল্লেখ করি ।

Darjeeling

কল্যাণীয় মন্টু,

পাগল হয়েছ ? আমাকে তুমি রীতি মত তুলি চালন চতুর আর্টিস্ট পেয়েছ নাকি ? আমি ছবি আঁকি দৈববশে — এতে আমার পুরুষকার কিছুই নেই। তাই আমার সেই আজগুবি ছবি-আঁকিয়েকে কোনো চলতি কাজের কোনো ব্যবহারেই লাগাবার উপায় নেই। ঐ হা-ঘরেটাকে আমার স্বদেশের লোকসমাজে প্রচার করতেও আমি অনিচ্ছুক —কেননা ওকে ওর জাত কুলশীল জিজ্ঞাসা করলে প্রশ্নটাকে হেসে উড়িয়ে দেবে। তাছাড়া আমার মনটা আজকাল কুঁড়েমির গভীর সমুদ্রে ডুব সাঁতার কাটচে। বাইরে থেকে আমার কোনো দরবার ওখানে পৌঁচচ্চে না। আমার এই চিঠির বহর দেখেই বুঝতে পারবে আমার কুঁড়েমির আয়তনটা। ইতি ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮ (২ জুন ১৯৩১)

স্নেহানুরক্ত

শ্রী —

আর একটি চিঠি। শুধু কুঁড়েমির উল্লেখ নেই, কবির ভবিষ্যৎ জীবনদর্শন।

কল্যানীয়েষু —

মন্টু,

. . . . . .

আর একটা কথা আছে। পূর্বদিগন্তে রবির প্রথম উদয়প্রভাত সঙ্গীত মুখরিত—পূর্ব আকাশের জন্য বাণী রইল গান রইল। পশ্চিম আকাশে অস্তগমন বেলায় বর্ণবিচিত্র ছবি। এই ভাষা পশ্চিম ভালো বোঝে, পশ্চিমকেই উৎসর্গ করলুম। পূর্ব সীমানায় সে থাকবে অবগুন্ঠিত আমার এই বিধান। আমার ছবি ও গান সমুদ্রের দুই তীরে দুই নীড়ে ভিন্ন বাসায় থাকবে।

আজকাল খুব দরাজভাবে কুঁড়েমি করি। সুতরাং আর যা কিছু কর্তব্য আছে তার অবকাশ খুব সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেচে। এমন দিন ছিল যখন চিঠি পেলেই তার উত্তর দেওয়া আমার একটা ব্যসনের মতোই ছিল এখন সেই রিপুটা প্রায় ছেড়েছে বল্লেই হয়। ভূতটাকে আমার সঙ্কন্ধ থেকে ঝাড়িয়ে নিয়ে অমিয়র উপর চালান করে দিয়েছি। অনেকে তার হস্তান্তর আমারই মনে করে সযত্নে সংগ্রহ করে রাখচে। ভাবীকালের প্রত্নতত্ত্ব-বিদদের জন্য গবেষণার খোরাক জমা হচ্ছে। হয়তো ৩০১০ খ্রীষ্টাব্দে এই গৌড়

দেশেই কোনো পণ্ডিত নিঃসংশয়ে প্রমাণ করবেন যে রবিঠাকুর ছিল Solar Myth, তার একচক্র রথের বঙ্গীয় নাম ছিল অমিয়চক্র, এইজন্য তাঁর বাহনের প্রতিরক্ষা লক্ষ্য করেই তাঁকেই বলা হত অমিয় চক্রবর্তী। ডকুমেণ্টারি এভিডেন্স ডেকে দেখানো শক্ত হবে না যে ভারতের পূর্ব গগনে যেখানে রবিঠাকুরের পীঠস্থান অমিয় চক্রবর্তীর অধিষ্ঠান ও ঠিক সেই একই স্থানে। ভাবী জন্মে আমি হয়ত আশ্চর্য পাণ্ডিত্য সহকারে এই মত সমর্থন করে তৎকালীন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পুনশ্চ ডাক্তার উপাধি লাভ করে সম্মানিত হব। আশা করি আমার প্রতিপক্ষ কোন এক অধ্যাপক আমার আজকের লেখা এই চিঠিখানি হঠাৎ আবিষ্কার করে রবী-দ্রনাথের ভাবী জন্মান্তরীণকে যথোচিত লাঞ্ছিত করতে পারবে এবং সেই সঙ্গেই উপাধিদাতা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ও।

.....

(১৭ জুন ১৯৩১) ইতি ২ আষাঢ় ১৩৩৮

স্নেহরত

শ্রীরবী-দ্রনাথ ঠাকুর

শৈলশহর দার্জিলিঙের পরিবেশ কবিকে আপ্লুত করে তুলেছে। তিনি প্রকৃতির হাতছানি দেখতে পাচ্ছেন। ইন্দিরা দেবীকে লিখিত একটি চিঠিতে তার প্রমাণ মিলবে।

পোস্ট মার্ক

দার্জিলিং

২৩ অক্টোবর ১৯৩১

কল্যানীয়াসু,

তোরা আমার আশীর্ব্বাদ জানিস। এবার দার্জিলিং পর্যন্ত আমাকে ঠেলে তুলেচে। সাধারণত আমার এরকম ঊর্দ্ধগামী স্বভাব নয় — সমতটের মানুষ, গিরিরাজের উত্তুঙ্গ দরবারে মন পালাই পালাই করে। শান্তিনিকেতনে মাঠের ধারে আকাশের দিকে তাকিয়ে পড়ে থাকব বলেই পণ করেছিলুম কি-ন্তু দেখলুম দেহটাকে একবার কোথাও পালটিয়ে না আনলে দিন মুহূর্তগুলোর বোঝা তারপক্ষে দুর্ব্বহ হয়ে উঠচে। তুই তো জানিস শরীরের নালিশ বেওজরে ডিসমিস্ করে দেওয়াই আমার অভ্যেস। এবারে সে রকম সরাসরি অবিচার আর চলল না। তাই রথী যখন পাহাড়ে ওঠার প্রস্তাব তুললে তখন সেটাকে আর অস্বীকার করতে পারলুম না। এখানে

সময়টা ভালো। মাঝে মাঝে মেঘগুলো এসে শিখরে আড্ডা জমায় কিন্তু অত্যন্ত সাত্ত্বিক শুভ্রভাবে -- শাদা জটাধারী পথিক সন্ন্যাসীর মতো।

অমল এখানে আছে, তোর কর্ম্মকুশলতার উপরে তার অসামান্য ভক্তি। অর্থাৎ সে আবিষ্কার করেচে যে, যে খুসি তোকে খাটাতে পারে যা তা নিয়ে, এবং সে খাটুনি তোকে কোথাও কিছুমাত্র ত্রুটি ঘটবে না। এ রকম শক্তি থাকাটা দৈবের অনুগ্রহ বলে গণ্য করা চলে না। কুঁড়েমির খ্যাতি আত্মরক্ষার প্রধান সহায়। ইতি --

বিজয়া দ্বাদশী ১৩৩৮

রবি কাকা

দার্জিলিঙ বাসকালে কবি কবিতা, চিঠি ও গদ্য রচনা করেছেন। তাঁর রচিত কবিতাবলী তারিখসহ দেওয়া হল।

১. বকসা দুর্গস্থ রাজবন্দীদের প্রতি – ১৯ জৈঃ ১৩৩৮ (পরিশেষ)
২. নাতবৌ - ১৬ আশ্বিন ১৩৩৮ (প্রহাসিনী)
৩. বুদ্ধদেবের প্রতি - ৭ কার্তিক ১৩৩৮ (পরিশেষ)
৪. আশীর্বাদী -৮ কার্তিক ১৩৩৮ (পরিশেষ)
৫. কবি - ৮ কার্তিক ১৩৩৮ (বীথিকা)
৬. মিলন - ১৭ কার্তিক ১৩৩৮ (পরিশেষ)
৭. অপূর্ণ - ৮ অগ্রহায়ণ ১৩৩৮ (পরিশেষ)

এই রচনাগুলি একটি মূল ভাবনায় লেখা নয়। স্থানগত প্রভাবের ক্ষেত্রে "বুদ্ধ দেবের প্রতি" এবং "বকসা দুর্গস্থ রাজবন্দীদের প্রতি" আলোচনা সাপেক্ষ।

"বুদ্ধদেবের প্রতি" কবিতাটি সারনাথে মূল গন্ধকুটি বিহার প্রতিষ্ঠা -উপলক্ষ্যে রচিত। মহাসাধক বুদ্ধদেবকে কবি স্মরণ করছেন। ভারতের অবক্ষয়মুহূর্তে, দুঃসময়ে এই জন্মভূমিতে ভারতবাসী তাঁকে যুক্তকণ্ঠে ডাকুক—এইটি কবির অভিপ্রায়। তিনি বলেছেন, "মানুষের প্রকাশ সত্যে। এই সত্য যে কী তা উপনিষদে বলা হয়েছে: আত্মবৎ সর্বভূতেষু য পশ্যতি স পশ্যতি। যিনি সকলজীবকে আপনার মতো করে জানেন তিনিই সত্য জানেন। আপনার মধ্যে মনুষ্যত্ব প্রকাশিত হয়েছে, তিনি আপন মানব মহিমায় দেদীপ্যমান।

'যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানু পশ্যতি

চাত্মানং সর্বভূতেষু ন ততো বিজুগুপ্সতে ।

সকলের মধ্যে আপনাকে ও আপনার মধ্যে সকলকে যিনি দেখতে পেয়েছেন , তিনি আর গোপন থাকতে পারেন না , সকল কালে তাঁর প্রকাশ ।'' কবি সারনাথের কথা ভাবতে ভাবতে মনের অগোচরে পাহাড় পরিবেশের কথা বলে ফেলেছেন । একটি নিটোল চিত্রকল্প লক্ষণীয় ।

''চিত্ত হেথা মৃতপ্রায় , অমিতাভ , তুমি অমিতায়ু ,

আয়ু করো দান ।

তোমার বোধন মন্ত্রে হেথাকার তন্দ্রালস বায়ু

হোক প্রাণবান ।''

এখানে ''হেথাকার তন্দ্রালস বায়ু '' উপলব্ধির বিষয় । শৈল শহরের কর্মে একটা অলসভাব লুকিয়ে থাকে । এই অলসতা নিসর্গের নৈকট্য সূচিত করে । এখানকার ভারি জলীয় মেঘ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে জামা কাপড় সিক্ত করে দেয় । রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতঃ এই পাহাড়ী মেঘকে তন্দ্রালস রূপে চিহ্নিত করেছেন । কিন্তু তিনি তন্দ্রালস বায়ুকে জড়ত্ব থেকে মুক্তি দিতে চান । প্রাণ সঞ্চার করাই তাঁর কাজ । পাহাড়ের কোণে বসে অমিতাভকে স্মরণ করছেন । এই প্রসঙ্গে দার্জিলিং আসানটুলি থেকে শ্রীমতী রাধারাণী দেবীকে রবীন্দ্রনাথের লেখা চিঠি ১৩৩৮ জ্যৈষ্ঠ ১৬ (মে ৩০ , ১৯৩১) উল্লেখ্য । ''.....এখানে এসে রোগের জড়তা দূর হয়েছে । দেহ থেকে জ্বর তার যে বাসা ছেড়েছে , সেই খালি বাসাটা জুড়ে বসেছে কুঁড়েমি এসে ।'' এই চিঠির অংশে কুঁড়েমির প্রসঙ্গ—একই দিন (৩০মে , ১৯৩১) হেমন্তবালা দেবীকে লিখেছেন । পূর্বেই সে চিঠি উল্লেখ করা হয়েছে । কবি এই সময় চিঠি লিখছেন প্রতিমাদেবী , হেমন্তবালা দেবী , রাধারাণী দেবী , নির্মলকুমার মহলানবিশ , অমল হোম , অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর , রোদেনস্টাইন প্রমুখ ব্যক্তিবর্গকে । মোট চিঠির সংখ্যা ৬৩ । দার্জিলিংএ আসার মস্ত কারণ তিনি সাগর পারের রোদেন স্টাইনকে জানাচ্ছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে এই একই কারণে তিনি পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছেন ।

Darjeeling

Nov 15, 1931

..... " I have come to Darjeeling in search of health and peace of mind, but the latter has run out of stock in the present day world and I must not complain. "

Ever Yours,

Rabindranath Tagore

To

Sir William Rothenstein

13 Air Lie Garden

Campden Hill

London W - 8.

এই প্রসঙ্গে মৈত্রেয়ী দেবীকে লেখা কবির একটি চিঠি উল্লেখ করা যেতে পারে ।

ওঁ

Glen Eden

Darjeeling

কল্যাণীয়াসু ,

কলকাতায় এসে দূরধ্বনিবহ যোগে তোমাদের সন্ধান করেছিলুম । প্রত্যুত্তর না পেয়ে মনে করলুম আয়ু পরিবর্ত্তনের প্রত্যাশায় বায়ু পরিবর্ত্তনে বেরিয়েছ । আমিও সেই সংকল্পে অনেক দ্বিধা সত্ত্বেও দার্জিলিং এসেছি । স্পর্দ্ধিত পৃথিবীর অভ্রভেদী ঔদ্ধত্য আমি পছন্দ করি যে , তার চেয়ে অবারিত আকাশের তলে তার সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত আমার মনকে মুগ্ধ করে । মনে করেছিলুম ছুটির মাসটায় শান্তিনিকেতনে শেফালি-সুগন্ধী শুভ্র শরতের নির্মল প্রসাদ নির্জ্জনে উপভোগ করব কিন্তু শরীর এবার শ্রান্তিভার অভিভূত তাই গিরিরাজের আতিথ্যে শুশ্রূষা কামনা করে এখানে এসেচি । স্বাস্থ্য সংগ্রহ করে যদি নিয়ে যেতে পারি তার দূর পথে কর্ত্তব্যের বোঝা আরো কিছুদিন টেনে বেড়াতে পারব ।

কলকাতা থেকে দূরে গেছে ভালই করেছ - দূরে যাওয়া অবগাহন স্নানের মতো, নিকটের ধূলি ধুয়ে দেয় এবং সঞ্চিত তাপ দূর করে । যে অবকাশে মন আপনাকে প্রসারিত করতে পারে অভ্যস্ত সংসার তাকে নানা দিকে অবরুদ্ধ করে ফেলে । সংসার কর্তৃক সেই একান্ত অবরোধের মধ্যে সংসারের সঙ্গেই আমাদের সম্বন্ধ পীড়িত বিকৃত হয় । মুক্তির ক্ষেত্রে এসে তবেই সেই সম্বন্ধ পীড়িত বিকৃত হয় । মুক্তির ক্ষেত্রে এসে তবেই সেই সম্বন্ধকে আমরা বিশুদ্ধ করে নিতে পারি । এই সার্বভৌম কবির কথা তোমার বাবাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ো এবং তোমরা সকলে আমার বিজয়ার আশীর্বাদ গ্রহণ কোরো । ইতি বিজয়া দশমী ১৩৩৮

স্নেহরত

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি ১৩৩৮ সালে ১৯ জ্যৈষ্ঠ অমল চন্দ্র হোমকে একটি চিঠিতে বক্সা দুর্গে রাজবন্দীদের কথা লিখছেন । তাঁদের চিন্তায় তিনি আচ্ছন্ন হয়ে আছেন । ইংরেজ আমলে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের জন্য বক্সা দুর্গ সংরক্ষিত ছিল । রাজা ভাতখাওয়া থেকে জয়ন্তী , সেখান থেকে বক্সা দুর্গ । ১৯৩১ সালে কবি গুরুর সপ্ততম জন্মদিন বাংলাদেশের সর্বত্র পালিত হয় । কলকাতায় "রবীন্দ্র জয়ন্তী " সাড়ম্বরে পালনের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল । এই কমিটির অন্যতম কর্মসচিব ছিলেন অমল চন্দ্র হোম । বক্সা দুর্গের বিপ্লবীরাও এই সময়ে কবির সপ্ততম জন্মদিন পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন । তাঁরা এই বিষয়ে জেল কর্তৃপক্ষের অনুমতি চেয়েছিলেন । কর্তৃপক্ষ অবশ্য অনুমতি দিয়েছিলেন । নির্বাসিত দুর্গম দুর্গের বন্দীরা কবির জন্মজয়ন্তী পালনের জন্য ভারতীয় রীতিতে একটি সুন্দর মঞ্চ তৈরী করেছিলেন । "প্রবাসী " পত্রিকায় তার বিবরণ পাওয়া যায় । "মঞ্চের সম্মুখে দুই ধারে কদলীবৃক্ষ ও মঙ্গলঘট স্থাপন করিয়া আলাপন দেওয়া হয় এবং সামনের দিকে একসারী প্রদীপ দেওয়া হয় । সর্বপ্রথমে ঐক্যবাদনের পর কবির উদ্দেশ্যে অভিনন্দনপত্র পাঠ করা হয় । মঞ্চের উপর রবীন্দ্রনাথের এই উপলক্ষ্যে অঙ্কিত ছবি অতি সুন্দর করিয়া সাজান হয় ,' এবং অভিনন্দন পাঠান্তে উক্ত চিত্রের কাছে উহা উপস্থাপিত করা হয় । অতঃপর "জনগণ মন অধিনায়ক " গানটি মিলিত কণ্ঠে গীত হয় ।"

জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বন্দীরা "শেষ বর্ষণ" নাটকটি অভিনয় করেছিল। রাজবন্দীদের তরফ থেকে অভিনন্দন পত্রটি লেখেন অমলেন্দু দাশগুপ্ত। কবিকে তিনি এই অভিনন্দন পত্রটি পাঠিয়েছিলেন। অভিনন্দনপত্রটির কিছু অংশ :

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের শ্রীচরণ কমলে –

ওগো কবি,

"আমরা তোমায় করি গো নমস্কার।"

সুদূরের অতীতের যে পুণ্য প্রভাত ক্ষণে তোমার আবির্ভাব আজ বাংলার সীমান্তে নির্বাসনে বসিয়া, আমরা বন্দীদল তোমার সেই জন্মক্ষণটিকে বন্দনা করি। আর স্মরণ করি বিরাট মহাকালকে যিনি সেই ক্ষণটির দ্বারপথ উন্মুক্ত করিয়া এই দেশের মাটির পানে তোমাকে অঙ্গুলি ইঙ্গিতে পথ দেখাইয়াছেন।

*** *** *** *** *** *** *** ***

হে ঐশ্বর্যবান তোমার মাঝে জাতি আপন ঐশ্বর্যের সন্ধান পাইয়াছে। হে ধ্যানী তোমার চোখে জাতি মহান বিশ্বমানবের স্বপ্ন দেখিয়াছে। হে সাধক, তোমার হাতে জাতি আপনার সাধনার ধন গ্রহণ করিয়াছে। তাই কি তুমি প্রত্যেকের পরমাত্মীয়।

*** *** *** *** *** *** *** ***

তোমার জন্মক্ষণটি পিছনের অতীতে হয়ত হারাইয়া গিয়াছে – কিন্তু আজিকার এই স্মরণ দিনে আমাদের কণ্ঠের জয়ধ্বনি সম্মুখের অগণিত মুহূর্ত শ্রেণীতে প্রতিধ্বনিত হইয়া অনন্তের শেষ সীমান্ত পারে গিয়া পৌঁছুক।

বক্সা দুর্গ
ভুটান সীমান্ত
রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী বাসর

গুণমুগ্ধ
সমবেত রাজবন্দী

দার্জিলিঙ থেকে তিনি রাজবন্দীদের অভিনন্দনের উত্তরে একটি কবিতা পাঠিয়েছিলেন।

প্রত্যভিনন্দন

বক্সাদুর্গস্থ রাজবন্দীদের প্রতি

নিশীথেরে লজ্জা দিল অন্ধকারে রবির বন্দন।
পিঞ্জরে বিহঙ্গ বাঁধা, সংগীত না মানিল বন্ধন।

ফোয়ারার রন্ধ্র হতে
ঊর্ধ্বস্রোতে
বন্দীবারি উচ্চারিল আলোকের কী অভিনন্দন।

মৃত্তিকার ভিত্তি ভেদি অঙ্কুর আকাশে দিল আনি
সুসমুগ্ধ শক্তি বলে গভীর মুক্তির মন্ত্রবাণী।
মহাক্ষণে রুদ্রাণীর
কী বর লভিল বীর,
মৃত্যু দিয়ে বিরচিল অমর্ত্য নরের রাজধানী।

"অমৃতের পুত্র মোরা"—কাহারা শুনালে বিশ্বময়।
আত্মবিসর্জন করি আত্মারে কে জানিল অক্ষয়।
ভৈরবের আনন্দেরে
দুঃখেতে জিনিল কে রে,
বন্দীর শৃঙ্খলচ্ছন্দে মুক্তের কে দিল পরিচয়।

১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮ শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দার্জিলিং

কবির এই অভিনন্দন পত্রটি বন্দীদের হাতে পৌঁছায়নি। ইংরেজ সরকার গোপনে কবিতাটির ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন। কিন্তু প্রকৃত মর্ম উদ্‌ঘাটন করতে পারেন নি। তাঁরা কবির আন্তরিক প্রীতি ও ভালবাসার ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। বন্দীদের হাতে এটি পৌঁছে দেওয়া হয়নি সত্য, তবে অমন হোমের নিকট সে-সব হয়ে ফিরে এসেছিল।

কবি একটি পাহাড়ে অবস্থান করে অন্য একটি দুর্গম পাহাড় পরিবেশের কথা ভাবছেন। পাহাড় থেকে পাহাড়ের কথা বলা তাঁর পক্ষে সহজ ছিল। বন্দীদের মুক্তি কল্পে তাঁর ঐকান্তিক বাসনা প্রকাশ পেয়েছে এবং এই বাসনাকে মূর্তস্ফূর্ত করে তুলতে সুন্দর একটি চিত্রকল্প কবি মনের অগোচরে এসে গেল।

"ফোয়ারার রন্ধ্র হতে
ঊর্ধ্বস্রোতে
বন্দীবারি উচ্চারিল আলোকের কী অভিনন্দন।"

ফোয়ারা , র-ধ্র , উ-মুখর , ঊর্ধ্বস্রোত ইত্যাদি শব্দাবলী সমভাবাপন্ন এবং ব-দীদের জাগিয়ে তোলার পক্ষে যেন খুবই সহায়ক । প্রকৃতির ভালবাসার মধ্য দিয়ে মানুষের ভালবাসায় কবি এসেছিলেন । নৈ: শব্দের একটি সুস্থ পরিবেশে থেকে দেশের কথা তো বটেই । এ কেবল মহৎ কবির পক্ষে সম্ভব ।

বক্সা দুর্গের রাজব-দীদের প্রতি কবির ভালবাসা স্বদেশ প্রেম , ভ্রাতৃপ্রেমের স্বাক্ষর । ১৯৩১ সালে ২ নভেম্বর তাঁর একটি কঠোর প্রতিবাদ পত্র স্মরণীয় । এই বছর অক্টোবর মাসে হিজলী জেলে দুজন বাঙালী যুবককে গুলি করে মারা হয় । রবী-দ্রনাথ এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবাদ পত্রটি "The Statesman" অফিসে পাঠান । "The Statesman-সম্পাদক ঐ পত্রটি[১৩] প্রকাশ করেননি । পত্র দুইটি গুরুত্বপূর্ণ । রবী-দ্রনাথের জীবনের শেষপ্রান্তে অসীম মনোবলের পরিচয় পাওয়া গেল । প্রত্য-ত পাহাড়ে অবস্থান করলেও ব-দীদের কথা আরো দুই প্রত্য-ত স্থান বক্সা ও হিজলীর কথা ভাবছেন । নির্জন পরিবেশ যেন তাঁকে ভাবতে অনেক সাহায্য করছে । একই সময়ে তিনি কত বিচিত্রভাবে জীবনকে ছড়িয়ে দিচ্ছেন ।

কবির চিঠি

To The Editor, " The Statesman"

Sir,

We have recently seen in an Anglo-Indian paper repeated expressions of the Christian sentiment of sympathy for the warders who had under their charge the prisoners at Hijili Whom they murdered. The perpetrators of this crime were pitied on ground of nervous strain under which, according to the writer, they "certainly cannot be expected to retain judicial claim." These high-strung individuals- who enjoy freedom and self-respect and live in comfortable barracks- have been soothed with paragraphs of tender consideration for their concerted homicidal

attack, under cover of darkness, on defenceless prisoners undergoing the most barbaric system of incarceration and a nerve racking strain of an indefinitely suspended fate.

Most crimes indeed are the outcome of some severe strain - uncontrollable urge of temptation, pain and anger reaching a bursting point when considerations of social responsibility and consequences are recklessly forgotten .... such crimes, though comitted under intense nervous tension and a state of Psychological night-mare, are not condoned by law, and for that reason fear and self-control exercise check against criminal propensities. But if the milk of human kindness be carefully reserved for official murder, and if a special standard of justice can ever be successfully advocated- under the plea of delicate nerves- only for those who already harbour in their mind an expectation of impunity, and who, as deputed guardians of law and order, have broken almost with swaggering exultation, then it will amount to a positive insult to the solemn principle of justice universally declared in all civilized legal codes and will create an effect upon the public mind which no amount of seditions propaganda can ever do.

On the other hand I never for a moment expect that out political fanatics who have been judged guilty by any properly constituted court of justice should go unpunished though their nerves may have been completely upset by harrowing sights and cowardly crimes that escape retribution. They must pay, in full the cost of what they may feel as their obligation to their out traged kindred or their own insulted humanity. Our students no doubt learnt by heart through European school-masters their lessons from the Western history of the struggle for freedom copiously strewn with the records of

criminal violence openly done or secretly plotted by both sides, such as was recently exhibited in Ireland. But, all the same, crimes are crimes and their legal consequences should ever prove to be inevitable, in spite of the well-known historical truism amply proved by Czarist and other autocratic regimes that those who have military and political power in their hands or are favoured and protected by such power, have often defiantly gone through the extreme length of iniquities in a whole sale manner and surreptitions ways, avoiding justice and forcibly repressing popular ~~indgment~~ Judgement. But fortunately for humanity such policy has never been ultimately successful.

I earnestly appeal to the Government and our people at the same time that there should immediately be a truce to the ring-dance of vengeance and violence perpetually rushing round a vicious circle. Giving vent to one's anger and annoyance may be natural to common humanity but it is never statesmanlike for our rulers nor wise for the ruled. Mutual indulgence in such angry passions are nothing but destructive, hopelessly wasteful, endlessly adding to our miseries and futility and leading to an utter loss of our confidence in the moral manliness of our rulers, which is the true prestige of strength in its magnanimity.

Darjeeling
Nov, 2, 1931.

Yours etc.,
Rabindranath Tagore

এই দীর্ঘ পত্রটিতে কবির অন্তরের বাণী নিঃসৃত হয়েছে। ইংরেজ শাসকদের ভালো লাগার কথা নয়। এমন কি তৎকালীন The Statesman এর সম্পাদক প্রকাশ করতে অস্বীকার করেন। তাঁর পত্রটি :

THE STATESMAN LTD.
6, Chowringhee
Calcutta, 3rd Nov., 1931.

Dear Mr. Home,

I must definitely refuse to publish from Dr. Rabindranath Tagore or anybody else a letter which accuses men of murder who have never been tried on that count. I return the letter to you.

It is pleasant to be back in India and pleasant to know that in these times I have many friends like you-self among Indians.

I am, sincerely yours,
Alfred H. Watson

রবী-দ্রনাথের চিঠিটি "দি ক্যালকাটা মিউনিসিপাল গেজেট সম্পাদক অমল হোক ঐ পত্রিকা অফিসে পাঠিয়েছিলেন। ঐ কারণেই চিঠিটি আবার তাঁর কাছে ফেরৎ আসে।

শ্রীমতী হেম-ত্বালা দেবী শ্রী পুলিন বিহারী সেনকে একটি চিঠিতে জানাচ্ছেন, "২৪ কার্ত্তিক আমার জ-মদিন। আমি পরিহাসস্থলেই আবেদন জানালাম যে, কবি গুরুর জ-মদিনে তো কত কবিতা উপহার পেয়ে থাকেন, কি-ত্তু আমার জ-মদিনে কেউ কবিতা লেখে না। তিনি যদি আমার জ-মদিনে একটি কবিতা লিখে আশীর্বাদ করেন, তো আমি বিশেষ খুশি হই। সেই প্রার্থনা পূরণের জন্য ১৩৩৮ সালে (সম্ভবতঃ) কার্ত্তিক মাসে এই কবিতাটি লিখে পাঠান আমাকে। আমি নূতন বিস্ময়ে আনন্দে অধীর হই। .....আমার জীবনের একখানি ফোটো চিত্র ঐ কবিতায় তোলা আছে।" প্রসঙ্গতঃ 'অপূর্ণ' কবিতাটি রবী-দ্ররচনাবলীতে স্থান পেয়েছে। কি-ত্তু প্রথম অংশটি রবী-দ্ররচনাবলীতে উল্লেখ নেই। কবি দার্জিলিঙ থেকে কবিতাটি হেম-ত্বালা দেবী লিখে পাঠান। প্রথম অংশটি :

১০.১১.১৯৩১

তোমার প্রথম জন্মদিন
এনেছে মর্ত্যের ঘাটে যে-প্রাণ নবীন,
চির-তন মানবের মহাসত্তা মাঝে
এলো কোন্ কাজে ?
এক আমি —কে-দ্র ঘিরে
ফিরে ফিরে
মুহূর্তের দল অগণন
সৃষ্টির নিগূঢ় শক্তি করিয়া বহন
দিন রাতি
কী গাঁথনি তুলিতেছে গাঁথি
আলোয় ছায়ায়,
বিচিত্র বেদনাঘাতে ঝঙ্কৃত কায়ায়,
রূপে রসে বর্ণে নৃত্যে গন্ধে গানে বেষ্টিত মায়ায়।

*** *** *** *** ***

কবির সঙ্গে এবার কাজী নজরুল ইসলাম, অখিল নিয়োগী, মন্মথ রায়, বেগম জাহানারা চৌধুরী প্রমুখ দেখা করেন। তাঁর সঙ্গে নজরুলের নানা বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল। কাজী এসেছিলেন কবিতায় হজরত মোহাম্মদের জীবনী রচনা করতে। কি-তু আচ্চাবাজ নজরুলের জীবনী লেখা আর সম্ভব হয় নি। কবি নজরুলকে শান্তিনিকেতনে যাওয়ার আম-ত্রণ করেন। অখিল নিয়োগী ফ্রেব্রুয়ারি ১৯৮৫ সালে ''মাসিক বসুমতী'তে -''অতীতের সাহিত্য জগৎ স্মৃতিচারণ'' নিবন্ধে লিখেছেন, ''আমরা কাজীদাকে মুখ্যপাত্ররূপে সামনে রেখে সবাই কবিকে ঘিরে বসলাম। এত কাছাকাছি ঘনিষ্ঠভাবে কবিকে আমরা কখনো পাইনি। আমাদের দলে জাহানারা চৌধুরী ছিলেন। তিনি আর্জি পেশ করলেন, ''বর্ষবাণী নামে একটি বার্ষিকী প্রকাশ করবেন - তার জন্য কবিতা চাই।'' কবি রসিকতা করে বললেন, ''অনেক দেরী করে এলে, এখন কি আর কবিতা বেরুবে ? এখন নজরুলের কবিতা নাও।'' শেষবার রবী-দ্রনাথ দার্জিলিঙ এলেন ১৯৩৩ সালের ২৭ এপ্রিল এবং ফিরে গেলেন[২১] জুন। প্লেন ইডেনে উঠলেন। এবার তাঁকে ভিন্নরূপে

আমাদের চেনা হল । তিনি শুধু লেখক নন । তাঁর জীবন কতরূপে ছড়িয়ে আছে, তা এ যাত্রায় দেখা যাবে । তাঁর ব্যস্ততা হেম-অবালা দেবীকে লেখা ১৯৩৩ সালে ১৩মে তারিখের একটি চিঠিতে বিদ্যমান । তিনি লিখছেন, "আশ্রয় নিয়েছি গিরিশৃঙ্গে । কি-তু নিয়তি এখানেও এসে পৌঁছয়, তাঁর গাড়িভাড়া লাগে না । নানা কাজের দাবি, নানা লোকের নানা অনুরোধ, পূর্ব্বরব্ধ কর্ম্মের অনুসৃতি সমস্তই আমার দরজা পর্য্য-ত পথ করে নিয়েছে । যাবখানে এই ভিড় জমে উঠেছে, বিশ্রামের প্রত্যাশা রইল পড়ে তার পরপারে । কলকাতার মতো জায়গায় তার অসঙ্গতি হয় না কি-তু এখানে তার পক্ষে অস্থান বলেই পীড়নটা লাগে বেশি ।

আমাকে উপহার দেবার জন্যে উদ্বিগ্ন হোয়ো না । তোমার আ-তরিক অভিন-দন অনায়াসেই পৌঁছয় আমার অ-তরে । তার মূল্য তো কোনো প্রত্যক্ষ সামগ্রীর চেয়ে কম নয় । আমার জন্যে রঙীন মাটির হাঁড়ি আর শিকে কিনে রেখেছে । কাজে লাগবে । একদা আমার ঘরে কড়ি থেকে শিকেয় বন্ধ হাঁড়ি আমার ডেস্কের উপর ঝোলানো থাকত—তারমধ্যে থাকত কালী কলম ইত্যাদি লেখা সামগ্রী । সন্দেশ যদি দাও আগে তার যথোচিত সৎকার করে তারপরে তাকে সাহিত্যিক ব্যবহারে লাগাবার চেষ্টা দেখতে পারি ।

এখানে বাজারে ফুলকপি যথেষ্ট আছে, কমলালেবু আমদানি এখনো সুরু হয়নি—চেষ্টা করলে আম পাওয়া যায় । কি-তু এ বৎসর দৈবদুর্যোগে আমবাগানের উপর অত্যাচার হয়ে গেছে, তাই ফলাহারের আশা সঙ্কীর্ণ । এখানে শাক সবজির অভাব নেই । এ বৎসরটা এখানে শীতটা আশাতীত, মাঝে মাঝে শিলাবৃষ্টির সহায়তায় তার স্পর্ধা বেড়ে উঠেচে । রৌদ্র বিরল দর্শন, ঘন সজল মেঘে আস্তীর্ণ আকাশের প্রাঙ্গণ ।"

প্রতিভা বসু 'দেশ' ১৩৮১ সাহিত্য সংখ্যায় লিখছেন, "১৩৪০এ দার্জিলিংয়ে তখন কিছু দিনের জন্য আমরা সপরিবারে সেখানে বাস করছিলুম, সহসা একদিন শহর তোলপাড় । কী ! না, রবী-দ্রনাথ ঠাকুর আসছেন । আমি তার আগে কোনদিন তাঁকে দেখিনি । ষ্টেশন থেকে কিছুদূরে উঁচুতে একটা পাথরের দোতলা বাড়িতে থাকতুম আমরা .....সারাক্ষণ খাওয়া নাওয়া ভুলে দাঁড়িয়ে রইলুম সেখানে ষ্টেশন থেকে শহরে উঠবার সেটাই পথ । কি-তু আমার আকাঙ্ক্ষা সফল হলো না । অনেক পরে শোনা গেল, তিনি ডান্ডিতে করে অন্য পথে উঠে গেছেন "গ্লেন এডেনে ।"

এর পরে অবশ্য কবিগুরু প্রতিভা বসুকে চিঠি দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে চা পানের জন্য। এই চিঠি পেয়ে প্রতিভা বসুর কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন, "আমার হাত পা থর থর করে কাঁপছিলো। ভয়ে ভয়ে গেলাম পরের দিন .....। তারপর থেকেই তাঁরই অনুমতিতে এবং অনুমোদনে আমার গতিবিধি প্রাত্যহিক হলো।" বলেছিলেন, "আমি উঠি সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যদি নির্জনতা চাও, আসতে পার সে সময়ে।"

"আমি তাই যেতাম। শীতের দেশ তখনো জেগে উঠতো না। তিনি বসে থাকতেন জানালায় দৃষ্টি মেলে দিয়ে, আমি গেলে আমাকে গান শেখাতেন, গল্প করতেন, রোদ উঠতে উঠতে আমি চলে আসতুম।"

দার্জিলিঙ যাবার পথে কলকাতায় এসে একটি তারিখহীন চিঠি লেখেন কবি মৈত্রেয়ী দেবী কে।

কল্যাণীয়াসু

কলকাতায় এসে তোমার চিঠিখানি পেলুম। আমি দার্জিলিং যাচ্ছি পর্শু। তোমাদের তো সেখানে যাবার কথা। দেখা হতে পারবে। কিছুদিন থেকে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হয়েচে—সামনে আরো দীর্ঘকাল দেখতে পাচ্ছি কাজের ভিড়। আমি স্বভাবত কেজো মানুষ নই—অথচ কাজ পড়লে ফাঁকি দিতে পারিনে—চিরদিনই খাটতে হবে—কাজের দাবী কেবলই বেড়েই চলেচে।

স্নেহরত

রবীন্দ্রনাথ

মৈত্রেয়ী দেবী এই সময়ে দার্জিলিঙ এসেছিলেন। তিনি 'স্বর্গের কাছাকাছি" (১৯৮৪, পৃ: ১৭৭) গ্রন্থে লিখছেন, "ওঁরা থাকতেন গ্লেন ইডেন বাড়িতে। আমরা ছিলাম স্টুয়ার্ট লজে। আমাদের বাড়ি প্রায় দুমাইল দূরে ছিল। তা সত্ত্বেও আমি প্রত্যহ হয় সকাল নয় বিকালে গ্লেন ইডেনে যেতাম। এই দুমাস খুব ঘনিষ্ঠভাবে প্রতিমাদেবী ও রবীন্দ্রনাথকেও দেখবার সুযোগ পেলাম।".....

আবার তিনি লিখছেন, "সকাল বেলা গ্লেন ইডেনের বাড়িতে এসে পৌছতাম। আমি কবির হাতের কাছে উপস্থিত থাকলে প্রতিমাদেবী নিশ্চিন্ত মনে জাপানী বাঁশের ছাতাটি মাথায় দিয়ে বাজার করতে চলে যেতেন।"

মৈত্রেয়ী দেবী আরো উল্লেখ করেছেন, "দার্জিলিঙে এইবার কয়েকটি মনে রাখবার মত ঘটনা ঘটে। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে বাঁশরী ও মালঞ্চ পাঠ। 'গ্লেন ইডেন'এর বসবার ঘরে দার্জিলিং প্রবাসী ও স্বাস্থ্যান্বেষী এলিটদের নিম-ত্রণ করে কবি মালঞ্চ ও বাঁশরী দুটি গল্প শোনালেন।..... ....
এর পরে 'বাঁশরী' যার নামকরণ হয়েছিল "ভালোবাসার নিলাম" এবং "নলাটের লিখন' তার অনেকখানিই দার্জিলিঙে লেখা হয়। আমি সেই প্রথম সুযোগ পেলাম তাঁর লেখা কপি করবার। দু-তিনদিন অ-তর আমি একখানা করে খাতা নিয়ে যেতাম ও প্রতি খাতা দু'খানা করে কপি করতাম।"

মৈত্রেয়ী দেবীর বোন চিত্রিতা দেবীর সঙ্গে কবির যথেষ্ট স্নেহ-ভালবাসার সম্পর্ক ছিল। মৈত্রেয়ী দেবীর "মংপুতে রবী-দ্রনাথ "গ্রন্থে তার দৃষ্টা-ত আছে। চিত্রিতা দেবী এই সময় দার্জিলিঙ এসেছিলেন। তাঁর "একটি গোলাপের মালা" প্রবন্ধে দার্জিলিঙের প্রসঙ্গ ধরা পড়েছে। তিনি লিখেছেন, "কয়েক বছর আগে যখন কবি দার্জিলিং গিয়েছিলেন, আমরাও মা বাবার সঙ্গে ঐ পাহাড়েই ছুটি কাটাতে গিয়েছিলাম। এবং "গ্লেন এডেন" নামে যে বাড়িতে কবি থাকতেন প্রায়ই সেখানে যেতাম। সেরাবেই পর পর দু তিন দিনে "বাঁশরী" পড়ে শুনিয়েছিলেন। আমি তখন মাত্র স্কুলের ছাত্রী। কি-তু কবি আমাকে একটি দারুণ **compliment** দিয়েছিলেন।" কবিগুরু সম্পর্কে যাঁরা অভিযোগ করেন যে, তিনি সাধারণ মানুষ এবং দেশের কথা ভাবেন নি, শেষবার দার্জিলিঙ ভ্রমণ পর্বে তার সামান্য পরিচয় মিলবে। মৈত্রেয়ী দেবী "স্বর্গের কাছাকাছি" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "এই সময়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তুমুল আলোড়ন চলেছে। মেয়েরাও পিস্তল হাতে নিয়েছে। অন্যদিকে হরিজন আন্দোলন প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছে। গান্ধীজির চরকা আন্দোলন রবী-দ্রনাথের সমর্থন পায়নি, কি-তু হরিজন আন্দোলনে তিনি সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেছিলেন। চ-ডালিকা ঐ সময়ে লেখা হয় ও নৃত্যনাট্য অভিনয় হতে থাকে —হরিজন আন্দোলনকে এই নৃত্যনাট্য অনেকখানি শক্তি যুগিয়েছিল তার সঙ্গে পুনশ্চ কবিতাগুলো তো ছিলই। এই পর্বেই রবী-দ্রনাথ স্পষ্ট করে ঘোষণা করলেন 'আমি ব্রাত্য"। রবী-দ্রনাথ দার্জিলিঙে খবর পেলেন গান্ধীজী যেরবাদা জেলে একুশ দিনের অনশন করছেন। এই অনশনের সঙ্গে কোনো রাজনৈতিক ঘটনার যোগ ছিল না, এটা তাঁর ব্যক্তি-গত আত্মশুদ্ধি। তিনি এই খবর পেয়ে একটা

টেলিগ্রাম করেন যেরবাদা জেলে । তারপর দুতিন দিন ধরে ক্রমাগত চি-তা করছেন আর লিখছেন । এইভাবে গান্ধীজীকে একটা চিঠিতে লিখলেন , " Evidently the telegram which I sent you some days ago has failed to reach you though it has appeared in some papers. You must not blame me if I cannot feel complete agreement with you at the immense responsibility you incur by the step you have taken. I have not before me the entire background of thoughts and facts against which must be placed your own judgement in order to fully understand its significance.

From the very beginning of creations things which are ugly and wrong the negative factors of existence, and the ideal which is positive and eternal even waits to be represented by messengers of truth who never have the right to leave the field of their work in disgust or ~~despair~~ despair because of its impurities and imperfections.

It is a presumptions in my part to remind you that when Lord Buddha Woke up to the miseries from which the world suffers stremuously he went on searching the path of salvation till the last day of his early career.

Death when it is physically or morally inevitable has to be endured but we have not the liberty to court it unless there is absolutely no other alternative for the expression of the ultimate purpose of life itself.

We must have the full number of days allotted to us as is enjoined by the Upanishad in order to fulfil our obligation to the universe of life a part of which is our own existence.

It is not absolutely unlikely that you are mistaken about the imperative necessity of your present vow and when we realise

there is the risk of its fatal termination we shudder at the possibility of the tremendous mistake never having opportunity to be rectified. I cannot help beseeching you not to offer such an ultimatum of mortification to god for his scheme of things almost refuse the great gift of life with all its opportunities to hold up till its last moment the ideal of perfection which justifies humanity.

However I must confess that I have not the vision which you have before your mind nor can I fully realise the call which has come only to you and therefore whatever may happen I shall try to believe that you are right in your resolve and that my misgiving may be the outcome of a timidity of ignorance.

এই চিঠিতে রবী-দ্রনাথের দৃঢ় ব্যক্তি-ত্ব এবং মানবপ্রীতির দৃষ্টা-ত অ-তর্নিহিত রয়েছে। নীল নির্জনে থাকলেও কবিগুরুর চি-তা ও ভাষার বলিষ্ঠতা প্রকাশ পেয়েছে। মহাত্মা গা-ধী জেল থেকে বেরিয়ে এসে সত্যাগ্রহ আ-দোলন ব-ধ রাখা এবং দেশের সমস্ত শক্তি- দিয়ে অস্পৃশ্যতা বর্জনে নিয়োজিত করার আহ্বান জানালেন। সেই সময় বহু সহস্র নরনারী জেলে আছেন, আ-দোলন ব-ধ রাখা হল। অথচ তাঁরা জেল থেকে মুক্তি- পেলেন না। তখন নানা দলের নেতারা মিলিত হয়ে এইসব ব-দীদের মুক্তি-কল্পে প্রার্থনা জানিয়ে টেলিগ্রাম করেন। বলা বাহুল্য, এই স্মারক তালিকায় রবী-দ্রনাথের নাম প্রথমে ছিল।

দার্জিলিঙের নির্জন পরিবেশের মধ্যে রবী-দ্রনাথ দেশের ভাবনায় ডুবে আছেন। শ্যামল প্রকৃতি তাঁকে শক্তি- যোগাচ্ছে কঠিন সমস্যায় সিদ্ধা-ত নেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে। এই সময় বাংলাদেশে ইংরেজ সরকার একশ্রেণীর রাজনৈতিক ব-দীদের আ-দামান পাঠাচ্ছিলেন। ঐ দ্বীপ ছিল দ-ডিত অপরাধীদের উপনিবেশ। বাংলাদেশের বহু

যুবক ঐ সময়ে জেলে পচছেন । সরকারের অত্যাচারে তাঁরা গান্ধীজির অনশননীতি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন । দেশবাসী বিমূঢ় হয়ে পড়ে । রবীন্দ্রনাথ দার্জিলিঙ থেকে জেলে আত্মাহুতি দান করতে নিষেধ করে টেলিগ্রাম করেন । এ আদেশ পালন করা হয়েছিল । এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ১৯৩১ সালে ১৩ জুন আসানটুলি থেকে লেখা একটি চিঠি উল্লেখ্য । কবি লিখছেন ,"আমার মানুষরূপী ভগবানের পূজাকে এত সহজ করে তুলে তাঁকে যারা প্রত্যহ বঞ্চিত করে তারা প্রত্যহ নিজে বঞ্চিত হয় । তাদের দেশের মানুষ একান্ত উপেক্ষিত , সেই উপেক্ষিত মানুষের দৈন্যে ও দুঃখে সে দেশ ভারাক্রান্ত হয়ে পৃথিবীকে সকল দেশের পিছনে পড়ে আছে ।...গয়াতে যখন বেড়াতে গিয়েছিলেন তখন পশ্চিমের কোন্ এক পূজা মুগ্ধা রাণী পান্ডার পা মোহরে ঢেকে দিয়েছিলেন — ক্ষুধিত মানুষের অন্নের থালি থেকে কেড়ে নেওয়া অন্নের মূল্যে এই মোহর তৈরি ।"

শেষবার দার্জিলিঙ বসবাস কালের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা কবি জিমখানা ক্লাবের একটা অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হন (১১ জুন ১৯৩৩) । এই ক্লাবটি ম্যাল ও রাজভবনের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত । জিমখানা ক্লাব ১৯০৯ সালে ১ জানুয়ারি স্থাপিত হয় । দার্জিলিঙ শৈল শহরে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি বর্গের ক্লাব । ১৯৩৩ সালে ১১ জুন কবিকে ক্যাপ্টেন এফ.ডব্লিউ .এম.ডুপলক আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন । কেননা তিনি ক্লাবের সেক্রেটারি ছিলেন । ইংরেজ কর্তাদের এই ক্লাবে কবিকে আমন্ত্রণ এবং সম্মান প্রদর্শন তাতে তাঁর ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া গেল । এখনও এই সংস্থাটি সুষ্ঠ পরিচালক-মন্ডলীর দ্বারা পরিচালিত । ১৯৭৯—৮০ সালের পরিচালক মন্ডলীর তালিকায় তার প্রমাণ মিলবে । Ex-Officio

President

The Governor of West Bengal

Vice-President

Sir "day Chand Mahatab Maha Rajadhiraja

Bahadur of Burdwan

Maharaja of Cooch Behar

The Commissioner of the Division

জিমখানা ক্লাব

The Senior General Officer Commanding Stationed

In the District and the Area Commander

Members

The Deputy Commissioner, Darjeeling Brigade Commander/Sub Area Commander/ O.C. Station

Elected Members

Mr. S. Periwal Chairman

Mr. Mahendra Singh Vice-Chairman

এবং ১২ জন সদস্য

Sub Committees - Sports, House Cum Recreation, Catering, Race, Library, Staff Welfare .....

জিমখানা ক্লাবে রবী-দ্রনাথ ইংরেজি ও বাংলা কবিতা আবৃত্তি করে শ্রোতাদের শোনান । বিশেষ করে "বিদায় অভিশাপ "আবৃত্তির সঙ্গে শ্রীমতীর নৃত্য । শ্রীমতী দেবীর নৃত্য-ছন্দ কথোপকথনের ভাব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছিল । দার্জিলিঙে তাঁর কাব্যলক্ষ্মী দেখা দিচ্ছে । তাঁর রচনাগুলি :

১. উত্তিষ্ঠত নিবোধত - ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০ (পরিশেষ - সংযোজন)
২. বিচ্ছেদ - ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০ (বীথিকা)
৩. আষাঢ় - ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০ (শেষ সপ্তক - সংযোজন)
৪. যক্ষ - ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০ (শেষ সপ্তক - সংযোজন)
৫. দুঃখী - ৬ আষাঢ় ১৩৪০ (বীথিকা)

হিমালয়ে বর্ষা অনেক আগেই এসে পড়ে । তিনি ১৩৪০ সালে ১৮ জ্যৈষ্ঠ 'আষাঢ় ' কবিতাটি রচনা করেছিলেন । সমতলভূমি অতিক্রম করে যাওয়ার অভিজ্ঞতা কবির নিকট খুব স্বচ্ছ । সমতলের চৈত্র বৈশাখের রুদ্র এবং শুষ্ক ভাব কবির জানা । তারই প্রকৃত চিত্র এ কবিতার অনেকাংশেই স্থান অধিকার করে নিয়েছে । গ্রীষ্মের

দাবদাহের পরবর্তী চিত্র গ্লেন ইডেন থেকে দেখছেন। পৃথিবীতে বৃষ্টি নামার পর প্রকৃতির যে রূপ আমরা দেখি, কবি তা বর্ষার পূর্বেই দেখলেন :

"মরু বক্ষে তৃণরাজি
পেতে দিল আজি
শ্যাম আস্তরণ,
নেমে এল তার ' পরে সুন্দরের করুণ চরণ।" (আষাঢ়)

তারপরই আবার তিনি বললেন :

"দীপ্ততেজে নৈরাশ্যেরে হানি
উদ্দীপ্ত উৎসাহে
রিক্ত যত নদীপথ ভরি দিলে অমৃত প্রবাহে।
জয় তব জয়
গুরু গুরু মেঘ গর্জে ভরিয়া উঠিল বিশ্বময়"।
(আষাঢ়)

এই রূপের প্রকাশ মাধ্যমে হিমালয় -প্রকৃতির প্রভাব বিদ্যমান।
"রিক্ত যত নদীপথ ভরি দিলে অমৃতপ্রবাহে"— এই চরণটিতে পাহাড়ী নদীর কথা বলা হয়েছে। শীতকাল থেকে পাহাড়ী ঝর্ণা খুব শীর্ণ আকার ধারণ করে, সরু সরু সাদা ফিতার মত জলের ধারা পড়তে থাকে। কিন্তু বৃষ্টি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ঝর্ণাগুলি প্রবল আকার ধারণ করে। তখন কবির ব্যবহৃত শব্দ "অমৃত প্রবাহে "কথাই মনে আসে। মেঘ গর্জন এবং প্রকৃতির অপরূপ শোভাই বিশ্বের শ্যামল প্রান্তরের কথা মনে করিয়ে দেবে। জয়ের গৌরব নিশ্চয়ই অনুভবের বিষয়। কবি এই নিটোল চিত্রকল্পে হিমালয়ের ছায়া লক্ষণীয়।

বীথিকা কাব্যের 'দুখী' কবিতাটি ১৩৪০ সালে ৬ আষাঢ় গ্লেন ইডেনে বসে লেখা। এই কবিতাটির শেষ অংশের চিত্রকল্পে পাহাড় ভূমি হিমালয়ের কথা স্মতব্য :

"পান্থ মেঘদল ;
লয়ে রবি রশ্মি, লয়ে অশ্রুজল
ক্ষণিকের স্বপ্ন স্বর্গ করিয়া রচনা
অস্ত সমুদ্রের পারে ভেসে তারা যায় অন্যমনা।

চেয়ে দেখো, দোঁহে যারা হোথা আছে
কাছে—কাছে
তবু যাহাদের মাঝে
অন্তহীন বিচ্ছেদ বিরাজে,
কুসুমিত এ বসন্ত, এ আকাশ, এই বন,
খাঁচার মতন
রুদ্ধদ্বার, নাহি কহে কথা,
তারাও ওদের কাছে হারাল অপূর্ব অসীমতা।"

শেষ সনেটের সংযোজনে 'যক্ষ' ও 'বিচ্ছেদ' কবিতা দুটির মধ্যে বিরহের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আছে। কবি অবশ্য মেঘদূতকে নানাভাবে দেখেছেন।

রবীন্দ্রনাথ মহাকবি কালিদাসের "মেঘদূত" সযত্নে পাঠ করেছিলেন। এই অমর কাব্যের প্রভাব তাঁর উপর পড়েছে। মেঘদূতের চিত্র, শব্দ, ছন্দ ও মাধুর্য কবি চিত্তকে আপ্লুত করেছে। এরই ফলশ্রুতি 'মেঘদূত' কবিতাটি। কালিদাসের মেঘদূত রবীন্দ্র-চেতনার মধ্য দিয়ে আর একটি নূতন স্বাদের রসের-আধার সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান ও অতীতের যোগসূত্র এই মেঘদূত। কিন্তু মেঘদূতের বিরহ সর্বকালের।

আষাঢ়ের প্রথম দিনের মেঘ দেখে কালিদাস মেঘদূত রচনা শুরু করেছিলেন। আষাঢ়ের প্রথম বর্ষণ—রবীন্দ্রনাথকে কাছে টেনেছে। বিশ্বের সমস্ত বিরহীদের অন্তরের বেদনার প্রকাশ বিদ্যুৎ আলোকিত হয়ে আকাশ ছেয়ে আছে। অসীম আকাশে মেঘরাজি যেন যক্ষ প্রেরিত প্রিয়তমার নিকট প্রেম নিবেদন করছে। সারা বছরে শত শত বিরহী এই আষাঢ়ের প্রথম দিনে মেঘদূত পাঠ করে হৃদয়-বেদনা ক্ষণেকের জন্য ভোলে। কবি শ্যামল বাংলাদেশের এক প্রান্ত থেকে সেই কথা ভেবে যাচ্ছেন। এই বাংলা মাটিতে কবি জয়দেব গীতগোবিন্দ রচনা করে নববর্ষের মেঘমেদুর আকাশের ছবি এঁকেছেন। কালিদাসও ঐ পথের পথিক।

বর্ষা-ঋতুর ঐশ্বর্য ও মাধুর্য, তার নিবিড় ভাব সম্পদ, তার অন্তরের বিরহবার্তা কবির কাব্যে আশ্রয় নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানে বর্ষা একটি সুন্দর স্থান অধিকার করেছে। রবীন্দ্রনাথের বর্ষা সম্বন্ধীয় কবিতাবলীর উপর বৈষ্ণব পদাবলী ও কবি কালিদাসের ছায়া পরিলক্ষিত হয়। এই প্রসঙ্গে Keats স্মরণ যোগ্য।

Leigh Hunt তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন : " He never beheld the oak tree without seeing the Dryad."

রবীন্দ্রনাথ 'বর্ষার দিনে' কবিতায় বর্ষার রূপ বর্ণনা করেছেন। বর্ষার দিনে মানুষের বিরহ-বেদনা মিলনের জন্য ব্যস্ত হয়। এই সময় পথে চলা যায় না। গৃহকোণে নরনারী বন্দী হয়ে প্রণয় নিবেদন করে। অনেক সময় শূন্যতা অনুভূত হয়, কারোর অনুপস্থিতি বার বার মনে আসে, অভাববোধের অস্বস্তি পীড়া দেয়। কালিদাস মেঘদূত কাব্যে বলেছেন :

"মেঘালোকে ভবতি সুখিনোহপ্যন্যথা বৃত্তিচেতঃ,
কণ্ঠাশ্লেষ প্রণয়ি নিজনে কিং পুন দূর সংস্থে।"

সুখী ব্যক্তির মেঘ দেখে চিত্তবিকার দেখা যায়। যার মধ্যে দুঃখের প্রকাশ থাকার কথা নয়, মিলনেরদিন অতিবাহিত হওয়ার কথা, তার প্রাণে বেদনার রেশ উপলব্ধি করা যায়। আর দূরের প্রিয়জনের বেদনার কথা সব সময়ই থেকে যায়।

বর্ষা ঋতু প্রকৃতির ডুকরে ডুকরে কাঁদার ঋতু। বর্ষায় ঘন মেঘ জমে ওঠে, বাতাস এসে ঐ মেঘকে আকাশে বিচ্ছুরিত করে আবার খুব দাপটে বর্ষণ ও এনে দেয়। এই বর্ষণের মধ্য দিয়ে প্রকৃতির অন্তর্গূঢ় বেদনা পরিব্যাপ্ত হয়। এই কান্নার সুরের সঙ্গে মানবজীবনের কান্নার ইঙ্গিত বিদ্যমান। এ কান্না নিজস্বরূপে কাছের লোককে কাছে পাওয়ার অভিব্যক্তি। বর্ষার দিনে বিরহ-যন্ত্রণা জেগে ওঠে এবং প্রিয় জনকে নিকটে পাওয়ার ইচ্ছা প্রবল হয়। এই দিনের প্রাসঙ্গিকতা সাধারণ দিনের চেয়ে অনেকগুণে দীর্ঘ ও তাৎপর্যময়।

রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে অনুরূপ কালিদাসের প্রভাব প্রকট। মেঘদূতের চিত্র বা রাধিকার বিরহ ও অভিসার সুন্দরভাবে পড়েছে। বর্ষা সম্পর্কে গান ও কবিতা মেঘদূতের যক্ষ-যক্ষিনীর ও রাধিকার বিরহের গন্ধবহ বাতাস। এই অপূর্ব হৃদয়ানুভূতি সূক্ষ্মভাবে বর্ষাকাব্যে ঘুরে ফিরে এসে রসময় করে তুলেছে।

রবীন্দ্র সাহিত্যে মেঘদূত প্রসঙ্গ নানাভাবে পুনঃ পুনঃ এসেছে। মানসীকাব্যে 'মেঘদূত', চৈতালি কাব্যে 'মেঘদূত' পুনশ্চকাব্যে 'বিচ্ছেদ', শেষ সপ্তকের সংযোজন অংশে 'যক্ষ' (শেষ সপ্তকের আটত্রিশ সংখ্যক কবিতা লক্ষণীয়), লিপিকায় 'মেঘদূত',

প্রাচীন সাহিত্যে 'মেঘদূত', সম্পূরণ রূপান্তর পর্যায়ে 'মেঘদূত'। সূচনা (পূর্ব মেঘ) পাঠান্তর উল্লেখ্য। এখন এই অংশ নিরিখে মেঘদূতের মূল বক্তব্যকে একটি তত্ত্বে অনায়াসে আনা যায়।

অনাদি কাল থেকে মানুষের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা গেছে মানুষের মধ্যে একটা সীমাহীন ব্যবধান গড়ে ওঠে। মানুষ মিলিত হতে চায়, প্রিয়তমস্থানে এগিয়ে যায় কিন্তু আসল-স্থানে পৌঁছানো সম্ভব হয় না। এই ব্যবধান কাব্যে রূপ নেয় চির বিরহরূপে।

ঈশ্বরের অপূর্ব লীলা। মানুষ ঈশ্বরের মানসলোক থেকে বহুদূরে সরে এসেছে। তার প্রকৃতস্থান পৃথিবীর মানসলোকে। ঈশ্বর থেকে তার বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়েছে। তিনি ভালবাসার আশ্রয় মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের ভালবাসা, প্রেমের প্রত্যয়ে তিনি আনন্দ প্রকাশ করেছেন। আবার এটা উপলব্ধির বিষয় আদিমকাল থেকে মানুষ জন্মচক্রের মধ্য দিয়ে প্রেমের পথে যাত্রা করেছে কিন্তু সে পথের সন্ধান আজও মেলেনি। তার প্রাণ চঞ্চল হয়ে উঠেছে বিরহ বেদনার মধ্য দিয়ে। আবার দেখা গেছে, মানুষ-মানুষের বিরহ। মানুষ মানুষের কাছে থেকেও মিলিত হতে পারে না। পরস্পর বিরাট ব্যবধানের রাজ্যে অবস্থান করে। মানুষের মধ্যে দুটি মানুষের রূপ : একটি দূরাগত অন্যটি খুব নিকটের। দূরাগতকে কোনদিনই লাভ করা যায় না—বহু আকাঙ্ক্ষিত। অন্যটি সংসারের মাঝে মিলনের অংশ বিশেষ। এই দুটি মানুষ একই বৃন্তে না আসতে পেরে বিরহ বেদনা ভোগ করে। চির-তন বিরহকে আঁকড়ে বুকে রাখে। স্বভাবতঃ একটি সম্পূর্ণ মানুষ দেখলেও তার মধ্যে করুণ সুরের বাঁশি কেঁদে কেঁদে ফিরে। এই অনুষঙ্গে মেঘদূত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : "বিরহাবস্থার মধ্যে একটা বন্দীভাব আছে কিনা - এই জন্যে বাধাহীন আকাশের মধ্যে মেঘের স্বাধীন গতি দেখে অভিশাপগ্রস্ত যক্ষ আপনার দুরন্ত আকাঙ্ক্ষাকে তারই উপরে আরোপণ করে বিচিত্র নদী, পর্বত, বন, গ্রাম, নগরীর উপর দিয়ে আপনার অপার স্বাধীনতার সুখ উপভোগ করতে করতে ভেসে চলেছে। মেঘদূত কাব্যটা সেই বন্দী-হৃদয়ের বিশ্বভ্রমণ। অবশ্য নিরুদ্দেশ্য নয় — সমস্ত ভ্রমণের শেষে বহু দূরে একটি আকাঙ্ক্ষারাধন আছে — সেইখানে চরম বিশ্রাম।" চিরবিরহ কথা উল্লেখ করে বৈষ্ণব কবি গেয়েছেন, "দুহুঁ -কোলে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।"

শেষ সপ্তকের সংযোজনে "যক্ষ' ও 'বিচ্ছেদ' কবিতা দুটির মধ্যে বিরহের সাদৃশ্য বিদ্যমান। 'যক্ষ' কবিতায় প্রত্যক্ষ স্থানগত প্রভাব নেই। কিন্তু এই কবিতা রচনাকালে পাহাড় পরিবেশের কথা কবির মনে ছিল। উল্লেখ করা যায়,

যাত্রামন্ত্র বিশ্বপথিকের
মেঘধ্বজে আঁকা, দিগ্বধূ –প্রাঙ্গণ হতে নির্ভীকের
শূন্যপথে অভিসার।

যক্ষের কল্পনাকে রূপ দিতে মহাকবি কালিদাসের মেঘদূতের ছবি তাঁর হৃদয়ে ছিল। মহাকবি কালিদাস নির্জন রামগিরি শিখর ও শীতল ঝরণার অবতারণা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষভাবে পুনশ্চকাব্যে "বিচ্ছেদ" কবিতায় বলেছেন:

"যে দিন মেঘদূত লিখেছেন কবি
সেদিন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে নীল পাহাড়ের গায়ে।
দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছুটেছে মেঘ,
পূবে হাওয়া বয়েছে শ্যাম জম্বুবনান্তকে দুলিয়া দিয়ে।
যক্ষনারী বলে উঠেছে; —
মাগো, পাহাড় সুদ্ধ নিল বুঝি উড়িয়ে।"

আরো বলেছেন:

সেদিনকার পৃথিবী জেগে উঠেছিল
উচ্ছল ঝরনায়, উদ্বেল নদী স্রোতে
মুখরিত বন হিল্লোলে,
...   .
যে দিন এল বিচ্ছেদ
সে দিন বাঁধন-ছাড়া দুঃখ বে রোল
নদী গিরি অরণ্যের উপর দিয়ে।

'বিচ্ছেদ' কবিতার মধ্যে অভিসারিকার জয়কে দেখানো হয়েছে। তাকে সাহায্য করেছে নিসর্গ। আর শেষ সপ্তকের সংযোজন অংশে 'যক্ষ' কবিতার গভীরে কালিদাসের মেঘদূতের ইমেজ 'পূর্বমেঘ' রবীন্দ্রনাথের মনে ছিল। তাঁর উদ্ধৃতিতে দেখা যায়: "মনে পড়িতেছে, কোনো ইংরেজ কবি—লিখিয়াছেন, মানুষেরা এক—একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো, পরস্পরের মধ্যে অপরিমেয় অশ্রুলবণাক্ত সমুদ্র।"...আমরা প্রত্যেক

নির্জন গিরিশৃঙ্গে একাকী দণ্ডায়মান হইয়া উত্তরমুখে চাহিয়া আছি — মাঝখানে আকাশ এবং মেঘ এবং সুন্দরী পৃথিবীর রেবা শিপ্রা অবন্তী উজ্জয়িনী সুখ সৌন্দর্য ভোগ ঐশ্বর্যের চিত্রলেখা ; যাহাতে মনে করাইয়া দেয় , কাছে আনিয়া দেয় না ; আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করে নিবৃত্তি করে না । দুটি মানুষের মধ্যে এতটা দূর ।" রবীন্দ্রনাথের রূপান্তর কর্মে তার প্রকাশ ঘটেছে । তা পাশাপাশি দেখানো হল ।

মেঘদূত ।। সূচনা

পূর্ব মেঘ

কশ্চিৎ কান্তা বিরহগুরুণা স্বাধিকার প্রমত্ত :
শাপেনাস্তং গমিত মহিমা বর্ষ ভোগ্যেন ভর্তু : ।
যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নান পুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধ ছায়া তরুষু বসতিং রাম গির্যাশ্রমেষু ।। ১

মেঘদূত ।। সূচনা

পূর্ব মেঘ

যক্ষ সে কোনোজনা আছিল আনমনা ,
সেবার অপরাধে প্রভু শাপে
হয়েছে বিলুপ্ত মহিমা ছিল যত —
বরষকাল যাপে দুখ তাপে ।
নির্জন রাম গিরি - শিখরে মরে ফিরি
একাকী দূরবাসী প্রিয়া হারা ,
যেথায় শীতল ছায় ঝরণা বহি যায়
সীতার স্নানপূত জলধারা ।। ১

পাঠান্তর

অভাগা যক্ষ যবে
করিল কাজে হেলা
কুবের তাই তারে দিলেন শাপ —
নির্বাসনে সে রহি

প্রেয়সী –বিচ্ছেদে
বর্ষ ভরি সবে দারুণ জ্বালা ।
গেল চলি রামগিরি—
শিখর –আশ্রমে
হারায়ে সহজাত মহিমা তার ,
সেখানে পাদপরাজি
স্নিগ্ধ ছায়াবৃত
সীতার স্নানে পূত সলিল ধার ।। ১

পাহাড় পরিবেশ দুভাবে কাজ করেছে । প্রত্যক্ষে এবং পরোক্ষে । যখন রবী-দ্রনাথ বাস্তব পরিবেশে থেকেছেন , সেই সময় তাঁর কবিতায় , গল্পে , চিঠি ইত্যাদি অংশে সরাসরি প্রভাব দেখা গেছে । আবার অনেকক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে , কবি যখন অন্যস্থানে অন্য পরিবেশে সেই সময় আর এক পরিবেশের কথা সাহিত্যের পাতায় তুলে ধরেছেন । কবির নিভৃত মনের স্বাক্ষর । এটা কে ফরাসীতে Milieu বলা যেতে পারে । এর উদাহরণ সমগ্র আলোচনায় পরিলক্ষিত হয়েছে ।

দার্জিলিঙে বাস না করেও দার্জিলিঙের পরিবেশ , পরিজন এবং প্রকৃতি রবী-দ্রনাথের কবিতায় ও গল্পে স্থান পেয়েছে । স্থানগত প্রভাব হাজার হাজার মাইল দূর থেকে রচিত অংশে ধরা পড়েছে ।

... ...

'পুনশ্চ' কাব্যে 'ফাঁক' [১৪] কবিতাটি ১১ ভাদ্র ১৩৩১ সালে লেখা । তৎকালীন সমতল-বঙ্গে বিশেষ করে রাঢ়বঙ্গে গরম বেশ উপলব্ধির বিষয় । কবি গ্রীষ্মের প্রদাহের কথা ভাবছেন । পাহাড় পরিবেশের কথা অবশ্যই ।

পাখা কোথায় ,
কোথায় দার্জিলিঙের টাইম–টেবিলটা ,
এমন তরো হাঁপিয়ে ওঠবার ইশারা ছিল
ঘামো মিটারে ।

তবু ছিলেম স্থির হয়ে ।
বেলা দুপুর
আকাশ ঝাঁ ঝাঁ করছে ,

ধূ ধূ করছে মাঠ,
তপ্ত বালু উড়ে যায় হু হু করে,
খেয়াল হয় না।

আবার পুনশ্চ কাব্যে 'ক্যামেলিয়া'[১৫] কবিতায় প্রত্যক্ষ পরিবেশগত প্রভাব না থাকলেও পরোক্ষভাবে কবি দার্জিলিঙের কথা স্মরণ করছেন।

খবর পেয়েছি পরমের ছুটিতে ওরা যায় দার্জিলিঙে।
সেবার আমারও হাওয়া বদলাবার জরুরি দরকার।
ওদের ছোট বাসা, নাম দিয়েছে মতিয়া --
রাস্তা থেকে একটু নেমে এক কোণে
গাছের আড়ালে
সামনে বরফের পাহাড়।
শোনা গেল আসবে না এবার।
ফিরব মনে করছি এমন সময়ে আমার এক ভক্তের সঙ্গে দেখা,
মোহনলাল ---
রোগা মানুষটি লম্বা চোখে চশমা,
দুর্বল পাকযন্ত্র দার্জিলিঙের হাওয়ায় একটু উৎসাহ পায়।

'পত্রপুট' কাব্যে প্রথম কবিতাটি[১৬] রবী-দ্রনাথ ৪ মে ১৯৩৫ সালে রচনা করেন। স্থান শান্তিনিকেতন। এখানে অবস্থান করে তিনি দার্জিলিঙ পাহাড় পরিবেশের পরিপূর্ণ চিত্র তুলে ধরেছেন।

ছিলেম দার্জিলিঙে,
সদর রাস্তার নিচে এক প্রচ্ছন্ন বাসায়।
সঙ্গীদের উৎসাহ হল
রাত কাটাবে সিঞ্চল পাহাড়ে।
ভরসা ছিল না সন্ন্যাসী গিরিরাজের নির্জন সভার 'পরে —
কুলির পিঠের উপরে চাপিয়েছি নিজেদের সম্বল থেকেই
অবকাশ— সম্ভোগের উপকরণ।

সঙ্গে ছিল একখানা এস্‌রাজ, ছিল ভোজ্যের পেটিকা,
ছিল হো হা করবার অদম্য উৎসাহী যুবক,
টাট্টুর উপর চেপেছিল আনাড়ি নবগোপাল,
তাকে বিপদে ফেলবার জন্যে ছিল ছেলেদের কৌতুক।
সমস্ত আঁকাবাঁকা পথে
বেঁকে বেঁকে ধ্বনিত হল অট্টহাস্য।
শৈল শৃঙ্গবাসের শূন্যতা পূরণ করব কজনে মিলে,
সেই রস জোগান দেবার অধিকারী আমরাই
এমন ছিল আমাদের আত্মবিশ্বাস।

২০ ডিসেম্বর ১৯২৪ সালে কবি সুদূর বুয়ে নোস এয়ারিস থেকে 'চিঠি'[১৭] নামে একটি কবিতা রচনা করেন। কবিতাটি 'পূরবী' কাব্যে স্থান পেয়েছে।

চিঠি

শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কল্যাণীয়েষু,

... ...

শিমলে নাকি দারুণ গরম, শুনছি দার্জিলিঙে
নকল শিবের তাণ্ডবে আজ পুলিস বাজায় শিঙে।

পলাতকা কাব্যে 'ফাঁকি'[১৮] কবিতায় বিস্তৃত বর্ণনায় কবি দার্জিলিঙে অবস্থান না করেও শৈল শহরকে ভুলতে পারছেন না।

টিকিটবাবু বললে হেসে, "তারা মাসেক আগে
গেছে চলে দার্জিলিঙে কিংবা খসরু বাগে,
কিংবা আরাকানে।"

কবি ৪ বৈশাখ ১৩২১ সালে (১৭ এপ্রিল ১৯১৪) "এসো এসো হে তৃষ্ণার জল, কলকল্ ছল ছল্" ৩০ শীর্ষক একটি গান রচনা করেন শান্তিনিকেতনে নলকূপ খনন প্রচেষ্টা উপলক্ষ্যে। তিনি শান্তিনিকেতনে তখন অবস্থান করছেন। সেখানে থেকেও তিনি পাহাড় প্রকৃতিকে ভুলতে পারছেন না। তাঁর মনের গভীরে তার ছায়া প্রতীয়মান।

... .

মরুদৈত্য কোন মায়াবলে
তোমারে করেছে বন্দী পাষাণ শৃঙ্খলে ।
ভেঙে ফেলে দিয়ে কারা এসো বন্ধহীন ধারা,
এসো হে প্রবল, কল কল্ ছল ছল্ ॥[১৯]

কবিগুরু ৩১ ডিসেম্বর ১৯২৮ সালে শান্তিনিকেতন থেকে দিলীপকুমার রায়কে একটা চিঠি লিখছেন । কবির কাছে কবিতায় আশীর্বাদ চেয়েছিলেন দিলীপ কুমার রায় । পত্রের শেষে কবিতাটি কবি প্রেরিত আশীর্বাদ । দিলীপকুমার এই কবিতাটিকে তাঁর "অনামী" গ্রন্থের প্রথমে আশীর্বাদ শিরোনামায় প্রকাশ করেছিন'। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের 'পরিশেষ' কাব্যেও 'আশীর্বাদ'[২০] কবিতাটি স্থান পেয়েছে ।

আশীর্বাদ

তরুণ আশীর্বাদ প্রার্থীর প্রতি প্রাচীন কবির নিবেদন
শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ের উদ্দেশে—

নিম্নে সরোবর স্তব্ধ হিমাদ্রির উপত্যকাতলে ।
ঊর্ধ্বে গিরিশৃঙ্গ হতে শ্রান্তিহীন সাধনার বলে
তরুণ নির্ঝর ধায় সিন্ধু সনে মিলনের লাগি
অরুণোদয়ের পথে । সে কহিল, "আশীর্বাদ মাগি
হে প্রাচীন সরোবর ।' সরোবর কহিল হাসিয়া,
"আশিস তোমারি তরে নীলাম্বরে উঠে উদ্ভাসিয়া
প্রভাত সূর্যের করে ; ধ্যানমগ্ন গিরিতপস্বীর
বিগলিত করুণার প্রবাহিত আশীর্বাদনীর
তোমারে দিতেছে প্রাণধারা । আমি বনচ্ছায়া হতে,
নির্জনে একান্তে বসি, দেখি নির্বারিত স্রোতে
সঙ্গীত - উদ্বেল নৃত্যে প্রতিক্ষণে করিতেছ জয়
তমসীকৃষ্ণ বিঘ্নপুঞ্জ, পথরোধী পাষাণ সঞ্চয়,
গূঢ় জড় শত্রু দল । এই তব যাত্রার প্রবাহ
আপনার গতিবেগে আপনার জাগায় উৎসাহ ।"

১৪ পৌষ ১৩৩৫

—এই কবিতায় পাহাড় পরিবেশের অনুষঙ্গ ধরা পড়েছে। হিমালয় কেন্দ্রিক চিন্তা। গিরিশৃঙ্গের কথায় অনেকক্ষেত্রেই দার্জিলিঙের কথা বলতে চেয়েছেন। 'সে' গল্পে গল্পকার রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, [২১] এর মধ্যে পুলে দিদি গেছে দার্জিলিঙে। সে রইল মাথা ঘষা গলিতে একলা আমার জিম্মায়। তার ভালো লাগছে না। আমিও জ্বালাতন হয়েছি। বলে, আমাকে দার্জিলিঙ পাঠাও।"

"প্রগতি সংহার" [২২] গল্পে নায়ক নীহার ও নায়িকা সলিলা দার্জিলিঙ কলেজে পড়াশুনা করত। "সলিলার সঙ্গে নীহারের ছিল বিশেষ ঘনিষ্ঠতা। সে নীহারকে প্রস্তাব করলে —তুমিও দার্জিলিংএ চলে এসো। নীহার বললে —আমার বাপ তো তোমার বাপের মতো লক্ষপতি নয়। দার্জিলিংএ পড়াশুনা করি এমন শক্তি কোথায়? শুনে সে মেয়ে বললে — আচ্ছা আমি দেবো তোমার খরচ। নীহারের এই গুণ ছিল, তাকে যা দেওয়া যায়, তা পকেটে করে নিতে একটুও ইতস্তত করে না। সে ধনী ছাত্রীর খরচায় দার্জিলিংএ যাওয়াই ঠিক করলে।

দার্জিলিঙের পারিপার্শ্বিকতা রবীন্দ্রনাথকে দুভাবে প্রভাবিত করেছে। প্রথমত কবি সরাসরি প্রত্যক্ষভাবে এখানকার দিনযাপনের অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করছেন। এই অভিজ্ঞতা কখনো প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে। কখনো মানুষকে। দ্বিতীয়ত এখানকার পরিবেশ—নিরপেক্ষ জীবনের নানা সমস্যা ও অনুভূতিকে রূপ দিয়েছেন। তাঁর এক ধরণের কবিতা বা রচনা এখানকার পরিবেশের প্রত্যক্ষ ফসল, অন্যকোন স্থানে এগুলি লেখা সম্ভব হত না। আর এক ধরণের কবিতা সম্পর্কে বলা চলে, এগুলি একই পরিবেশজাত হলেও এগুলির মধ্যে এই পারিপার্শ্বিকতার বাহ্যিক কোন চিত্র নেই, যে কোন অবস্থাতেই এগুলি রচিত হতে পারত। তাই সহজেই বলা যায়, প্রথম শ্রেণীর কবিতা বা রচনায় ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ এসেছে, এদের ব্যক্তিগত পর্যায়ে ফেলা যায়। অন্য শ্রেণীর কবিতাগুলির ভাব ও বিষয়বস্তু যদিচ আত্মনিষ্ঠ, তবু সেগুলি নির্বিশেষ পর্যায়ের।

দার্জিলিঙে কবির আগমনের পিছনে বহুবিধ কারণ রয়েছে। কখনো স্বাস্থ্যোদ্ধারে, কখনো শহরের ব্যস্ততা থেকে মুক্তির আশায় কখনো বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির আমন্ত্রণে কবি শৈলশহরে অবস্থান করেছেন। ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ এবং এই সমাজের ব্যক্তিবর্গের প্রভাব দার্জিলিঙ বসবাসের অন্যতম আকর্ষণ ও কারণ। দার্জিলিঙে ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৮৮০ সালে। এখানকার ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরের সঙ্গে

কবির যোগাযোগ ছিল । এই ব্রাহ্ম সমাজের মূল পরিচালিকা ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রীর কন্যা হেমলতা সরকার । হেমলতা দেবীর স্বামী ডা: বিপিন বিহারী সরকার ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক । হেমলতা সরকার দার্জিলিঙের বহু সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । কবিগুরুর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়েছিল । মৈত্রেয়ী দেবী তাঁর "মর্মের কাছাকাছি" গ্রন্থে লিখেছেন, "দার্জিলিঙে এই সময় কলকাতার জ্ঞানীগুণী বেশী উপস্থিত হতেন । এঁদের মধ্যে বেশীর ভাগই ব্রাহ্মসমাজের লোক ।" যাঁরা কবির সঙ্গে দেখা করতেন, তাঁদের মধ্যে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, যদুনাথ সরকার, জগদীশচন্দ্র বসু, মহারানী সুনীতি দেবী, মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ প্রমুখ । আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু সম্পর্কে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর পিতৃস্মৃতি গ্রন্থে বলেছেন, "গ্রীষ্মকালে দার্জিলিঙের 'মায়াপুরী 'তে জগদীশচন্দ্র থাকতেন । তার কাছেই গ্লেন ইডেনে আমাদের বাসা । যে বছরের কথা বলছি তখন জগদীশচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভগ্নপ্রায় । আমার পিতা ঘন ঘন তাঁর কাছে যেতেন । কাব্যালোচনা বিশেষ হত না । পিতৃদেবের কাছ থেকে যেন জগদীশ চন্দ্র শুনতে চাইতেন দার্শনিক প্রসঙ্গ । বেশ বোঝা যেত তাঁর মনের মধ্যে জীবন-মৃত্যুর রহস্য নিয়ে তুমুল আন্দোলন চলছে । বৈজ্ঞানিক যুক্তি বিচার তাঁকে যেন সম্পূর্ণ তৃপ্তি বা শান্তি দিতে পারছে না । প্রচলিত ধর্মমত ও পুরোপুরি গ্রহণ করতে তাঁর বৈজ্ঞানিক মন সায় দিচ্ছে না । তাই ক্রমাগত কবিকে প্রশ্ন করতেন, তাঁর সাধনার ফলে তিনি কী উপলব্ধি করেছেন । বিজ্ঞানী বা তত্ত্বজ্ঞানী অনেক বিচার-প্রমাণের জটিল রাস্তায় ঘুরে ফিরেও যে মীমাংসায় পৌঁছতে পারে না — কবি বা সাধক হয়তো তাঁদের সহজ অন্তর্দৃষ্টির গুণে অনায়াসে তার সন্ধান পেয়েছেন । এই ধরণের একটি বিশ্বাস হয়তো তাঁর হয়েছিল এবং এই জন্যই আমার পিতাকে এ বিষয়ে তিনি ক্রমাগত প্রশ্ন করতেন ।"

কার্সিয়াং :

রবী-দ্রনাথ ২৩ আশ্বিন ১৩০৩এ রবী-দ্রনাথ ও দিনে-দ্রনাথকে নিয়ে দার্জিলিঙ গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ত্রিপুরা-রাজের আম-ত্রণে কার্তিকের শুরুতে কার্সিয়াঙে যান। ত্রিপুরার মহারাজা বীরচ-দ্র মাণিক্যের সঙ্গে যোগাযোগ দার্জিলিঙ অবস্থানকালে হয়েছে। তিনি রবী-দ্রনাথকে তাঁর সঙ্গী হবার জন্য আহ্বান করেন। বীরচন্দ্রের তরুণ অনুচর কর্নেল মহিমচ-দ্র দেববর্মা লিখছেন :

"যখন কলিকাতা হইতে ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারকল্পে রুগ্ন মহারাজ বীরচ-দ্রকে লইয়া কার্সিয়াং-এ গমন করি, তখন মহারাজ, কবি রবী-দ্রনাথকে সঙ্গে করিয়া লইলেন। তখনকার কথা আমার বেশ স্মরণ আছে। রাত্রি প্রায় ১০টা বাজিয়া যাইত, অবিশ্রান্ত-ভাবে মহারাজ রবী-দ্রনাথকে লইয়া সঙ্গীত এবং কাব্য আলোচনায় মগ্ন থাকিতেন; বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার উপায় উদ্ভাবনা করিতেন, আলোচনান্তে প্রতি রাত্রে মহারাজ উঠিয়া রবিবাবুকে সিঁড়ি পর্য্যন্ত আসিয়া বিদায় সম্ভাষণ করিয়া যাইতেন। মহারাজ বীরচ-দ্র অসুস্থ; অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়া হাস্য মুখেই তিনি আলোচনায় যোগ দিতেন; এ কথা রবিবাবু জানিতেন। তিনি এক দিন, মহারাজে অনর্থক কেন কষ্ট করিয়া সিঁড়ি পর্য্যন্ত তাঁহাকে আগুয়াইয়া দেন এরূপ অনুযোগ করিলেন। তখন বীরচ-দ্র বলিয়াছিলেন--'রবিবাবু পাছে অনমতা আসিয়া কর্ত্তব্যে ত্রুটি ঘটায়, আমি সে ভয় করি, আপনি আমাকে বাধা দিবেন না।' পিতৃতুল্য বীরচন্দ্রের এরূপ ব্যবহার দর্শন এবং উত্তর শ্রবণ করিয়া রবিবাবু বলিতেন— "আমি আভিজাত্য বংশের মহিমার পরিচয় পাইয়া ধন্য হইলাম।"

১২ ফাল্গুন ১৩৩২ আগরতলার কিশোর সাহিত্য সমাজে ভাষণ দিতে গিয়ে রবী-দ্রনাথ এই ভ্রমণের স্মৃতিচারণ করে বলেছিলেন :

"তিনি কার্সিয়াং-এ যাবার সময় আমাকে তাঁর সঙ্গে যাবার জন্যে আম-ত্রণ করলেন। আমি তাঁর সঙ্গে গেলাম। প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় তিনি আমার লেখা শুনতেন আর গান গাইতে বলতেন।—মহারাজ বীরচ-দ্র অসাধারণ সঙ্গীত বিশারদ ছিলেন। তাঁর কাছে আমার মত অনভিজ্ঞের গান-গাওয়া যে কতদূর সঙ্কোচের ছিল তা' সহজেই অনুমেয়। কেবলমাত্র তাঁর স্নেহের প্রশ্রয়ে আমাকে সাহস দিয়েছিল।....

তাঁর মৃত্যুর অনতিকাল পূর্বে যখন আমি তাঁর আতিথ্য ভোগ করেছিলেম, সেই সময়ে তাঁর সঙ্গে সাহিত্য সম্বন্ধে নানারকম আলাপ হতো। বৈষ্ণব পদাবলী যথাসম্ভব সম্পূর্ণভাবে সংগ্রহ ও প্রকাশ করবার অভিপ্রায়ে এক লক্ষ টাকা ব্যয় করবার সংকল্প তাঁর ছিল। কিন্তু তার পরই তাঁর সহসা মৃত্যু হওয়াতে যে সংকল্প সফল হতে পারে নি।"

এক বছর আগে ১ কার্তিক ১৩০২ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন; "রাজারে গুজব, আপনি বৈষ্ণব কবিদিগের কবিতা সংগ্রহ করিয়া একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক প্রস্তুত করিতেছেন"[১৪]-এর থেকে মনে হয়, মহারাজ বীরচন্দ্রের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা অনেক দিন ধরেই চলেছিল।

৩০ বৈশাখ ১৩৪৮ তারিখে "ভারত ভাস্কর" পদবী গ্রহণ উপলক্ষে ভাষণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আর-একটি নূতন তথ্যের উল্লেখ করেন:

"আমার তখন বয়স অল্প, লেখার পরিমাণ কম, এবং দেশের অধিকাংশ পাঠক তাকে বাল্যলীলা বলে বিদ্রূপ করত। বীরচন্দ্র তা' জানতেন এবং তাতে তিনি দুঃখ বোধ করেছিলেন। সেই জন্য তাঁর একটি প্রস্তাব ছিল লক্ষ টাকা দিয়ে তিনি একটি সুচিত্র ছাপাখানা কিনবেন এবং সেই ছাপাখানায় আমার অলংকৃত কবিতার সংস্করণ ছাপা হবে। তখন তিনি ছিলেন কার্শিয়াং পাহাড়ে, বায়ু পরিবর্তনের জন্য।"

রবীন্দ্রনাথের কবিতার অলংকৃত সংস্করণ ছাপাবার সংকল্প বীরচন্দ্রের পূর্ণ হয়নি বটে, কিন্তু ৭ কার্তিক (বৃহ ২২ অক্টোবর) রবীন্দ্রনাথ তাঁকে মূল ফটোগ্রাফ-সহ কাব্য গ্রন্থাবলী-র একটি "উৎকৃষ্ট সংস্করণ" উপহার দেন। মহারাজের অতিথি-রূপে তিনি 'কেম্প সাইড' নামক ভবনে তখন অবস্থান করছিলেন। উপহারপত্রে তারিখের সঙ্গে এই ভবনের নামটিও উল্লিখিত হয়েছে।

রথী-দ্রনাথ ও কার্শিয়াঙে পিতার সঙ্গী হয়েছিলেন। শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় "স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি" বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর" প্রবন্ধে লিখেছেন; "রবিবাবু মহারাজের কার্শিয়াং স্থিত ভবনে প্রায় এক মাস কাল সপুত্র আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন।" এই সময়ে তোলা রথী-দ্রনাথের একটি আলোক চিত্র রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন, মাধুরীলতার পত্রে তার উল্লেখ আছে।

বীরচন্দ্রের একান্ত সচিব রাধারমণ ঘোষ ভগ্ন হৃদয় এর কবির কাছে মহারাজের বার্তা বহন করে নিয়ে এসেছিলেন, একথা আমাদের জানা। পরেও কলকাতায় তাঁদের

সাক্ষাৎ হয়ে থাকতে পারে। কার্সিয়াঙে উভয়ের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটল। মহিমচন্দ্র দেববর্মা এই প্রসঙ্গে লিখেছেন :

"বীরচন্দ্র মানিক্যের সভায় একটি রত্নের পরিচয় পাইয়া আনন্দ পাইয়াছেন বলিয়া রবিবাবুকে বলিতে শুনিয়াছি। তিনি ছিলেন রাধারমণ ঘোষ। কার্সিয়াং -এ রবিবাবুর পরিচর্য্যার ভা আমার উপর ন্যস্ত ছিল। একত্রে তাহার বিহার করিয়া পরম আনন্দে দিন কাটিত। প্রায়ই সকালে ৮টার সময় আমি মহারাজের মনস্তুষ্টির জন্য নানা স্থানের ছায়া চিত্র সংগ্রহে বাহির হইয়া পড়িতাম। আর রবিবাবু রাধারমণ বাবুকে লইয়া বৈষ্ণব দর্শন এবং পদাবলী আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন। একদিন ফোটো তুলিয়া প্রায় ১টার সময় বাসায় আসিয়া দেখিলাম, রাধারমণবাবু ও রবিবাবু আলাপে তন্ময় হইয়া আছেন। তখন বৈষ্ণবদর্শনের সহিত এমার্সনের চলিতেছিল। আমি আসিয়া রস ভঙ্গ করিয়া দিলাম; কারণ আমার উদরে ক্ষুধানল প্রজ্বলিত; তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও রবিবাবুকে সে আলোচনা স্থগিত রাখিতে হইল। ভাবে বুঝিলাম, এই শীর্ণকায় রাধারমণ ঘোষ তাঁহাকে বেশ পাইয়া বসিয়াছেন। রবিবাবু রাধারমণের গভীর পাণ্ডিত্যে এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে বৈষ্ণব দর্শন পাঠ করিতে হইবে এ কথা তিনি স্বীকার করিলেন। অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায় বেড়াইতে বাহির হইলে রবিবাবু মহারাজ বীরচন্দ্র এবং তাহার সহচর রাধারমণের প্রসঙ্গ অনর্গল আলোচনা করিতেন। ইহাতে বুঝা যায় রবিবাবুর গুণগ্রহণ করিবার শক্তির প্রখরতা।"

তিনি ছেলে ভুলানো ছড়া, রূপকথা, ব্রতকথা ইত্যাদি লোকসাহিত্য সংগ্রহের প্রয়াস শুরু করেছিলেন। তাতে বিভিন্ন ব্যক্তি তাঁর সহায়তা করেছিলেন, সাধনা'র শেষ বার তিনি শান্তিনিকেতন আশ্রমের কর্মী অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়কে দিয়ে "মেয়েলি ব্রত" শিরোনামে 'রাম দুর্গা বা পূর্ণিমার ব্রত "(চৈত্র ১৩০১), 'দশ পুতুল ব্রত' ও 'হরিচরণ ব্রত' (জ্যৈষ্ঠ ১৩০২), 'সাঁজ পূজানী' (আষাঢ়) এবং 'মঙ্গলবার' বা মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত' (শ্রাবণ) সঙ্কলন করিয়েছিলেন,' কৃষ্ণনগরের দীনেন্দ্রকুমার রায়কে (১৮৬৯—১৯৪৩) দিয়ে লেখান 'পৌষ সংক্রান্তি' (মাঘ ১৩০১), চড়ক সংক্রান্তি (বৈশাখ ১৩০২), বারতলার মেলা' (আষাঢ়), 'পল্লীগ্রামে রথযাত্রা' (শ্রাবণ) প্রভৃতি পল্লী পার্বণের বর্ণনা মূলক প্রবন্ধ। অঘোরনাথকে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ আরও কয়েকটি

ব্রতকথা সকলন করিয়ে 'মেয়েলি ব্রত' নামে প্রকাশের বন্দোবস্ত করে দেন। ৭ কার্তিক (বৃহ ২২ অক্টোবর) কার্সিয়াঙে বসে তিনি এই বইটির জন্য পেনসিলে লেখা একটি দীর্ঘ ভূমিকা কালিতে কপি করে মুদ্রণের নির্দেশ দিয়ে অঘোরনাথকে পাঠিয়ে দেন। লোক-সাহিত্য-সংগ্রহ বিষয়টিকে রবী-দ্রনাথ কতটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন, তার একটি পরিচয় হিসেবে রচনাটি মূল্যবান।

"সাধনা পত্রিকা সম্পাদন কালে আমি ছেলে ভুলাইবার ছড়া এবং মেয়েলি ব্রত সংগ্রহ ও প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম। ব্রতকথা সংগ্রহে, অঘোরবাবু আমার প্রধান সহায় ছিলেন, সেজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছি।

অনেকের নিকট এই সকল ব্রতকথা ও ছড়া নিতান্ত তুচ্ছ ও হাস্যকর বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা গম্ভীর প্রকৃতির লোক এবং এরূপ দুঃসহ গাম্ভীর্য্য বর্ত্তমান কালে বঙ্গ সমাজে অতিশয় সুলভ হইয়াছে।

বালকদিগের এমন একটি বয়স আসে যখন তাহারা বাল্য সম্পর্কীয় সকল প্রকার বিষয়কেই অবজ্ঞার চক্ষে দেখে, অথচ পরিণত বয়সোচিত কার্য্য সকলও তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক হয় না। তখন তাহারা সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে থাকে পাছে কোন সূত্রে কেহ তাহাদিগকে বালক মনে করে। বঙ্গ সমাজের গম্ভীর -সম্প্রদায়েরও সেই দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা বঙ্গভাষা, বঙ্গ সাহিত্য, বঙ্গদেশ—প্রচলিত সর্ব্বপ্রকার ব্যাপারের প্রতি অবজ্ঞা মিশ্রিত কৃপাকটাক্ষপাত করিয়া আপন প্রকৃতির অতলস্পর্শ গাম্ভীর্য্য এবং পরিণতির প্রমাণ দিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। অথচ তাঁহারা আপন অভ্রভেদী মহিমার উপযোগী আর যে কিছু মহৎ কীর্ত্তি রাখিয়া যাইবেন এমন কোন লক্ষণও প্রকাশ পাইতেছে না।

য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাসে যথেষ্ট মনোযোগ করিয়া থাকেন এবং ছড়া রূপকথা প্রভৃতি সংগ্রহেও সঙ্কোচ বোধ করেন না। তাঁহাদের এ আশঙ্কা নাই পাছে লোক সাধারণের নিকট তাঁহাদের মর্য্যাদা নষ্ট হয়। প্রথমতঃ তাঁহারা জানেন যে, যে সকল কথা ও গাথা সমাজের অন্তঃপুরের মধ্যে চিরকাল স্থান পাইয়া আসিতেছে তাহারা দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ না হইয়া যায় না—দ্বিতীয়তঃ যাহারা স্বদেশকে অন্তরের সহিত ভালবাসে তাহারা স্বদেশের সহিত সর্ব্বতোভাবে অন্তরঙ্গরূপে পরিচিত হইতে চাহে—এবং ছড়া, রূপকথা, ব্রতকথা প্রভৃতি

ব্যতিরেকে সেই পরিচয় কখনো সম্পূর্ণতা লাভ করে না।

সাধনায় যখন আমি এগুলি সংগ্রহ ও প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম তখন আমার কোন প্রকার মহৎ উদ্দেশ্য ছিল না। সমাজের সুধাভাণ্ডার যে অন্তঃপুর, তাহারই প্রতি স্বাভাবিক মমত্ববশত আকৃষ্ট হইয়া আমাদের মাতা মাতামহী আমাদের স্ত্রী কন্যা সহোদরাদের কোমল হৃদয়-পালিত মধুরকণ্ঠ-লালিত চিরন্তন কথাগুলিকে স্থায়ীভাবে একত্র করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম এবং অঘোরবাবুকে এই সমস্ত মেয়েলিব্রত গ্রন্থ আকারে রক্ষা করিতে উৎসাহী করিয়াছি, সেজন্য গম্ভীর প্রকৃতি পাঠকদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং সেই সঙ্গে এ কথাও বলিয়া রাখি যে, এই সকল সংগ্রহের দ্বারা ভবিষ্যতে যে কোন প্রকার গম্ভীর উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না এমনও মনে করি না। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্তবাবু দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। তিনি বঙ্গদেশের জনসাধারণ প্রচলিত পার্ব্বনগুলির উজ্জ্বল এবং সুন্দর চিত্র সাধনায় প্রকাশ করিয়া সাধনা— সম্পাদকের প্রিয় উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করিয়াছেন। সে চিত্রগুলি বঙ্গসাহিত্যে স্থায়ী ভাবে রক্ষা করিবার যোগ এবং আশা করি দীনেন্দ্রকুমার বাবু সেগুলি গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

কার্শিয়াং
৭ই কার্ত্তিক
১৩০৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তিনধরিয়া :

রবীন্দ্রনাথের জীবনে দেখা গেছে, তিনি যেখানে থেকেছেন, সেই স্থানটি মনোরম সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। পাহাড় এবং সমতল উভয় ক্ষেত্রই। সামান্য ছোট পাহাড় তিনধরিয়া, তার প্রভাব রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে কম নয়। বড় বড় শৈলবাস থাকতে, এই পাহাড়ের বৈচিত্র্য কবি অধিকতর বড় করে দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথের রচনায় একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়। তাঁর অধিকাংশ রচনায় তারিখ ও স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সূত্রগুলি তাঁর রচনার বিষয়ের গভীরে যাওয়ার সাহায্য করে। তিনধরিয়ায় কবির অবস্থান ও রচনা-তার পরিচয় বহন করে। ১৩১৭ সালে ২৫ বৈশাখ শান্তিনিকেতন গ্রীষ্মাবকাশের জন্য বন্ধ হয়ে যায় জন্মোৎসবের পরেই [২৩]। কবি ৩০ বৈশাখ ক'লকাতায় গেলেন, অজিতকুমারের বিবাহ উপলক্ষ্যে। অজিতকুমারের বিবাহ লাবণ্য লেখার সঙ্গে এবং কবিরই কন্যা সম্প্রদানের কথা। এই বিবাহ কিভাবে হবে তা নিয়ে একটু ঝামেলা হয়েছিল। অগত্যা কবিকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের রীতি অনুসারে বিবাহ দিতে হয়। ক'লকাতায় [২৪] সপ্তাহকাল থেকে তিনি এবার তিনধরিয়ায় গেলেন। এখানে আসার পূর্বে তিনি একটি চিঠিতে প্রমথ চৌধুরীকে লিখছেন,

"এখানে একলা ছাদের উপর চুপ করে বসে থেকে আমার মনটা বেশ ঠাণ্ডা থাকে কিন্তু দেখলুম শরীরের অবসাদ কিছুতেই ঘুচচে না। সেটা যেন সিন্ধবাদের বুড়ো মানুষটার মত ঘাড়ের উপর চেপে বসে আছে—যত দিন যাচ্চে ততই ভার যেন আরো বাড়চে। তাই ভাবচি একবার তিনধরিয়াটা পরখ করে দেখি।.....যদি পাহাড়ে যাই ওকেও সঙ্গে নিতে হবে। তোমরা যদি তিনধরিয়ায় যাও তাহলে আমার কোনো ভাবনাই থাকে না। কবে যেতে পারবে আমাকে জানালেই আমি চলে যাব। একটা গাড়ি, সেই বুঝে রিজার্ভ কোরো। শরীরটাকে বদল করতে পারলে ভাল হত মেরামৎ করে আর চলচে না। তাকে একটু নাড়া দিতে গেলেই আজকাল এত বেশি প্যাঁপোঁ করচে যে আমার নিজেরই রাগ হয়। বেচারার বেশি দোষ নেই—পঞ্চাশ বছরে ওকে সত্তর বছরের ওজনে খাটিয়ে নিয়েচি -যাকে বলে overtime খাটুনি—কিন্তু তার মজুরী কি পেলুম তাই ভাবি।" আরো লিখছেন :

"আমি তোমাদের গুরুজন যে কথা মনে রেখো অতএব যদি তিনধরিয়ায় তোমরা থাক তবে বাড়ির কর্তা কে হবে সে কথা ভুলে চলবে না। কিন্তু একটা বাবুর্চি তোমরা

নিয়ো, আমার উপর রসদের ভার রইল।" কবির উদ্দেশ্য বেড়ানো এবং গরমের দিনগুলিতে পাহাড়ে শান্তভাবে থাকা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন, রথী-দ্রনাথ ও তাঁর নব পরিণীতা স্ত্রী, যাঁরা ও আমেরিকা থেকে সদ্য প্রত্যাগত জামাতা নগেন্দ্রনাথ এবং হেমলতা দেবী। রবী-দ্রনাথ ১৩১৭ সালে জ্যৈষ্ঠের দিনকুড়ি তিনধরিয়ায় আশুতোষ চৌধুরীর বাড়ীতে ছিলেন। আশুতোষ চৌধুরী প্রমথ চৌধুরীর বড়দা। রবী-দ্রনাথের সেজদা হেমেন্দ্রনাথের কন্যা প্রতিভা দেবীর সঙ্গে এঁর বিবাহ হয়। বাল্মীকি প্রতিভায় সরস্বতী সেজেছিলেন প্রতিভা দেবী। আশুতোষ চৌধুরী ব্যারিস্টার ছিলেন। পরে Calcutta High Court -এর জজ হন। এঁর আর এক ভাই কুমুদনাথ চৌধুরী ব্যারিস্টার এবং শিকারী ছিলেন। রবী-দ্রনাথ গল্প-দশক (পরবর্তীকালে গল্পগুচ্ছর অন্তর্ভুক্ত) উৎসর্গ করেছিলেন এই জায়ায়, পর স্নেহাস্পদ শ্রীমান আশুতোষ চৌধুরীর করকমলে।

তিনধরিয়া ক্ষুদ্র পাহাড়ী শহর। শিলিগুড়ি থেকে ৩১ কিলোমিটার দূরে হিলকার্ট রোডের উপর টয়ট্রেনের জিগ জাগ (Z) বি-দুটির উচ্চতা প্রায় তিন হাজার ফুট। সেখান থেকে প্রায় তিন শ' ফুট উপরে শান্তা ভবন কবিগুরুর স্মৃতি বহন করছে। চৌধুরী পরিবার থেকে তৎকালীন তিনধরিয়ায় লোকো সুপার কারবি সাহেব এই বাংলো বাড়ীটি কিনে নেন। তিনি পরবর্তীকালে শান্তাবীর নামার নিকট বিক্রয় করেন। বর্তমান শান্তাভবন অনেক সংস্কারের মধ্য দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বছরের অধিকাংশ সময় বাড়ীটির দরজা জানালা বন্ধ থাকে। একজন দারোয়ান বাড়ীটি দেখা-শোনা করে। বাড়ীটি অতীব সুন্দর। অনেক রহস্য যেন এখানে লুকিয়ে আছে। সেলিম হিলস চা বাগানের চালু উপত্যকা সংলগ্ন এই বাংলো বাড়ীটি। এই বাড়ীটির এক পাশে যোগমায়া চা বাগান, অন্যপাশে নেজিপুর এবং সবচেয়ে নীচে সিবোটের চা বাগান সামনের দিকে তাকালে চোখে পড়বে নীচের বিস্তীর্ণ সবুজ সমতলভূমি, পাহাড়ের তলদেশে গাঢ় অন্ধকারময় বিস্তৃত বনভূমি। দূরে নিস্তা পাহাড়, পাগলা ঝোরা এবং পাগলা ঝোরার পাশের পাহাড়ের শিছনে মংপু। ১৮৯০ সালে পাগলা ঝোরায় এক মজার ঘটনা ঘটেছিল। ৮০০ ফুট রাস্তা ভাসিয়ে দিয়েছিল। এমন কি রেলপথ ঐ বিপর্যয়ের করলে পড়েছিল। দশ বারোটি ছোট ছোট প্রবাহে এই পাগলা ঝোরাকে ভাগ করার চিন্তা করা হয়েছিল। কিন্তু সে কথা থাক —পাগলা ঝোরার

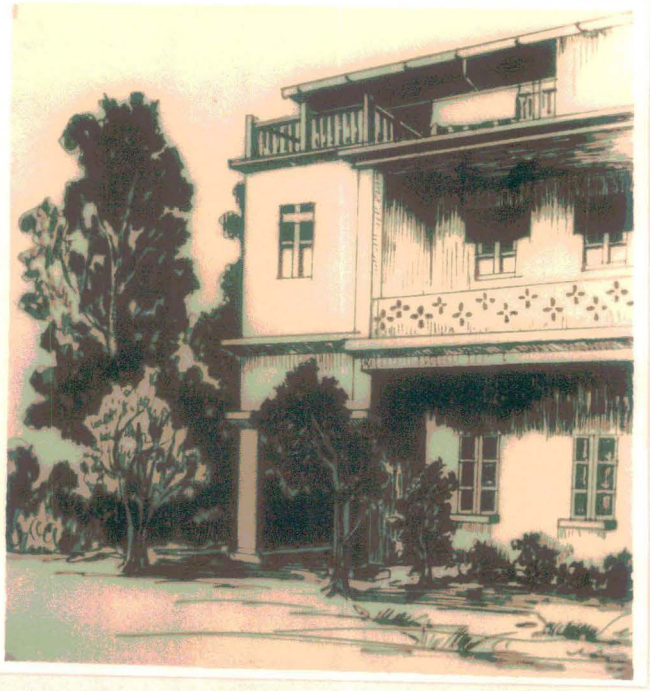

শান্তাভবন

আলাদা আকর্ষণ আমরা অনুভব করি। কবিগুরু ১৩১৭ সালে যখন তিনধরিয়ায় এলেন, তখন তিনি পাগলা ঝোরার মাদকতা উপলব্ধি করেছেন। তিনধরিয়া অবস্থানকালে তিনি পাগলা ঝোরার এই রূপকে নিশ্চয়ই অবলোকন করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে আর এক কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'পাগলা ঝোরা'র কথা মনে করতে পারি।

'তোমরা কি কেউ শুনবে না গো পাগলা ঝোরার
দুঃখ কথা ?
পাগল বলে কর্বে হেলা ? কর্বে হেলা মর্ম
ব্যথা ?
জন্ম আমার হিম ঔরসে, কূলে
আমার তুল্য নাই,
সিন্ধু নদের সোদর আমি গঙ্গা দিদির
পাগল ভাই।
... ...
লাফিয়ে প'ড়ে ধাপে ধাপে, ঝাপিয়ে প'ড়ে উঁচ হ'তে
চড় চড়িয়ে পাহাড় ফেড়ে নৃত্য ক'রে মত্ত-স্রোতে,''

যে দিকে তাকানো যায়, সেই দিকে অসংখ্য বনফুল, শাল সেগুন আর শিশু। তিনটি ধারা, শিও খোলা, ধোপী খোলা এবং পাগলা ঝোরা–মিলে মিশে তিনধরিয়া। হিলকার্ট রোড সাপের মত এগিয়ে চলেছে, তার পাশাপাশি টয় ট্রেনের রেল লাইন। পাহাড়ের ঢালে ঢালে সবুজ চা পাতার সমারোহ, অসংখ্য ঝর্ণা সব মিলিয়ে এক অপরূপ প্রাকৃতিক মাধুর্য কবির চোখে ফুটে উঠেছিল। তার চায় বড় কথা, কবির এই নিজস্ব নির্জন সময়ের ব্যবধানে তাঁর চিন্তার সূত্রো বহুদূর বিস্তৃত ছিল। ফলস্বরূপ উল্লেখ্য গীতাঞ্জলির কবিতাবলী। গীতাঞ্জলির ১৫৭টি গানের মধ্যে প্রথম চৌদ্দটি ১৩১৩ থেকে ১৩১৫ সালের মধ্যে রচিত। অবশিষ্ট ১৪৩টি ১৩১৬ সালের আষাঢ় থেকে ১৩১৭ সালের শ্রাবণ মাসের মধ্যে রচিত। গীতাঞ্জলির ৬৩ সংখ্যক থেকে ৭৪ সংখ্যক, ১৩১৭ সালে ৭ জ্যৈষ্ঠ থেকে ২১ জ্যৈষ্ঠের মধ্যে নিম্নলিখিত ছ'টি গান ও ছটি কবিতা রচিত।

৭ জ্যৈষ্ঠ মেনেছি, হার মেনেছি (৬৩। গান নহে)

৮ জ্যৈষ্ঠ একটি একটি করে তোমার (৬৪। গান নহে)

১ জ্যৈষ্ঠ কবে আমি বাহির হলেম (৬৫ । গীতবিতান ১৮) পূজা

১০ " তোমার প্রেম যে বইতে পারি পূজা (৬৬ । গান নহে)

১৭ " সুন্দর, তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে (৬৭ । গান নহে)

১৭ " আমার খেলা ছিল তোমার সনে (৬৮ । গীতবিতান ২৩)

১৮ " ঐ যে তরী দিল খুলে (৬৯ । গীতবিতান ১৮৮। ১৩৮) পূজা বিবিধ পরিশোধ

১৮ " চিত্ত আমার হারাল আজ (৭০ । গীতবিতান ৪৬৫) প্রকৃতি

১৮ " ওগো মৌন, না যদি কও (৭১ । গান নহে)

২১ " যত্তবার আলো জ্বালাতে চাই (৭২ । গীতবিতান ৭৫) পূজা বিরহ

২১ " সবা হতে রাখব তোমায় (৭৩ । গান নহে)

২১ " বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি (৭৪ । গীতবিতান ২৮) পূজা

কবিতা ও গান ছাড়াও তিনি চিঠি লিখছেন । গৌরাঙ্গ গোপাল ঘোষকে লেখা একটি চিঠি [২৫] উল্লেখ করা যায় ।

A. Chowdhury's House
Tindharia
Darjeeling

কল্যাণীয়েষু,

আমরা সম্প্রতি টিনধরিয়ায় আসিয়াছি । ইহা দার্জিলিঙের নীচেকার একটি পাহাড় তিন হাজার ফিট উচ্চ । এখানে গ্রীষ্ম নাই, শীত ও অতি অল্প । দার্জিলিঙের ন্যায় জনতা নাই বলিয়াই এখানে আশ্রয় লইয়াছি । শরীর কয়দিন অসুস্থ ছিল বলিয়া বেড়াতে যাইতে পারি নাই –সমস্ত দিন খোলা বারান্দায় বসিয়া পাহাড়ের ঘন শ্যামল অরণ্যের উপর মেঘ বৃষ্টি ও রৌদ্রের লীলা দেখিতেছি ।

আশ্রম হইতে তোমরা যে রিক্ত হস্তে ফিরিয়া আস নাই একথা শুনিলে আমার অত্যন্ত আনন্দ হয়। সেখান হইতে যে দীক্ষা তোমরা জীবনের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছ তাহা যেন প্রতিদিনই তোমাদিগকে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর করিতে থাকে । তোমরা সংসারের সমস্ত প্রলোভনের উপর জয়ী হও, সুখে দুঃখে অবিচলিত থাক, তোমাদের বাক্যে, মনে চিন্তায় কোনোদিন যেন লেশমাত্র নীচতা আসিতে না পারে, ঘরে বাহিরে

যেখানেই তোমরা সেখানেই তোমাদের অবস্থিতি যেন চারিদিকের কল্যাণের কারণ হয়—তোমাদের মধ্যে সর্বদাই যেন এমন একটি সতেজ সরলতা থাকে যাহাতে তোমাদিগকে দেখিয়া সকলে দুর্বলতা পরিহার করিতে শিখা করে। তোমাদের অবস্থা যেমনি হোক্, ঘটনা যেমনি ঘটুক, অপরাজিত চিত্তে জীবন যাত্রার পথ চলিয়া যাইবে। সকল দিকেই তোমাদিগকে একান্তভাবে সত্য হইয়া উঠিতে হইবে। মানুষের প্রত্যেকেরই নিজের মধ্যে একটি বিশেষত্ব আছে, সেইখানেই তাহার প্রতিষ্ঠা—অন্যের অনুকরণমাত্র করিয়া কেহ কোনদিন সার্থকতা লাভ করিতে পারে না। নিজের ভিতরকার সেই বিশেষ শক্তিকে জাগ্রত করিয়া যদি তোলো, তবেই নিজের সম্বন্ধে সত্য হইতে পারিবে — তবেই সকল কথা সকল কাজ খাঁটি হইয়া উঠিবে। পৃথিবীতে ক্ষমতা অনুসারে কেহ বা বড় কাজ, কেহ বা ছোট কাজ করে —তাহাতে কিছুই আসে যায় না। সত্যের সহিত, শ্রদ্ধার সহিত, শক্তির সহিত কাজ করিতে পারিলেই প্রত্যেক মানুষ আপনার পূর্ণতম গৌরবকে লাভ করিতে পারে। জীবনের যে ক্ষেত্রে এবং যে কাজেই তুমি থাক, তাহা বড় হউক বা সামান্য হউক — তাহার মধ্যেই যেন তোমার অন্তরের মনুষ্যত্ব সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া প্রকাশ লাভ করিতে পারে। একথা কোনদিন বলিয়ো না, যে আমি যদি এখানে না থাকিয়া অন্য কোথাও থাকিতাম, এ কাজ না করিয়া অন্য কিছু করিতে পারিতাম, তবে ভাল হইতাম, ভাল করিতাম। অন্তরের মধ্যে যদি সত্যকে পাইয়া থাক তবে স্পর্শমণি—পাইয়াছ —তাহার স্পর্শে সকল অবস্থাতেই তোমার সকল কাজই সুন্দর ও মহামূল্য হইয়া উঠিবে। যে কোন কাজই কর না কেন, মনকে সর্বদা ভূমার সহিত যোগযুক্ত করিয়া রাখিবার সাধনা করিবে। চরিত্রের মধ্যে পাপ ও দুর্বলতা আসিলেই ভূমার সহিত যোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, বিষয় তখন মানুষকে চারিদিক হইতে বাঁধিয়া ধরে এবং প্রবৃত্তি তাহাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলে। প্রতিদিন চিত্তকে নির্মল করিয়া ব্রহ্মের সহিত নিজের অন্তরাত্মার অনন্তকালীন যোগ উপলব্ধি করিয়া নিজের সমস্ত ক্ষুদ্রতাকে বিসর্জন দিবে। যখন দেখিবে কোন বিশেষ প্রবৃত্তির আকর্ষণে বা কাজের উত্তেজনায় বা লোকসঙ্গের উন্মত্ততায় অন্তরের মধ্যে অনন্তের আবির্ভাব ম্লান হইয়া আসিতেছে, ঈশ্বরের উপাসনায় মন দিতে পারিতেছ না তখনই প্রাণপণ শক্তিতে সাবধান হইবে —একান্ত চেষ্টায় অন্তরের সমস্ত বাধাকে দূর করিয়া দিবে —যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার পূজা সহজ হইয়া না আসিবে ততক্ষণ কোনমতেই ছাড়িবে না। ইহা ছাড়া তোমাকে আমার আর উপদেশ দিবার কিছুই নাই—যখনি জিজ্ঞাসা করিবে, তখনি বারবার এই একই কথা বলিতে হইবে। জীবনকে

সত্য কর, মহৎ কর, পবিত্র কর, এবং ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত কর—এই তোমার প্রতি আমার একমাত্র আশীর্বাদ। ইতি ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩

শুভানুধ্যায়ী

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই চিঠিটি পাহাড়ের পরিবেশ বোঝানোর পক্ষে যথেষ্ট নয়, তিনি যে নির্জনতা চাইছেন, তা পরিষ্কার ভাবে লক্ষ্য করা গেল। প্রকৃতি প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে স্নেহ ভাজনকে উপদেশ দেওয়ার মুহূর্তে পরমপিতার কথা স্মরণ করছেন। পুরো চিঠিটা একটি অসাধারণ রূপ নিয়েছে যেন কবিতার গূঢ় ভাবদ্যোতনা বিশেষ করে গীতাঞ্জলির মূলকথা সুরে ধ্বনিত হয়েছে।

এই চিঠি ছাড়া কবি আরো কয়েকটি চিঠি লিখছেন তিনধরিয়া থেকে। ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ সালে, তিনি অজিত কুমার চক্রবর্তীকে চিঠি লিখছেন। বিষয় রোগ যন্ত্রণা। এই তারিখে আর একটি চিঠি তিনি লিখছেন, জগদিন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে। বিষয় —বিদ্যালয়ের কথা। চিঠি প্রসঙ্গে আর একটি চিঠির কথা স্মরণ করা যেতে পারে। জোড়াসাঁকো থেকে তিনি ক্ষিতিমোহন সেনকে চিঠি লিখিছেন ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ তারিখে। এই চিঠিতে তিনধরিয়ায় তাঁকে আসার জন্য অনুরোধ করছেন। এখানে আসার কারণ চিঠিতে উল্লেখিত আছে। চিঠিটা তুলে ধরি :

জোড়াসাঁকো

সবিনয় নমস্কার নিবেদন—

পুরীতে যাবার কথা হয়েছিল বটে কি-ন্তু বৌমার ইচ্ছা হল পার্ব্বতীর পিতৃগৃহ দেখবার জন্য তাই আজ বিকালের মেলে তিনধরিয়ায় রওনা হচ্ছি —দেখা যাক নগাধি-রাজ কি রকম আতিথ্য করেন। আমি আশা করেছিলুম আপনি বিশুদ্ধ সংবাদদাতার কাছ থেকেই শুভ পরিণয়ের সন্দেশ দুই অর্থেই লাভ করেন—কি-ন্তু দেখছি তিনি ইতরজনের প্রতি মন দেবার অবস্থায় নেই। বেশি কিছু বর্ণনা করবার নেই — সেদিন যথা সময়ে শুভ কর্ম্ম লঙ্কাকা-ড পর্য্য-ত শেষ হয়েছে কেবল উত্তরকা-ড বাকি আছে—অর্থাৎ রেজিষ্ট্রেশন সমাধা হলেই ফুল মিলনের সাধনা সম্পূর্ণ হবে। পুরীতে যদি ভাল থাকেন ত ভাল। নইলে আপনিও গিরিরাজের আশ্রয় গ্রহণ করতে আসুন না।

কলিকাতায় এসে আমার শরীর কিছু দুখ দিয়েছে —আশা করচি এখান থেকে সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার অবসান হবে । কবীরকে আমার নমস্কার জানাবেন ।

ইতি ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

(১৯১০)

আপনার

শ্রী রবী-দ্রনাথ ঠাকুর

পাহাড়ের ঠিকানা

Mr. A. Chowdhury's House

Tindaria (Darjeeling)

স্বল্পকালীন অবস্থান তিনধরিয়ায় রবী-দ্রনাথের হয়েছিল ; কি-তু তাঁর চেতনার বিশেষ ফসলকে নৈঃশব্দের পরিবেশ আপ্লুত করেছিল , নিঃসন্দেহে বলা যায় । কবিতা-বলীর পারস্পরিক ভাব-সমন্বয় লক্ষণীয় ।

রবী-দ্রনাথের বয়স তখন ৩৯ বছর , তিনি প্রাচীন ভারতবর্ষ এবং উপনিষদের সাধনার ক্ষেত্রে বিচরণ করছিলেন । বিচরণ করবার প্রাক্কালে তিনি প্রকৃত পাঠ নিয়েছিলেন ঋষি দেবে-দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট । পূজনীয় পিতৃদেব তাঁকে উপনিষদের দীক্ষা দিয়েছিলেন । ব্রাহ্ম সমাজের সুকীয়তা উপলব্ধির পথের আলোও দেখিয়েছিলেন । তাঁর ব্রহ্মবোধের—ব্রহ্মজ্ঞানের বিশিষ্টতা নৈবেদ্যের অনুবাদ কবিতাবলীতে বিধৃত । ব্রহ্মজ্ঞানের ব্রহ্মচি-তার বহির্জগান কেতাবী ধারণা (Theoritical Expression) নৈবেদ্য কাব্যে দেখা যাচ্ছে । ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস , আশা এবং মঙ্গল চি-তা তাঁর মনের মধ্যে দোল খাচ্ছে । এখানে কবির ভক্তি-রস পিপাসার দৃষ্টা-ত ধরা পড়েছে । রবী-দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন , 'রবী-দ্রনাথের ঈশ্বর বোধের প্রেরণা হইতেছে ব্রহ্মধর্ম—গ্রন্থোধৃত উপনিষদ । ''পরমকরুণাময়ের মঙ্গল চি-তাকে বিশ্বকবি আশ্রয় করেছেন । সর্বকালে সর্বমানব জীবনের ক্ষেত্রে তা তিনি পৌঁছে দিতে আগ্রহী । অ-তরতম অনুভূতি ভাগ্য বিধাতার উপর ছেড়ে দিতে চান ।

ক্ষণিকা , নৈবেদ্য কাব্যদুয়ের ফলশ্রুতি গীতাঞ্জলি । নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থে রবী-দ্র-নাথের মু-সীয়ানা রয়েছে সত্য , কি-তু গীতাঞ্জলিতে এসে কবির পরিপক্কতা ধরা পড়েছে । এখানে কবির আত্মমগ্নতা এসেছে । গীতিধর্মী কবিতা সহজ সরল ভঙ্গীতে সু-দরতম পথ নির্দেশ করেছে ঈশ্বর ভাবনায় । জীবনের সম্পূর্ণতা পাওয়ার একা-ত আকুতি । প্রকৃতির লীলা অপরূপ চেতনায় তার স্বভাবকে নিজস্বতায় নিয়ে গেছে । প্রসঙ্গত ওয়ার্ডস-

ওয়রথের সঙ্গে রবী-দ্রনাথের নিসর্গ চেতনার ক্ষেত্রে অনেক মিল দেখা যাবে । ওয়র্ডস ওয়রথ এর Tintern Abbey এবং Prelude বিখ্যাত কবিতা । একদা ইংল্যাণ্ডের পশ্চিমে তিনি William Calvert- এর সঙ্গে ভ্রমণকালে প্রথমে Tintern Abbey এবং Wye উপত্যকা দেখেন । তাঁর প্রকৃতি প্রেরণা এবং প্রকৃতি দর্শনের সূত্রপাত এখানেই । তিনি পাহাড়ে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেছেন । উপত্যকা, পর্বত, বন জঙ্গল, নদী, সমুদ্র, আকাশ, ঝরণা প্রভৃতি সৌন্দর্য অবলোকন করেছেন । বিশ্বমন এবং প্রকৃতির ক্রিয়াকলাপের মধ্যে তাঁর কবিতার বিষয় । তিনি প্রকৃতি প্রেমিক । তিনি নিসর্গের মধ্যে পবিত্রতা উপলব্ধি করেছেন । তিনি জানতে পেরেছেন জাগতিক ঘাতপ্রতিঘাত দুঃখ বেদনার চরম আশ্রয়স্থল হল প্রকৃতি । আর তিনি প্রকৃতিকে দেখছেন মানবের নীতি শিক্ষক হিসাবে । তিনি মনে করেন, প্রত্যেকটি মানুষ প্রকৃতির কোলে জন্ম নেয় । যারা সেখানে ক্রমবর্ধিষ্ণু জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যায়, তারা বিশুদ্ধতায় আত্মলীন হয় । আমরা দেখি, গ্রাম বাংলার মধ্যে সহজ জীবনবোধ গড়ে উঠে । শহরের জীবনে সমস্যার ধারা বিচিত্র, ক্রুর তার ধার বেশী । যার ফলে প্রকৃত জীবন প্রকৃত মানুষ থেকে সরে আসে । রবী-দ্রনাথ এবং ওয়ার্ডস ওয়রথ দুই পারের দুই কবি এই ভাবনার মধ্য দিয়ে মানব প্রেমে পৌঁছেছিলেন । গীতাঞ্জলিতে কবির নিজস্ব ভাব পরিমণ্ডল, শব্দচয়ন ছন্দ এবং প্রকৃতি ভাবনার স্বাচ্ছন্দ্য নিয়েছে; কবি এখানে স্থিতধী হয়েছেন । ব্রহ্মবিদ্যার তিনি যেন প্রবক্তা ।

উল্লিখিত ছ'টি কবিতা ও ছ'টি গানের মধ্য দিয়ে গীতাঞ্জলির মূলসুরে প্রবেশ করতে অসুবিধা নেই । গীতাঞ্জলিত কবির পরম রসময়কে পাবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল । তাঁকে লাভ করবার চিত্তের একমুখীনতা, সাবলীল নির্মলতার স্পর্শ এই কাব্যের অনেক কবিতায় বিদ্যমান । এইগুলি তাঁর অধ্যাত্ম সাধনার ফল । সকল অহংকার বিসর্জন দিয়ে, দুঃখ বেদনার অতলতম স্পর্শ দূরে রেখে, কবি আত্মদ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের চেতনায় এগিয়ে যাচ্ছেন । স্বভাবত গীতাঞ্জলির আত্মপ্রকাশের ভাবধারায় জীবনের প্রতি আশা-আকাঙ্ক্ষা -কার্যে, প্রতিমুহূর্তের পরিস্থিতির মধ্যে ভগবানকে নিজস্বভাবে পাবার উৎকণ্ঠা এবং এই অবস্থার চিত্ত শুদ্ধি করণের প্রয়াসই লক্ষ্যের বিষয় ।

সমগ্র গীতাঞ্জলির অংশ বলেই, এই কবিতাগুলি একটা সামগ্রিক ভাবনায় রূপ নিচ্ছে । মূলচেতনার সঙ্গে এদের সম্পর্ক গভীর, তা সততই স্বীকার্য । যে অতি

সূক্ষ্ম ও চঞ্চল ভাবকথা ছন্দের সাহায্যে ব্যক্ত করা যায় না, সুর মূর্ছনার প্রত্যন্ত জগতে তা ব্যঞ্জনাময়ের হয়ে উঠে। তাই লক্ষ্য করা গেছে, এ যুগের কাব্যে গানই হয়েছে ভাবের শক্তিশালী বাহন। অনেক মরমী কবি গানকেই মন্ত্ররূপে গ্রহণ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ১৯১০ সালে ১ জুন (১৩১৭ জৈঃ ১৮) তিনধরিয়ায় বাংলো বাড়ীতে বসে কবিতা, গান ও চিঠি লিখছেন। আর একটি অতিরিক্ত সংযোজন গীতাঞ্জলির ৭১ সংখ্যক কবিতাটির ইংরেজি অনুবাদ। রবীন্দ্রনাথ একসঙ্গে অনেকগুলি কাজ করতে পারতেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিপরীতধর্মী কাজ বলা যেতে পারে। গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ নিয়ে Song Offerings প্রকাশিত হয়েছিল। গীতাঞ্জলির সমুদয় কবিতা অবশ্য সেখানে স্থান পায়নি এ কথা আমাদের জানা।

Song Offerings কবি স্বদেশ ও বিদেশের অনেক বন্ধুর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। W.B. Yeats তাঁদের মধ্যে স্মর্তব্য। ১৯১২ সালে বিলেত পৌঁছে ইংলণ্ডের বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে প্রভূত প্রশংসা পেলেন, সেই সময় তিনি শুধু খুশী হয়েছিলেন তা নয়, তিনি তর্জমাকার্যে ব্রতী হলেন। শারদোৎসব অনুবাদ করতে দুদিন মাত্র তাঁর সময় লেগেছিল। রাত্রে তিনি অনুবাদ শেষ করেন এবং সন্তোষ চন্দ্র মজুমদারকে লিখছেন: "এ দিকে তর্জমা জমে উঠবে। একবার লজ্জার বাঁধ ভাঙলে তখন ব্যাকরণের রক্তচক্ষুকে আর কে ভয় করে। ছেলেবেলায় যে রকম করে দুই পায়ের চাট সামনের দিকে ছুঁড়তে ছুঁড়তে চলে যেতুম, ঠিক তেমনি ভাবেই ইংরেজি ভাষার মতুণত্ব ছুঁড়তে ছুঁড়তে চলেছি—মোদ্দা, চলা বন্ধ করিনি। আজ এই খানিকক্ষণ হল শারদোৎসব তর্জমা শেষ করে সেরেছি — কাল গুটা আরম্ভ করেছিলুম।"

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, একবার জগদীশচন্দ্র বসু রবীন্দ্রনাথকে অনুবাদে প্ররোচিত করতে চেয়েছিলেন। বিলেতে তিনি রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে নানা গল্পগুজব করতেন। সেইসময় তিনি অনুভব করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি তর্জমা প্রয়োজন। কবিগুরু তাঁর কথা শুনেছিলেন। এমন কি তিনি বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন, অনুবাদ শাখাটিকে। এই শাখাটির নাম দিয়েছিলেন অনুবাদ চর্চা। অনুবাদ চর্চার উৎসাহিত হবার গূঢ় কারণ আরো কিছু ছিল। তিনি লিখছেন:

''ইংরেজি ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার একটা কারবার চলিয়াছে। সেই কারবার সূত্রে বিশ্বের হাটে আমাদের লেনাদেনা ঘটিতেছে। এই লেনাদেনার সবচেয়ে বিঘ্ন ভাষার শব্দের অভাব। .....আজ মূলধন বাড়িয়া উঠিয়াছে—আজ শুধু কেবল আমাদের আমদানি হাট নয় —রফ্‌তানিও সুরু হইল।"[২৬]

W.B.Yeats ১৯১২ সালে সেপ্টেম্বর মাসে ইংরেজি অনূদিত কাব্য পাঠ করে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, " I know no German, yet if a translation of a German poet had moved me, I would go to the British Museum and find books in English that would tell me something of his life, and of the history of his thought. But though these prose translations from Rabindranath Tagore have stirred my blood as nothing has for years, I shall not know anything of his life, and of the movements of thought that have made them possible, if some Indians travellers will not tell me."

ইংরেজি গীতাঞ্জলির গদ্যরূপ প্রসঙ্গে কবিগুরুর একটি চিঠি অধ্যাপক জে.ডি. এন্ডার সনকে লিখিত উল্লেখ করা যায়।

1918 April 14,

I have greatly enjoyed reading two of my Gitanjali poems done into verse by your friend and thank you for sending them to me. It was the want of mastery in your language which originally prevented me from trying English metres in my translation. But now I have grown reconciled to my limitations through which I have come to know the wonderful ~~power~~ of English prose. The clearness, strength and the suggestive music of well-balaced English sentences make it a delightful task for me to mould my Bengali poems into English prose for m..

I think one should frankly give up the attempt at reproducing in a translation the lyrical suggestions of the original verse and substitute in their place. Some new quality inherent in the new vehicle of expression. In English prose there is a magic which seems to transmute my Bengali verses into something which is original again in a different manner. Therefore, it not only satisfies but gives me delight to assist my poems in their English rebirth, though I am far from being confident in success of my task." [২৭]

শৈলে-দ্রনাথ ঘোষকে লিখিত আর একটি চিঠি "গদ্যরীতির প্রবর্তন" সম্পর্কে উদ্ধৃত করা যেতে পারে ।

"গীতাঞ্জলির গানগুলি ইংরেজি গদ্যে অনুবাদ করেছিলেন । এই অনুবাদ কাব্য শ্রেণীতে গণ্য হয়েছে । সেই অবধি আমার মনে এই প্রশ্ন ছিল যে পদ্য ছন্দের সুস্পষ্ট ঝঙ্কার না রেখে ইংরেজিরই মতো বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কি না । মনে আছে সত্যে-দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিলেন, তিনি স্বীকার করেছিলেন । কি-তু চেষ্টা করেন নি । তখন আমি নিজেই পরীক্ষা করেছি, লিপিকার অল্প কয়েকটি লেখায় সেগুলি আছে । ছাপবার সময় বাক্যগুলিকে পদ্যের মতো খণ্ডিত করা হয়নি, বোধ করি ভীরু তাই তার কারণ ।

তারপর আমার অনুরোধক্রমে একবার অবনী-দ্রনাথ এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন । আমার মত এই যে, তাঁর লেখাগুলি কাব্যের সীমার মধ্যে এসেছিল, কেবল ভাষা বাহুল্যের জন্য তাতে পরিমাণ রক্ষা হয়নি । আর একবার আমি সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছি"।

এখন দেখতে হবে ৭১ সংখ্যক কবিতাটির মূল ব্যঞ্জনা থেকে অনূদিত অংশের কোন পার্থক্য আছে কি না ? অন্যভাবে বলা যায়, মূল ব্যঞ্জনা থেকে অনূদিত অংশের ব্যঞ্জনা সরে এসেছে কি না ?

এই কবিতাটির বাংলা ও ইংরেজি দুই অংশে রবীন্দ্রনাথ নিজে । একই ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও একটি বিষয় অনুধাবন সহজেই করা যায় । মূল কবিতা ও তার অনুবাদ কবিতা দুই অংশের পার্থক্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসে যায় । যতই সচেতন ও সংবেদনশীল মন থাকুক না কেন ? ভাষা বৈপরীত্য এর প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় ।

ভাষার মাধ্যমটিতে শব্দই যাদুমন্ত্র । বাংলা শব্দের সঙ্গে ইংরেজি শব্দের বিরোধ তো থাকবেই । সব ভাষার ক্ষেত্রে এক একটি শব্দ এক একটি বিশেষ অর্থ বহন করে । রবীন্দ্রনাথ যদি এই ভাবটি নিয়ে একটি ইংরেজি কবিতা লিখতেন, তহলে এমনকি হত না । দুটি ক্ষেত্রে পার্থক্য লক্ষ্যণীয় : শব্দ ভাষার সাবলীলতা । তিনি যত সহজে গীতাঞ্জলির ৭১ সংখ্যক কবিতাটি রচনা করতে পারলেন, যত সহজে ইংরেজি অনুবাদটি করতে পারেন নি বলে আমাদের ধারণা । এবার দুটি ভাষার মধ্যে তারাক কোথায়, দেখা যাক ।

ওগো মৌন, না যদি কও
নাই কহিলে কথা ।
বক্ষ ভরি বইব আমি
তোমার নীরবতা ।

ইংরেজি অনুবাদ অংশ : If thou speakest not I will fill my heart with thy silence and endure it. এখানে "ওগো মৌন" সম্বোধনটি ইংরেজি অনুবাদ অংশে সরাসরি আসেনি । 'বক্ষ' শব্দের ইংরেজি প্রতি শব্দ heart বলেছেন, এখানেই বিরোধ উভয় ভাষার । আবার

স্তব্ধ হয়ে রইব পড়ে,
রজনী রয় যেমন করে
জ্বালিয়ে তারা নিমেষ হারা
ধৈর্যে অবনতা ।

এখানে ধৈর্যে অবনতাকে কবি head bent low with patience.

বাংলা কবিতা অংশে অব্যয় (ও , এবং) একবারও ব্যবহার করেন নি । অথচ ইংরেজি অংশে and পাঁচবার ব্যবহার করেছেন । তাতে কবিতার সাবলীলতা বা স্বাচ্ছন্দ্য হানি ঘটেছে । তবে একটি কথা অবশ্যই স্বীকার্য , মূল কবিতাটির ভাব অনুবাদ অংশে একটুও ব্যতিক্রম ঘটে নি ।

অনুবাদ অংশে একটি জিনিস আমাদের নজর করা হয়ে গেছে । তিনধরিয়া পাহাড় প্রকৃতির অপরূপ স্পষ্টতা ও প্রভাব ইংরেজি কর্মের মাধ্যমে ধরা পড়েছে । বাংলা অংশে তেমন সাড়া মেলেনি । কবির অবচেতনে তা এসেছে বলা যেতে পারে । সে অংশগুলি তুলে দেওয়া হল । "তোমার বাণী সোনার ধারা পড়ুক আকাশ ফেটে ।" ইংরেজি অংশে " thy voice pour down in golden streams breaking through the sky." কবি সোনার ধারা 'কে golden Stream' এ রূপান্তরিত করেছেন । 'ধারা 'কে নিশ্চিতভাবে 'Stream' বলেছেন । অথচ বাংলা অংশে stream -এর সংযোগ কম বলা যেতে পারে । এখানে স্রোতস্বিনীর রূপ রবী-দ্রনাথ বাংলা অংশে প্রত্যক্ষ দেখতে চান নি । ভাবটি অন্যসূত্রে গাঁথা । স্রোতস্বিনীর চিত্রকল্প তিনধরিয়া বাংলো বাড়ীতে বসে করা কবির পক্ষে খুবই সহজ ছিল । আবার "তোমার তানে ফোটাব ফুল আমার বনলতা ?" এর ইংরেজি অংশে thy melodies will break forth in flowers in all my forest groves" দুটি অংশের মৌল ভাব একটুও বিঘ্নিত হয়নি । ইংরেজি অংশে দীর্ঘতা এসেছে মাত্র । "আমার বনলতা in all my forest groves. বলেছেন । এখানে আমাদের একটি দিক অবশ্যই নজর করার বিষয় । আমার বনলতা– একক অর্থে ব্যবহার না করে এক সার্বভৌম অর্থে ব্যবহার করেছেন । তা বিশাল পাহাড় প্রকৃতির ঐশ্বর্য সুন্দর ভাবে ফুটে ওঠার পক্ষে সহায়ক । এই কবিতাটির ক্ষেত্রে পাহাড় , ঝর্ণা , মেঘ এবং শীতের ইমেজ একটি বিশেষ প্রকৃতির জগতকে দেখানোর পক্ষে যথেষ্ট । একটি কবিতা ও তার অনুবাদ বিচিত্র হয়ে যায় , কখনো কখনো । যদিও একই দিনে (ইং ১৯১০ জুন ১ , বাংলা ১৩১৭ জ্যৈ ১৮) ৭১ সংখ্যক কবিতা ও তার অনুবাদ রচিত । সেই কারণেই আলোচনাটির গুরুত্ব বহন করে ।

রবী-দ্রনাথের বয়স এই সময় ৪১ বছর ২৭ দিন । কবি চেতনার একটা বিশেষরূপ দেখা গেছে । তিনধরিয়ার সমগ্র প্রকৃতি তাঁর চেতনার অন্তর্মূলে প্রবেশ করেছিল ।

স্থানগত প্রভাব কোন লেখককে দূরে ঠেলতে পারে না। রবী-দ্রনাথের ক্ষেত্রে বিশেষ করে কাব্যসৃষ্টিতে রূপরসের বৈচিত্র্য ক্রমাগত অগ্রগমন করেছে; তাঁর কাব্যের ধাতুতে ধাতুতে যে বেশ বদল, তার কারণ তাঁর চাঞ্চল্য এবং বন্ধন বিমুখ মানসিকতা।

করুণাময়ের ভাব পরিমণ্ডল ও অধ্যাত্ম জীবন সম্পর্কে ধ্যান ধারণা বিশেষভাবে পরিলক্ষণের বিষয়। সেই অনন্ত পুরুষ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, প্রকৃতি-মানুষে ক্রমাগত লীলাতত্ত্বের মধ্যে সঞ্চরমান। অনন্তকাল ধরে লোক-লোকান্তর জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে মানুষের সঙ্গে চলেছে এই লীলা। কখনো,

"কত মায়ার বাঁশির সুরে
ডাকছে আমায় পিছে" (৬৩ সংখ্যক)

"এ যন্ত্র যে তোমার যন্ত্র
সেই কথাটাই ভোলো" (৬৩ সংখ্যক)

"উৎসবে তার আসে নাই কেন
বাজে নাই বাঁশি, সাজে নাই গেহ"
(৭২ সংখ্যক)

কবি প্রকৃতির বিচিত্র মূর্তির মধ্য দিয়ে নটরাজের নৃত্যলীলা দেখছেন। এই লীলার স্পর্শ চিরপথিককে অনেকখানি বিমোহিত করেছে।

রবী-দ্রনাথের প্রতিভায় খণ্ড ক্ষুদ্র কবিতা জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতায় সঙ্গতি লাভ করেনি, এমন কথা বলা ঠিক হবে কি? কারণ জীবনকে এমন পূর্ণভাবে দেখবার এমন অখণ্ড ভাবে আত্মসাৎ করবার ক্ষমতা জগতে দুর্লভ। দেবে-দ্রনাথ একদা হিমালয় পরিভ্রমণ করেছিলেন এবং জীবনের গূঢ়তম রূপ উপলব্ধি করেছিলেন। পুত্র রবী-দ্রনাথের ক্ষেত্রে বিশেষ করে নির্জন পাহাড় পরিবেশের মধ্যে তেমনটি লক্ষ্য করা গেছে। প্রসঙ্গত রবী-দ্রনাথ মসুরি ঘুরতে এসে মুগ্ধ হয়ে গেছেন। পাহাড় ঘুরে এসে তিনি বলছেন, 'পথে আমার কোন কষ্ট হয়নি। এমন সুন্দর অরণ্য পথ। তোমাদের এই বনটি কি-তু অপূর্ব লম্বা লম্বা সব গাছ উর্ধ্বমুখে দাঁড়িয়ে আছে, নিচে ঘন ছায়ায় কালো কালো অন্ধকার—একেই তো বলে অরণ্য'।[২৮]

পাহাড় সম্পর্কে তাঁর উচ্ছ্বাস দেখতে পাই। তিনি বলছেন, "কি সুন্দর এই সামনের ঢালু পাহাড়টি, আকাশের কোল থেকে সবুজ মাটির কাছাকাছিই থাকতে চাই।"

'মসুরি পাহাড়ে' শিরোনামে তিনি কবিতাও রচনা করেছিলেন। সহজ সরল

অভিব্যক্তিতে পাহাড়ের প্রতি তাঁর প্রবল আকর্ষণ । তিনি বলছেন :

"ওই ঢালু গিরি মালা রুদ্ধ ও বন্ধ্যা
দিন শেষে ওরি পরে জপ করে সন্ধ্যা
নিচে রেখা দেখা যায় ওই নদী তিস্তার
নিষ্ঠুরের স্বপ্নে ও মধুরের বিস্তার ।"

প্রকৃতি ও মানবের বিচিত্র রূপ-রস জীবনের আভাস ও ক্ষণ স্পর্শের অনুভূতি গীতাঞ্জলির কবিতাবলীর একটি রূপের সংকেত । এই প্রসঙ্গে ছান্দোগ্যোপনিষদ । ৪ অধ্যায় ।[২৯] স্মরণ করা যেতে পারে । সত্যকাম ঋষি গৌতমের নিকট ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে গিয়েছিল ।

ঋষি তাকে দূরে ঠেলে দিয়েছেন , জবালার পুত্র বলে । সত্যকামকে সত্য কথা বলার জন্য লালন করতে হল । তার অত্যুগ্র বাসনাকে গৌতম পরিতৃপ্ত না করলেও প্রকৃতির কাছে সে পেয়েছে ব্রহ্মজ্ঞান । প্রকৃতি তাকে আপন করে নিয়েছে । Nature mystic কবি রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তাই হয়েছে , গীতাঞ্জলিতে তিনি অায়াসেই দীর্ঘ ব্যক্তব্য অন্তরের গভীরতম প্রদেশে সংস্থাপন করলেন । তাঁর হৃদয়ের অতলতম তন্ত্রী থেকে অনুভবের মালা দোল খাচ্ছে । তাঁর কাব্যভাষায় কোন বাধা নেই । এখানেই তাঁর ব্যক্তিত্ব ।

এই স্বল্প পরিসরে রবীন্দ্রনাথের চিত্রকল্পের কয়েকটি নমুনা পাওয়া গেল । প্রভাতে কবি বিছানায় তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবে পড়ে আছেন । তাঁর দেবতা করুণ নয়নে তাঁর গৃহ-বাতায়নের দিকে একবার ক্ষণকালের জন্য তাকিয়ে চলে গেছেন । ঘুম ভাঙার পর কবি তা জানতে পেরে উতলা হয়ে পড়েছেন :

"সুন্দর তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে
অরুণ বরুণ পারিজাত লয়ে হাতে ।"

(৬৭ সংখ্যক)

শীতের আবেশ পাহাড়ের কোলে কবির মধ্যে মুক্ত স্ফূর্তভাবে প্রকাশ পেয়েছে । শীতের প্রলেপ থেকে বেরিয়ে আসতে আলস্য বেড়ে যায় । কবি বললেন :

"কতবার আমি ভেবেছিনু উঠি উঠি
আলস্য ত্যজিয়া পথে বাহিরাই ছুটি ।"

রবীন্দ্রনাথের উপর তিনধরিয়ার প্রভাব পড়েছিল । তাঁর রচনা শুধু ভাবের ক্ষেত্রে তা বহন করেনি , প্রত্যক্ষভাবে নিসর্গ চেতনার স্থানের অনুষঙ্গ দেখা যাচ্ছে । প্রকৃতির অপূর্ব রূপরসের সঙ্গে গভীর জীবনবোধের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে । কবি প্রকৃতির চিত্ররূপ উল্লিখিত রচনায় তুলে ধরেছেন । পাহাড় , আকাশ , অন্ধকার , আঁধার , শশী , মেঘ , বজ্র , লতা , ফুল , কানন ইত্যাদির রূপ কবিতা ও গানের মধ্যে স্থান পেয়েছে । ঝোরার ইতিহাস কবির জানা নেই । কোথায় সে যাবে , তাও তাঁর অপরিজ্ঞাত । জীবনের ধারাগুলি বোধহয় মানুষ ঝোরার মত পথে ফেলে আসে , ফেলে আসে স্মৃতির ডালি । কবি বললেন :

"ঝরনা যেমন বাহিরে যায় ,
জানে না সে কাহারে চায় ,
তেমনি করে ধেয়ে এলেম
জীবনধারা বেয়ে --
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয় ।"

উল্লিখিত চিত্রকল্পের সঙ্গে কবি ৭০ সংখ্যক গানে মেঘের চিত্রকল্প তুলে ধরেছেন । চিত্ত হারানোর কথা মেঘদলের সঙ্গে মিলিয়ে দিলেন । অধ্যাত্ম চেতনার মাধুর্য কবির পরিণত হস্তস্পর্শ ধরা পড়ল । অতি সহজেই শোনা গেল :

"চিত্ত আমার হারান আজ
মেঘের মাঝখানে ,
কোথায় ছুটে চলেছে সে
কোথায় কে জানে ।"

(৭০ সংখ্যক)

কবি ৭ জ্যৈষ্ঠ থেকে ২১ জ্যৈষ্ঠের মধ্যে ছ'টি গান ও ছ'টি কবিতা তিনধরিয়ায় বসে রচনা করেছিলেন । এইগুলি গীতাঞ্জলির অন্তর্ভুক্ত , সে কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে । এই গানগুলির প্রসঙ্গে কিছু বলার আছে । কবিতার পাশাপাশি গান রচনা করলেন কেন ? অথবা দেখা যাচ্ছে , ১৭ জ্যৈষ্ঠ ৬৭ সংখ্যক কবিতা ও ৬৮ সংখ্যক গান , ১৮ জ্যৈষ্ঠ ৬৯ ও ৭০ সংখ্যক দুটি গান এবং ৭১ সংখ্যক কবিতা রচনা করলেন । তাহলে কবিতা ও গানের সম্পর্কের কথায় আসতে হয় । উভয়ের মধ্যে কিছু

মিল ও অমিলের বিষয় নিশ্চয়ই আছে। তাঁর হাতে কবিতার অসামান্য কলম থাকা সত্ত্বেও গান রচনা করেছেন, সুর বেঁধেছেন। সহজেই মনে করে নেওয়া যায়, কবিতায় এমন কিছু বাকি থেকে যাচ্ছিল যার আয়োজন সেখানে যথেষ্ট নয়, সেই আয়োজন বাঁধবার জন্য একটি ক্ষেত্র আছে, তা হচ্ছে গান।

কবিতায় বিশেষ করে ভাবনার গতিশীলতার প্রধান কথা এবং বুদ্ধি যাচাইয়ের একটা ব্যাপার থেকে যায়। এখানে গতিশীলতা এবং বুদ্ধির ব্যাপার যুগ্মভাবে সংস্থাপনে কবির স্বাতন্ত্র্য গড়ে উঠে। চিত্রকল্পের স্থান সেখানে প্রবল। গানের ক্ষেত্রে অন্য রকম। গান হচ্ছে স্থায়ীভাবের। এখানে ততটুকু চিত্রকল্পের প্রয়োজন, যতটুকু সুরের পাখায় ভর করে চলে।

এখন দুটি গানের কথায় আসি। তাদের বিশেষত্ব অস্বীকার করবার উপায় নেই। যেমন :

"ঝরনা যেমন বাহিরে যায়,
জানে না সে কাহারে চায়,
তেমনি করে ধেয়ে এলেম
জীবন ধারা বেয়ে –
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।

(৬৫ সংখ্যক)

এই ক্ষেত্রে ঝরণার যে চিত্রকল্প কবি দেখিয়েছেন, তার মাত্রা সীমিত। অর্থাৎ গানটিকে বাঁধতে যতটুকু সুর, কথা এবং ছবির দরকার ততটুকু তিনি দেখালেন। পুরো গানটির মধ্যে ভাবনার গতিশীলতা ও বুদ্ধির বিষয় নুন্ন। এই প্রসঙ্গে 'মহুয়া' কাব্যে' নির্ঝরিণী কবিতা উল্লেখ করি। যেমন :

"ঝরনা, তোমার স্ফটিক জলের
স্বচ্ছ ধারা,
তাহারি মাঝারে দেখে আপনারে
সূর্য তারা।
তারি এক ধারে আমার ছায়া রে
আনি মাঝে মাঝে, দুলায়ো তাহারে,

তারি সাথে তুমি হাসিয়া মিলায়ো
কলধ্বনি, —
দিয়ো তারে বাণী যে-বাণী তোমার
চির-তনী ।"

এখানে ঝরণার চিত্রকল্প কবি তুলে ধরেছেন । কবিতার সাবলীল ছন্দ শুধু প্রকাশ পায়নি, চলিষ্ণুতা ও বুদ্ধির দৃপ্টান্ত আমরা পেয়ে যাচ্ছি । অবশ্যই আমাদের মনে রাখতে হবে, কবি আষাঢ় মাসে বাঙ্গালোর অবস্থান কালে এই কবিতাটি রচনা করেছিলেন । এখানে স্থানের প্রভাব রচনার মধ্যে পড়েনি । অথচ গীতাঞ্জলির ৬৫ সংখ্যক কবিতায় কবি ঝরণার যে চিত্রকল্প গানে তুলে ধরেছেন, তার প্রাণ চাঞ্চল্য এক ভিন্ন পর্যায়ের । কবির সামনের পাগলা ঝোরা বা অন্যান্য ছোট বড় পাহাড়ী ঝোরাই যেন চিত্ররূপে সঙ্গীতে পর্যবসিত হয়েছে । গানের সহজ কথাগুলি সুরের তানে ও তালে ঝরণার 'প্রতিমা' গড়ে দিয়েছে । কবিতায় হলে হয়ত ঝরণার এমন প্রাণ প্রতিষ্ঠা হত না । কথা যেখানে পৌঁছায় না কথার প্রাণকে সে সেখানে বায় নিয়ে যেতে চায় । প্রকৃতিকে সামনে রেখে গানের মাধ্যমে চিত্রকল্পকে টেনে এনে কবি রসসিদ্ধি ঘটিয়েছেন, যা নাকি বিশ্ব কবির পক্ষেই সম্ভব । স্বভাবতই রবী-দ্রনাথের গানে চিত্রকল্প স্থানের প্রভাবে অনেক সময়ই আমাদের কাছে টানে । আর একটি উদাহরণ গীতাঞ্জলির ৭০ সংখ্যক গানটি । যেমন :

"চিত্ত আমার হারাল আজ
মেঘের মাঝখানে,
কোথায় ছুটে চলেছে সে
কোথায় কে জানে ।
বিজুলি তার বীণার তারে
আঘাত করে বারে বারে
বুকের মাঝে বজ্র বাজে
কী মহাতানে ।"

গানটি তিনধরিয়ায় বসে ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ সালে লেখা । পাহাড় প্রকৃতি কবির মধ্যে কিরূপ ধরা দিয়েছে —তারই অভিব্যক্তি- স্থায়ী ভাব রূপে চিত্রকল্পকে জানিয়ে দিয়েছে ।

গানের কথামালার মধ্যে গতিশীলতা বা বুদ্ধির দৃপ্টা-ত–কোনটির ইঙ্গিত নেই । বরং গানটির মধ্যে হৃদয়ের কথা নিঙড়ানো হয়েছে । হৃদয়ের তলদেশে সুরের মহল্লায় এবং চিত্রকল্পে প্রবেশের এক অপরূপ কবির অভিনিবেশ । পাহাড়ী গ্রাম থেকে মেঘের খেলা দেখা এবং অনুভবের ত-তুজাল বিস্তার রবী-দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব ।

রবী-দ্রনাথের অভিজ্ঞান একাকিত্ব । তাঁর নি:সঙ্গতাকে পাথেয় করতে গান হয়েছে সহায়ক । তাঁর নাটক উপন্যাস গানকে তাদেরই ব্যক্তি-মানসে তুলে দিলেন , যারা অবশ্যই চলিষ্ণু , আর চলিষ্ণু বলেই একা । তাঁর এই একাকিত্বর ছোঁয়া ৬৮ সংখ্যক গানে ধরা পড়েছে । যেমন :

"হঠাৎ খেলার শেষে আজ কী দেখি ছবি ,
স্তব্ধ আকাশ , নীরব শশী রবি ,
তোমার চরণ পানে নয়ন করি নত
ভুবন দাঁড়িয়ে আছে একা-ত ।"

এই প্রসঙ্গে রবী-দ্রনাথের প্রথম জীবনের কথায় বিহারীলাল চক্রবর্তীকে স্মরণ করি । বিহারীলালকে কবি অনেকক্ষেত্রেই স্বীকার করেছেন । বিহারীলালের "সাধের আসন" গীতি কবিতার ক্ষেত্রে নিজের কথা নিজের মনে বলতে আমরা দেখেছি । এই কাব্যে সর্বত্র নি:শব্দে পদচারণার সুর যেন রবী-দ্রনাথের মধ্যে দেখা গেছে । তিনি তিন-ধরিয়ায় পাহাড়ী পরিবেশের নৈ:শব্দের মধ্যে আত্মনিয়োগ করেছেন । তাঁর ক-ঠ থেকে সুর নি:সৃত হয়েছে । অধিকাংশ ক্ষেত্রে আগে কথা , পরে সুর । কি-তু তাঁর ক্ষেত্রে মনে হয়েছে , আগে সুর , পরে কথা । অথবা সুর এবং কথায় অনুভূতির সাবলীল প্রযত্ন । পাহাড়ের নির্জনে এমন কথা বলা , তাঁর পক্ষেই সম্ভব ।

কালিম্পঙ :

রবী-দ্রনাথের পাহাড়ের আকর্ষণ অনেক আগেই লক্ষ্য করা গেছে । কালিম্পঙ দর্শন এবং অবস্থান তার অনুসারী । তাঁর জীবনের শেষপ্রান্তে কালিম্পঙ অধ্যায় অনেক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ । কবির এই পাহাড়ে আসার কারণ প্রধানত নিভৃতে থাকা এবং স্বাস্থ্যোদ্ধার । আরো কারণ হিসাবে প্রমথ চৌধুরীকে লেখা একটি চিঠি উল্লেখ করি : "আমার বিষয় ভোগের বয়স গেছে, যখন ছিল তখনও ভোগ করিনি । এখনও আমিরী সখ আমার একটিও নেই । সুন্দর জায়গায় নদীর ধারে পাহাড়ের গায়ে বনচ্ছায়াতলে একটি অতি মনোহর কুটীর বানিয়ে একটি আরাম কেদারা এবং তিন আলমারি বই নিয়ে নিভৃতে জীবনের বাকি কটা দিন কাটিয়ে দেব এই রকমের একটা সখ অনেকদিন থেকে মনের মধ্যে সময়ে অসময়ে গুঞ্জন করে বেড়ায় বটে কি-তু বুঝে নিয়েচি যে আমার কপালে নেই ।"

কালিম্পঙ বাংলাদেশের এবং বর্তমান পশ্চিম বাংলার উত্তর সীমান্তে ছোট পাহাড়ী শহর । এখানে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলত না । সে দিন শিলিগুড়ি থেকে কালিম্পঙ যাতায়াত খুব সহজ ছিল না । শিলিগুড়ি থেকে ৫০ মাইলের পথ । তিস্তার পাশ দিয়ে রাস্তা, দুই পাহাড়ের মাঝখানে তিস্তা, জঙ্গল ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাওয়া – সে এক অপূর্ব ভয়চকিত আনন্দ । রঙ্গিত ও তিস্তার মিলন আর হিমালয়ের দীর্ঘ বিস্তার । কবিকে এই পরিবেশ খুব কাছে টেনেছিল, সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই । নির্জন প্রিয় কবি কালিম্পঙ প্রথমবার এলেন ১৯৩৮ সালে ২৫ এপ্রিল । কবির তখন বয়স আটাত্তর বৎসর ।

বৈশাখের দাবাদহ থেকে মুক্তির আনন্দে কবি পাহাড়ী শহর কালিম্পঙে এলেন । আসার আগে তিনি চিঠি লিখছেন, "মীরু তুই এ-সময় সমুদ্রতীর ছেড়ে আসিস যে । আমরা দু-চারদিনের মধ্যেই কালিম্পঙ যাচ্ছি । শুনেছি জায়গাটি ভালো, বাড়িটি খুবই ভালো ।" তিনি যেখানেই থেকেছেন, থাকবার স্থানটি সব সময় মনোরম ।

রবী-দ্রনাথের কালিম্পঙ আগমনের খবর ছড়িয়ে পড়ল । রথী-দ্রনাথ আর প্রতিমা দেবী তাঁর আগমন সূত্রে সমস্ত আয়োজন পূর্ণ করতে ব্যস্ত । স্থানীয় অধিবাসীরা গুরুদেবকে কি ভাবে অভ্যর্থনা করবেন, তাই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন । তাঁদের হাতে রাতটুকু সময় । আগামীকাল দুপুরে কবি এসে পৌঁছবেন । তাঁরা ঠিক করলেন, একটা

তোরণ তৈরী করবেন । পরদিন প্রত্যূষে উৎসাহী দল , পাইন আর ওকের পাতায় , পাহাড়ী ফুল সহযোগে তোরণটি তৈরী করলেন । তোরণটি করা হল শহরের ঢোকার মুখে থানার সামনে ।

এই দিনটি , অর্থাৎ ২৬ এপ্রিল কালিম্পঙের ইতিহাস স্মরণীয় দিন । কবিকে নিয়ে গাড়ী যখন কালিম্পঙ পৌঁছল , তখন বেলা এগারোটা কি সাড়ে এগারোটা হবে । তোরণের কাছে এসে গাড়ী থামল । কবিকে সকলের পক্ষ থেকে মালা পরিয়ে দেওয়া হল । কবি এবং তাঁর সহযাত্রীরা এই বিষয়ে আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না ।

পাহাড়ে অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার পরিমাপে অনাড়ম্বর অভ্যর্থনা । কবি গৌরীপুর - ভবনে গিয়ে উঠলেন । গৌরীপুর ভবনটি ছিল মৈমনসিংহের গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর । তিনি তখন জীবিত । তিনি বাড়ীটি গুরু দেবের জন্য ছেড়ে দেন । বাড়ীটি অনেকখানি জায়গা নিয়ে , পাহাড় কেটে কেটে কখনো বড় বড় পাথর সাজিয়ে ধাপ বানানো , আবার নীচের দিকে চৌষট্টি সিঁড়ি ভেঙে প্রশস্ত জায়গা । বাড়ীটি সুন্দর ঘরে ঘরে প্রচুর আলো , দরজা জানালাগুলি বড় মাপের । বাড়ীটিতে জমিদার বাড়ীর পুরো আদব কায়দা । চারদিকে বড় বড় গাছ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে । বারান্দা থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা , নাথুলা পাহাড় চোখে পড়ে । ব্রজেন্দ্র কিশোর বাগানের মালি ও একান্ত চাকর বিষ্ণুলাল শর্মাকে রবীন্দ্রনাথের দৈনন্দিন কাজে ছেড়ে দিয়েছেন । প্রকৃতির নিরলস হাতছানি , শান্ত পরিবেশ কবিকে মোহিত করল ।[৩০]

কবি এর আগেও দার্জিলিঙ , তিনধরিয়া , শিলঙ , রামগড় , আলমোড়া প্রভৃতি স্থানে থেকেছেন । দার্জিলিঙ শহরের ব্যস্ততা , লোকদের ফ্যাশান , চলাফেরা তাঁকে মুগ্ধ করেনি । শিলঙে অফিস কাছারী , সমতল শহরের মত ব্যস্ততা—জীবনের মনোহরতা নেই । কবি কালিম্পঙে এসে অবসর জীবন যাপনের কথা ভাবতে পারছেন । তিনি আরো জানতে পারছেন , কালিম্পঙ অন্তত আলমোড়া নয় । আলমোড়ার শুকনো আবহাওয়া কবিকে আকৃষ্ট করেনি । সেদিক থেকে বিচার করলে কালিম্পঙ অনেক ভাল । নির্জন শান্ত পরিবেশে গ্রীষ্মাবকাশে বিশ্রাম যাপন তাঁর লক্ষ্য । কবির সর্বদা ভয় অবকাশ খোঁজা মানেই কাজের চাপ আসা । যখন কবি খোলা বারান্দায় বসেন , ধ্যানমগ্ন হিমালয় , অকৃপণ তন্দ্রা , কর্মহীনতার তাৎপর্য কবি দেখতে পান । তাঁর ভালো লাগছে এই ভেবে যে , এবার পঁচিশে বৈশাখ খুব শান্তভাবে কেটে যাবে ।

১৫২ক

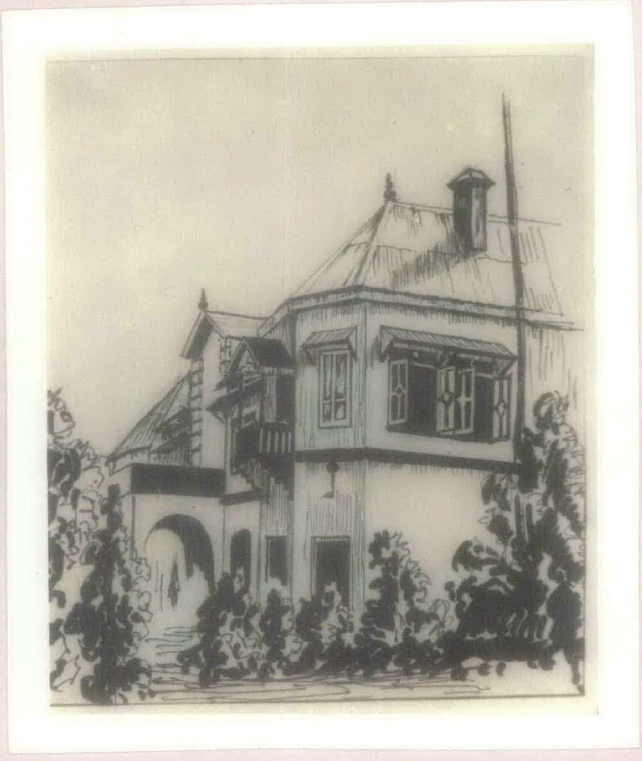

গৌরীপুর ভবন

এরই মধ্যে রথী-দ্রনাথ ও অন্যান্যরা স্থানীয় দেশী-বিদেশী কতিপয় ব্যক্তি-কে তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করেছেন। চা পানের সভা। মিষ্টান্ন ভোজের আয়োজন হয়েছিল। ঘরটি ফুলে ফুলে ভরে গিয়েছিল। বিদেশীরা কবির নিকট থেকে ইংরেজি কবিতা শুনে গিয়েছিলেন। বাড়াবাড়ি ছিল না। আন্তরিকতার ছোঁয়া সর্বত্র ছিল। এই শহরে ছোট খাট অনুষ্ঠানে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। র‍্যামসে স্কুলে একটি লিখিত ভাষণও পাঠ করেছিলেন। কবির বিরাট ব্যক্তিত্ব কোথাও চুপচাপ থাকতে দেয়নি। তাঁকে ঘিরে নানা অনুষ্ঠান। সেকারণ তিনি মনে মনে সংকুচিত এবং লজ্জিত।

কালিম্পঙের লোকেরা সরল এবং হৃদয়বান। কবির শরীর সম্পর্কে তাঁরা ওয়াকিবহাল ছিলেন। তিনি যাতে বিরক্ত না হন, সেদিকে তাঁদের লক্ষ্য ছিল। তার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। কবি নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসে শিলিগুড়ি পর্যন্ত আসবেন এবং সেখান থেকে মোটরযোগে কালিম্পঙ আসবেন। তাঁর যে সময়ে কালিম্পঙ আসার কথা, তার অনেক আগেই কবি এসে পড়েন। সেকারণ অনেকেই কবিকে দেখতে পান নি বা ফুল দিয়ে অভিনন্দিত করতে পারেন নি। তাঁরা বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন তবুও কবিকে বিরক্ত করেন নি। কবি যে এদের কথা ভাবেন নি তা নয়। কথাটা পাকাপাকি হয়ে যায় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের উপস্থিতিতে। স্থির হয় যে, অধিবাসীদের মধ্যে প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে মিলিত হবেন। এজন্য একটা দিন স্থির হল এবং সময়। সেদিন ১লা মে। একে একে কালিম্পঙের অধিবাসীবৃন্দ মিলিত হন। প্রায় তিন'শ। সর্ব সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হন। অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশে সংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অধিবাসীরা সংবর্ধনা জানালেন। যুবক পরমহংস মিশ্র বললেন: কবি দর্শনে আজ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী উপগুপ্তের কথা মনে পড়ছে; মহামতি অশোকের অধ্যাত্মবোধ জাগিয়ে ছিলেন যে সন্ন্যাসী বিশ্ব কবির মধ্যে ধরা পড়েছে ভারতভূমির সত্য। কবি তার উত্তর দিলেন: প্রাচীন ভারতবর্ষের কথা তোমরা বলেছ, ভারতবর্ষের মহান ভিক্ষুকের মতো যথার্থ হয়ে ওঠে।

গুরুদেবের কালিম্পঙ আসার দু-তিন দিন পরে ডাঃ গোপাল দাশগুপ্ত সপরিবারে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। ডাঃ দাশগুপ্ত কালিম্পঙে খুব পরিচিত ব্যক্তি। সুধাকান্তবাবু তাঁকে ও তাঁর স্ত্রীকে ভিতরে নিয়ে এলেন। কবি বড় একটা ইজিচেয়ারে বসে আছেন। তাঁরা তাঁর সামনে বসলেন। ঘরটা কাঁচ ঢাকা লম্বা বারান্দার মতো;

শোবার ঘর আর সিঁড়ির মাঝামাঝি বাড়ীর দক্ষিণ দিকের অংশটায়। ডাঃ দাশগুপ্তের সঙ্গে এসেছিল তাঁর দুই ছেলে। বয়স চার আর পাঁচ বছর। কবি তাদের হাটুর উপর তুলে নেন এবং তারা সাদা দাড়ি উপর হাত বোলাতে থাকে। ডাঃ দাশগুপ্ত বিব্রত, কবি কিন্তু খুশী।

বাইরে কতিপয় ব্যক্তি অপেক্ষা করছিলেন। কবির সঙ্গে দেখা করবেন এবং কবির কণ্ঠে কবিতা পাঠ শুনবেন। ডাঃ দাশগুপ্ত স্থানীয় ব্যক্তি ছোট পাহাড়ী শহরে সকলকে চেনেন। তিনি তাঁদের সঙ্গে কবির পরিচয় করিয়ে দিলেন।

কবির পাঠ করা কবিতা সুধাকান্ত বাবু সহজেই হিন্দীতে রূপান্তরিত করে সকলকে শুনিয়ে দেন। কবিতার মূল বিষয় তাঁদের বুঝতে কষ্ট হয়নি। দর্শকদের মধ্যে অধিকাংশ অবাঙালী বলেই হিন্দীতে অনুবাদের দরকার ছিল। বাড়ীতে ঢোকার মুখে লনে বসে সকলের সঙ্গে কবির ফোটো তোলা হয়।

গৌরীপুর ভবনের উত্তর দিকে গাড়ী বারান্দা ছিল। এখান থেকে কালিম্পঙের জনাধার দেখা যায়। পাহাড়ী নাম ডেলো। তারই নীচে বনানীর মাঝে সেন্ট এন্ড্রুস কলোনিয়াল হোমস; ডাঃ গ্রাহামস্ হোমস বলে বিশেষ পরিচিত কালিম্পঙে। ডাঃ জে.এ.গ্রাহাম ১৯০০ সালে St. Andrews Colonial Homes প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ডাঃ গ্রাহাম বৃদ্ধ; কবির সমবয়সী কিন্তু চলাফেরা এবং দৈনন্দিন জীবনে তারুণ্যের স্বাক্ষর বহন করেন। কবি কালিম্পঙ এলে উনি গৌরীপুর এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। ঘোড়ায় চড়ে পাঁচ মাইলের মত পথ আসেন এবং ফিরে যান ঘোড়ায় চড়ে। তিনি এই অঞ্চলে মুক্তি-তীর্থ। তিনি এখানকার দুর্গত পাহাড়ী জনজীবন দরিদ্র, বঞ্চিতদের এবং ইঙ্গভারতীয়দের মুক্তি-গুরু। তৎকালীন সময়ে প্রায় সাতশ' আবাসিক ছেলেমেয়েকে তিনি শিক্ষার আলো দেখালেন। তাদের শুধু উচ্চ শিক্ষা দিতেন না, তারা যাতে নিজেদের জীবনে দাঁড়াতে পারে এবং মনুষ্যত্বের দাবী করতে পারে—এমনভাবে তৈরী করতেন। তিনি তাদের বিদেশে পাঠাতেন।

কালিম্পঙের ইতিহাসে ডাঃ গ্রাহাম অমর হয়ে থাকবেন। তিনি শুধু এখানকার ছেলেমেয়েদের কথা ভাবতেন না। বিদেশে হোমে ছেলেমেয়েরা কেমন আছে, তাঁর জিজ্ঞাসা ছিল অদম্য।

তিনি কবির কাছে প্রায়ই আসতেন : কানে দুজনেই কম শুনতেন । যন্ত্রের ব্যবহার হত পরস্পরের কথা শোনার সময় । উভয়ের অসুবিধা দূর করতেন অনিলকুমার চন্দ । ডাঃ গ্রাহামের একটা বড় গুণ ছিল , তিনি অকপটে সকলের সঙ্গে মিশতে পারতেন ।

গ্রাহাম সাহেব একদিন কবিকে নিমন্ত্রণ করেন হোমসে । গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কবিকে নেবার জন্য ।হোমসে তাঁর ঘরটি অতি সুন্দর । ভারতীয় curio তে সাজানো । হোমসের পরিবেশ তুলনাহীন । শ্যামল বনানী আবৃত । উভয়ের মধ্যে চিন্তামূলক আলোচনা - আলোচিত হয়েছিল । কবির মনের সৃজনকে পেয়েছিলেন সেদিন । কবিকে যে ঘরটিতে বসানো হয়েছিল , যে ঘরটি দীর্ঘকাল বন্ধ অবস্থায় আছে । কবির প্রতি ডাঃ গ্রাহামের শ্রদ্ধার নিদর্শন । প্রসঙ্গতঃ সেদিন তাঁদের সঙ্গে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন ।

ডাঃ গ্রাহাম ছিলেন গৌরীপুর থেকে পাঁচ মাইল দূরে , কিন্তু হীরেনবাবু ছিলেন কবির প্রতিবেশী । তাঁর আস্তানা মিনিট পনের পথ । হীরেনবাবু প্রায়ই কবির কাছে আসতেন। কবি তাঁর জন্য অপেক্ষা করতেন । হীরেনবাবু কবির পূর্ব পরিচিত । কবি যখন বয়সে নবীন ছিলেন , তখন প্রায়ই সাহিত্যসভায় যেতেন । সভাগুলো গতানুগতিক ছিল । কিন্তু যখনই হীরেনবাবু কোন সভার সভাপতি হতেন , তখন সভা হয়ে উঠত প্রাণবন্ত । কবির সেই সব দিনের কথা মনে পড়ে । ঐ কারণেই হীরেনবাবু কবির এত নিকটের । তাছাড়া কবি তাঁর পান্ডিত্য , বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন । সেই বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধার খাতিরে আজ কবি তাঁকে নির্জন কালিম্পঙ অবস্থানকালে বিশেষভাবে স্মরণ করছেন । তিনি মহাভারত রচনার কাজে তাঁর সাহায্য চান । সর্বকালে সর্বদেশে একটি মাত্র এপিক রচনা হয়েছিল । তার একটা নতুন রূপের দরকার । কবি তিনমাস আগে শান্তিনিকেতনে একাজে হাত দিয়েছিলেন । এখন আবার তিনি তাতে হাত দিলেন । বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বক্তৃতা রচনার উদ্যোগেই হয়ত এই অসুস্থ শরীরেও এই বয়সে তাঁকে এই দুরূহ কাজের ভার স্বীকার করে নেওয়া । টেবিলে কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত থাকত । এর আগে রামায়ণ সম্পর্কে তিনি নতুন কথা বলেছেন ।

কবির বয়স আটাত্তর । তাঁর পঞ্চইন্দ্রিয় যেন আগের মত কাজ করতে চায় না । শ্রবণ ইন্দ্রিয় এবং চক্ষু ইন্দ্রিয় বিশেষ করে কাজ করে না । তাই তিনি শ্রীসুধার চন্দ্র করকে লিখছেন , "চোখের দুর্বলতার জন্য কোমর বেঁধে লিখতে বসতে পারিনে —ছোট

অক্ষরের মহাভারত যেন কাঁকর বিছানো রাস্তা, তার উপর দিয়ে চোখ চালানো আরামের নয়।"

কবি শান্তিনিকেতন থেকে দূরে নির্জন পাহাড়ী শহরে শান্তভাবে থাকতে চাইলেও থাকতে পারেন না। প্রায় প্রতিদিনই চিঠি লেখার কাজ আছে, তাছাড়া শান্তিনিকেতন ছাপাখানা থেকে প্রুফ আসে। এই সময় গীতবিতান ছাপা হচ্ছে। নিজের লেখা নিয়ে তিনি খুব নিষ্ঠাবান। কালিম্পঙের সব কাজের মধ্যে গীতবিতানের দিকেই মনটা বেশী পড়ে থাকে। গীতবিতান নব সৃষ্টি, এবং তার মহিমাই কবিকে শাশ্বত করবে। গানের বই সহজে বহন করার জন্যই ঠাসবুনানী হওয়া দরকার, প্রত্যেক পর্যায়ের গান সুস্পষ্টভাবে সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত হলে পর্যায় ভেদ স্পষ্ট হতে পারবে ইত্যাদি বিস্তৃত নির্দেশনামা কবি পাঠিয়ে দিলেন সুধীরচন্দ্র করকে।[৩১]

এই সময় তাঁর পত্র সংকলনও ছাপা হচ্ছে। জীবনস্মৃতি, আত্মপরিচয়, ছেলেবেলার বাইরে কবির ব্যক্তি—জীবনের অফুরন্ত উপাদান এই অসংখ্য চিঠি। তাঁর এই পত্রমালা বাংলা সাহিত্যকে উন্নত করল নিঃসন্দেহে বলা যায় এবং নবতর সাহিত্য ধারার মুক্তি : পত্র সাহিত্যের।[৩২] পত্রসংকলন সম্পর্কে কালিম্পঙ থেকে লিখলেন : "সাধারণ—সাহিত্যকে টানে বিরাট পাঠক কেন্দ্র, চালায় দূর দেশ দূর কালের পক্ষে ব্যক্তিগত জীবনের সীমানা ছাড়িয়ে। আর চিঠির সাহিত্যে ধরা দেয় লেখকের কাছ ঘেঁষা জগতের দৈনিক ছায়া প্রতিচ্ছায়া, ধ্বনি প্রতিধ্বনি, তার ফলিক হাওয়ার মর্জি আর তার সঙ্গে প্রধানত মিলিয়ে সদ্য প্রত্যক্ষ সংসার পথের চলতি ঘটনা নিয়ে আলাপ প্রতিলাপ। .....আজ কাছে এসেছে আমার সেই ধ্বনিহীনতার বয়েস, স্বেচ্ছারচিত চিঠি লেখার দিন গেছে পেরিয়ে; — আমার যে চিঠিগুলো অনাবশ্যক একদিন ছড়িয়ে পড়েছিল সমুদ্রের ধারে রং বেরঙের ঝিনুক শামুকের মতো, বাইরের পাঠকদের মতোই আমি তাদের কৌতূহলের চোখে দূরের থেকে দেখছি।"

কালিম্পঙে অবস্থান কালে কবি কবিতা লিখেছেন। পাহাড় থেকে ফিরে সেগুলো গ্রন্থাকারে ছাপার আয়োজন করেছিলেন। নতুন একটা কাব্যগ্রন্থ 'সেঁজুতি নাম দিলেন। সুধীরবাবুকে একটি চিঠিতে লিখছেন : "তার নাম দিতে চাই সেঁজুতি—জানি না শব্দটা পূর্বাঞ্চলে চলিত আছে কিনা—কিন্তু সন্ধ্যাবেলার প্রদীপ হিসাবে ওর মানেটা ভালো।" কাব্যগ্রন্থটি ডাক্তার সার নীলরতন সরকার কে উৎসর্গ করছেন কবিতায় এবং উৎসর্গ

করার কারণটি খুব সহজেই অনুধাবন করা যায়।"[৩৩]

সৈজুতি কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা—জন্মদিন। কালিম্পঙ অবস্থানকালের অমর স্মরণ।

আজ পঁচিশে বৈশাখ। কবির বয়স আটাত্তর। নির্জন পাহাড় পরিবেশে তাঁর জন্মদিন পালিত হবে। তিনি জন্মদিনের সমারোহ এড়িয়ে যেতে চান। কালিম্পঙের অধিবাসীরা মহৎ অতিথির কথা ভোলেনি।

মংপু থেকে ডাঃ মনোমোহন সেন, মৈত্রেয়ী দেবী ও চিত্রিতা দেবী এলেন। কলকাতা থেকে এলেন প্রবোধ সান্যাল।

গতকাল রাতে বৃষ্টি হয়েছিল। ঝড়ও প্রচণ্ড ছিল। রাস্তায় কোন কোন জায়গায় টেলিফোনের খুঁটি উপড়ে পড়েছিল। কয়েকদিন আগে এই সব খুঁটি পোতা হয়েছিল ট্রাঙ্ক টেলিফোন যোগাযোগ বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে কালিম্পঙের কলকাতা।[৩৪] কবি আজ টেলিফোন কেন্দ্রের উদ্বোধন করবেন। জন্মদিন কবিতাটি আবৃত্তি করবেন। এই উদ্দেশ্যে অল ইণ্ডিয়া রেডিয়ো কলকাতার শাখার অধ্যক্ষ নিরঞ্জন মজুমদার এখানে এসে পৌঁছেছেন। কবি জন্মদিন কবিতাটি আবৃত্তি করবেন এবং সেটা সরাসরি অল ইণ্ডিয়া রেডিয়ো কলকাতা থেকে প্রচারিত হবে। দেশবাসী তাঁর কণ্ঠ থেকে কবিতা আবৃত্তি শুনবে।

দুপুরে পোস্টাল ডাক এল। তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে কয়েকটি পত্রিকাও এল চিঠির সঙ্গে। এক সময় যথারীতি মৈত্রেয়ী দেবীর ডাক পড়ল। কবি বললেন: "তুমি একটা কবিতা লিখলে না যে?" অর্থাৎ তোমার একটা কবিতা লেখা উচিত ছিল; কেননা, সেটা ভক্তির লক্ষণ। আমার প্রতি যদি তোমার ভক্তির সামান্য লাঘব না হয়ে থাকে, তবে ইতি মধ্যে, তার প্রমাণ-স্বরূপ কোন কবিতা না লিখে থাকো, এখনি কলম নাও, কাগজ নাও এবং লেখো। লেখো: "হে রবীন্দ্র কবীন্দ্র"। এইরূপ হাসি ঠাট্টা কবির প্রায়ই লক্ষ্য করা গেছে।

বিকেলে প্রবোধবাবু এলেন। তিনি আনলেন রজনীগন্ধার ঝাড় আর একটি কলম। কবির নৈবেদ্য।

সন্ধ্যায় মৈত্রেয়ী দেবীরা মংপুতে চলে গেলেন। বিকেলের দিকে কবি অর্ধশয়ান অবস্থায় ঘরের মধ্যে বসেছিলেন। তাঁর মুখের উপর সূর্যের আলো এসে পড়েছে। তাঁর সৌম্য সুন্দর মুখখানি সকলের চোখে পড়ল। ধীরে ধীরে প্রোগ্রামের সময় হয়ে এল।

টেলিফোনকে বার বার পরীক্ষা করা হল । কবি গৌরীপুরের একটা ঘরে বসে আছেন । সব জানালা, দরজা বন্ধ । বাইরে থেকে যেন কোন শব্দ ভিতরে না যায় । বাইরে রেডিয়ো নিয়ে সকলে অপেক্ষা করছে । কবির কণ্ঠ ঘর থেকে সোজা কলকাতা এবং কলকাতা থেকে বাইরে অপেক্ষমান ব্যক্তিরা শুনবে । সকলের কৌতূহল । তখন সাড়ে সাতটা কি আটটা একটা লাল আলো জ্বলে উঠল । কবির কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হল :

আজ মম জন্মদিন । সদ্যই প্রাণের প্রান্ত পথে
ডুব দিয়ে উঠেছে সে বিলুপ্তির অন্ধকার হতে
মরণের ছাড়পত্র নিয়ে ।... ... ...(জন্মদিন
... ...সেঁজুতি)

পনেরো মিনিট শেষ হল । কবির আবৃত্তি শেষ । কালিম্পঙের নির্জনতা ফিরে এল । 'জন্মদিন' কবিতাটি ২৫ বৈশাখ ১৩৪৫, গৌরীপুর ভবনে বসেই লেখা । কবিতাটিতে পাহাড় পরিবেশের চিত্র অনুপস্থিত ।

পরের দিন ছাব্বিশে বৈশাখ, কবি ইন্দিরা দেবীকে একটা চিঠি লেখেন, ঐ চিঠিতে কবিতাটির বিষয়বস্তু অংশত ব্যক্ত করেছেন ।

আর একটি চিঠি নন্দিতা দেবীকে লিখিলেন । তিনি কখনো তাঁকে বুড়ি, কখনো বৃদ্ধা বলে সম্বোধন করছেন । তিনি তাঁর জন্মদিনকে উপলক্ষ করে লিখছেন : "এই উপলক্ষে (জন্মদিন) চকোলেট কিনে খাস দাম পরে দেবো, যদি মনে থাকে । কাল এখানে লোক ছিল অল্প, জমেছিলো বেশি । রেডিয়োতে আমার আবৃত্তি শুনেছিলি তো ?"

কবির জন্মদিন কবিতাটি পরের দিন কলকাতার বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হল । রেডিয়ো থেকে অনুলিখিত এই কবিতার পাঠ কবিতাটির অনেক ক্ষেত্রে ভুল ছিল । কবি স্বভাবতই ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন । তাই তিনি রামানন্দ বাবুকে লিখলেন, প্রবাসীতে কবিতাটি প্রকাশের জন্য ।

রবীন্দ্রনাথ কালিম্পঙে বিশ্রামের জন্য এসেছেন । শারীরিক উন্নতি হয়েছে । অধিকাংশ সময় অর্ধশায়িতভাবে কেটে যায় । বই পড়েন । স্থানীয় লোকজনদের সঙ্গে কখনো কখনো কথাবার্তা হয় । কিন্তু তিনি সব সময় চুপচাপ বসে থাকতে পারেন না । তাই মাঝে মাঝে আবার লেখায় মেতে উঠেন । এখন তিনি লোকশিক্ষার সিরিজের জন্য,

'বাংলা ভাষা পরিচয়', গ্রন্থে হাত দিলেন।

ভাষার রহস্য কবিকে আপ্লুত করেছিল। অতি প্রাচীন ভাষার সঙ্গে বর্তমান ভাষার বন্ধন কতখানি, এই বোধ কবিকে নাড়া দিয়েছিল। তিনি এই কারণেই এই গ্রন্থে হাত দিয়ে ছিলেন। গ্রন্থ ভূমিকায় তিনি লিখছেন, 'ভাষাতত্ত্বে প্রবীণ সুনীতিকুমারের সঙ্গে আমার তফাৎ এই--তিনি ভাষা সম্পর্কে ভূগোল বিজ্ঞানী, আর আমি যেন পায়ে চলা পথের ভ্রমণকারী। .....চলতে চলতে যা আমার চোখে পড়েছে এবং যে ভাবনা উঠছে আমার মনে, সেই খাপছাড়া দৃষ্টির অভিজ্ঞতা নিয়ে যখন যা মনে আসে আমি বকে যাব। তাতে করে মনে তোমরা চলে বেড়াবার স্বাদটা পাবে তারও দাম আছে।"

কিছুদিন আগে কবি একটি সঙ্কলন গ্রন্থমালায় হাত দিয়েছিলেন। গ্রন্থটির নাম, "বাংলা কাব্য পরিচয়"। সঙ্কলনটি লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত এর ফলে স্বাভাবিক ভাবেই আদিরসের কবিতা এখানে বাদ পড়েছে। তিনি খুশী এই কারণে যে, "আদিরসবর্জিত এই কাব্য সংগ্রহে উপভোগ্যতার অত্যন্ত ক্ষতি হয়েছে বলে আমার মনে হয় নি, যদি হোত তবে সেটা কে সাহিত্যের দৈন্যের লক্ষণ বলে মানতে হোত।" এমন কি বাংলা গদ্য কবিতা এই গ্রন্থের স্থান পায়নি। এই গ্রন্থে নবীন কবিরা যেমন জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অন্নদাশঙ্কর রায়, অজিত দত্ত, মনীশ ঘটক, অচিন্ত্য-কুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু প্রভৃতিও স্বীকৃতি পেয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য সাহিত্যের রূপ রসের লক্ষণীয়। এই গ্রন্থ সম্পর্কে সমকালীন কতিপয় কবি বিরূপ সমালোচনা করেন। তাঁদের অভিযোগ ছিল—এই গ্রন্থে প্রতিনিধি স্থানীয় কবিতা স্থান পায়নি। যাঁরা এই গ্রন্থ সম্পর্কে সোচ্চার হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে যতীন্দ্র-মোহন বাগচি, মোহিতলাল মজুমদার, নজরুল প্রভৃতি। মোহিতলাল সবচেয়ে বেশি তিক্ত ভাব পোষণ করেছিলেন। একটি জোরালো প্রবন্ধ লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র-বিন্দু ধরে। রবীন্দ্রনাথ নির্জন কালিম্পঙ থেকে নন্দলাল সেনগুপ্তকে চিঠি লেখেন, "এই প্রবল গ্রীষ্মে অধিকতর উত্তাপ সৃষ্টির প্রয়োজন নেই, বইটি বাজার থেকে প্রত্যাহার কর।" তাঁর কথামত বইটি বাজার থেকে প্রত্যাহার করা হয়।

এই সময়কার আর একটা প্রয়াস উল্লেখযোগ্য। প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশের উদ্যোগে Oxford Book of Bengali Verse প্রকাশের আয়োজন। রবীন্দ্রনাথের

সম্পাদনায় এই গ্রন্থটি প্রকাশ হওয়ার কথা। তাঁর সহযোগী ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ। পরে দায়িত্ব পড়েছিল নন্দ গোপাল সেনগুপ্তের উপর। এই গ্রন্থের পরিকল্পনায় ছিল, টীকা-টিপ্পনী লেখা হবে ইংরেজিতে এবং কবিতাগুলি রোমান লিপিতে থাকবে। ১৯৩০ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ কল্লোল-কালিকলমের কবিরা এই গ্রন্থে স্থান পেলেন। কবি কালিম্পঙ থেকে নন্দগোপাল সেনগুপ্তকে চিঠি লেখেন, "আমাকে এই বইটার কর্তার মঞ্চে খাড়া করা হয়েছে—লজ্জাকর শৈথিল্যের চাপে পাণ্ডুলিপি মৃতবৎ পাণ্ডুবর্ণ হয়ে গেছে—আমার দোষ নেই, আমার সহযোগী দীর্ঘকাল জোয়ালে কাঁধ পাততে গড়িমসি করে এসেছেন—সুধীন্দ্রের সাড়াই পাওয়া যায় না, প্রশান্ত থেকে থেকে হঠাৎ ধড়ফড় করে ওঠেন, তারপরেই নিস্তব্ধ হয়ে তাঁর নামকে সার্থক করেন। তুমি যদি ওর শেষ কৃত্য করে দিতে পারো, তা হলে তিনজন অকৃতী সহযোগীর মানরক্ষা হয়। অক্সফোর্ড ওয়ালারা মাথায় হাত দিয়ে পড়েছে।" নানা কারণে এই বইটি বেরোয় নি।

জন্মদিনের দিন বা তার কিছুদিন আগে 'রবি রশ্মি' প্রথম খণ্ড কবি পেলেন। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কবিতা নিয়ে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচনা করেছেন। দীর্ঘদিন এই গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের পাঠকবর্গকে আপ্লুত করে রেখেছিল। কবি নিজের রচনা সম্পর্কে সচেতন, সেকারণ তাঁর প্রায় প্রতিটির রচনা পাণ্ডুলিপির সংশোধন ও কবিতার পাঠান্তর লক্ষ্য করেছি। বিশেষ করে অপরিণত কালের রচনা সম্পর্কে তাঁর ভীষণ দ্বিধা। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সকল রচনার আলোচনা করেছেন। কালিম্পঙ থেকে কবি তিরিশে বৈশাখ চারুবাবুকে চিঠি লিখিছেন: "স্বয়ং বিধাতা তাঁর সেকালের সৃষ্টিতে লজ্জিত, নইলে আর মানুষ জন্মাত না, সংকোচে তিনি আদি জীব সৃষ্টির চিহ্ন চাপা দিয়েছেন মাটির নীচে। আমার কাব্যেও সেই দশা।"

কবিতার আস্বাদ তার রসানুভূতিতে। কবিতার আলোচনা যে গ্রন্থ করে, সেটা গাইড বুকের কাজ নেবে। পথ দেখায়। এই পথ দেখানো পাঠকের কাছে খুব জরুরি। কবি লিখিলেন: "তুমি আমার প্রত্যেক কবিতাটি নিয়ে ব্যাখ্যা করে চলেছ, তাতে আমি গৌরব বোধ করি।"

কালিম্পঙ অবস্থান কালে রবীন্দ্রনাথ আর একটি গ্রন্থ হাতে পেলেন। বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ড। বিনয়রঞ্জন সেন সেই সময় মেদিনীপুর জেলার ম্যাজিস্ট্রেট।

তাঁর সহযোগিতায় একটি তহবিল গঠিত হয়। তাঁদের প্রচেষ্টা বিদ্যাসাগর রচনাবলী প্রকাশ করা। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় এই সময় বিদ্যাসাগর রচনাবলীর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। বাংলা সাহিত্যের পাঠকের কাছে একটা বিরাট সুখবর। বিদ্যাসাগর বাঙালী জাতির গৌরব। এই গ্রন্থ প্রকাশের মহৎ প্রচেষ্টার কথা কবি বিনয় রঞ্জন সেনকে লিখলেন :

"বিদ্যাসাগরের পুণ্যস্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রকাশিত বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ড পেয়ে বিশেষ আনন্দ লাভ করেছি। তাঁরই বেদীমূলে নিবেদন করবার উপযুক্ত এই অর্ঘ্য রচনা। অকৃত্রিম মনুষ্যত্ব যাঁর চরিত্রে দীপ্তিমান হয়ে দেশকে সমুজ্জ্বল করেছিল, যিনি বিধিদত্ত সম্মান পূর্ণভাবে নিজের অন্তরে লাভ করে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, আমরা সেই ক্ষণজন্মা পুরুষকে শ্রদ্ধা করবার শক্তি-দ্বারাই তাঁর স্বদেশবাসী রূপে তাঁর গৌরবের অংশ পাবার অধিকার প্রমাণ করতে পারি। যদি না পারি তাতে নিজেদের শোচনীয় হীনতারই পরিচয় হবে। এই অগৌরব থেকে বিস্মৃতি পরায়ণ বাঙালীকে রক্ষা করবার জন্যে যাঁরা উদ্যোগী হয়েছেন তাঁদের সকলকে সর্বান্তঃকরণে সাধুবাদ দিই।"

এবার কবির কালিম্পঙ বাস দুই পর্যায়ে মোট বাহান্ন দিন। মাঝে কুড়িদিন কাটলো মংপুতে —মৈত্রেয়ী দেবীর আতিথ্যে।

মংপু থেকে ফিরে এলেন কালিম্পঙে ১ জুন ১৯৩৮।

এখানে এসে তিনি একটা চিঠি পেলেন। লেখিকা অপরাজিতা দেবী। অপরাজিতা দেবী কে, তা নিয়ে বিতর্ক। তবে চিঠি প্রেরণের দৌত্য করেছিলেন শ্রীমতী রাধারানী দেবী।

লেখিকা লিখিলেন,

"বিরাগ জানি, কবি, বাদলেও
ফিকা না —
তাই চাই উত্তর। (না জানিয়ে
ঠিকানা)।

অপরাজিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্মরে কবি তাঁর উদ্দেশ্যে একটি কবিতা লিখলেন। নাম দিলেন তার ঠিকানা। কবিতাটি রাধারানী দেবীর কাছে পাঠানো হ'লো।[৩৫] ছন্দোময় করে পাঠালেন। কবি লিখলেন :

জানি এ সুযোগে চাও কিছু কিছু
হাল খবরের অংশ ,
হায়রে আয়ুতে খবরের কোঠা
প্রায় হয়ে এল ধ্বংস ।
সেদিন ছিলাম সাতাশ-আঠাশ
আশি আজি সমাসন্ন ,
আমার জীবনে এই সংবাদ
সবার অগ্রগণ্য । (পত্রদূতী)

প্রহাসিনী কাব্যে 'গর ঠিকানি' স্থান পেয়েছে । 'গরঠিকানি'তে কবি জবাবটা ছন্দ-দীর্ঘ আয়তনে দিয়েছেন । তাঁর ব্যঙ্গ পরিহাস এই কবিতায় স্থান পেয়েছে । পরিহাস-ময়তা তাঁর ব্যক্তি-স্বভাবের সঙ্গে জড়িয়েছিল । কাব্যে তাঁর উচ্চ মননশীল , সংস্কৃতি কর্ষিত , সমৃদ্ধ মনন পরিহাস , মার্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া গেছে । কবি চটুল ব্যঙ্গ পরিহাসের মধ্যে লেখনীকে অনেকখানি নিজের আয়ত্তে রেখেছেন । সবচেয়ে বড় কথা , হাস্যরসকে পরিবেশন করতে গিয়ে কবি পাহাড়ের ছবির কথা ভুলতে পারছেন না । যেমন :

সামনে দেখো - না
পাহাড় , সাবল ঠুকে
ইলেক্‌ট্রিকের
খোঁটা পোঁতে তার বুকে ;
সন্ধেবেলার
মসৃণ অন্ধকারে
এখানে সেখানে
চোখে আলো খোঁচা মারে ।
তা দেখে চাঁদের
ব্যথা যদি লাগে প্রাণে ,
বার্তা পাঠায়
শৈল শিখর পানে —

বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ ছিল । বিদেশী সাহিত্য তিনি পড়াশোনা করতে ভালবাসতেন এবং সাহিত্যিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতেন । এই সময়ে অমিয় চক্রবর্তী বিদেশে আছেন । বিদেশী সাহিত্য সম্পর্কে তিনি ২ আষাঢ় ১৩৪৫ তারিখে তিনি চিঠি লিখছেন । তাতে তাঁর ঐ অনুরাগের কথা প্রকাশ পেয়েছে । পরের দিন ১৮ জুন ১৯৩৮ তিনি 'অদেয়' কবিতাটি লিখলেন ।

'যক্ষ' কবিতাটি ২০ জুন ১৯৩৮ তারিখে তিনি রচনা করেন । কবিতাটি 'সানাই' কাব্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে । এখানে পাহাড় পরিবেশের চিত্র ফুটে উঠেছে ।

সমুৎসুক বলাকার ডানার আনন্দ-চঞ্চলতা
তারি সাথে উড়ে চলে বিরহীর আগ্রহ-বারতা
চিরদূর স্বর্গপুরে ,
ছায়াচ্ছন্ন বাদলের বক্ষোদীর্ণ নিশ্বাসের সুরে
নিবিড় ব্যথার সাথে পদে পদে পরমসুন্দর
পথে পথে মেলে নিরন্তর ।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পাঁচ বছর পূর্বে ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০ সালে দার্জিলিঙে বসে লেখা 'যক্ষ' কবিতাটিতেও পাহাড় পরিবেশের চিত্র দেখা গেছে । কালিম্পং ও দার্জিলিং দুই শৈল শহরে অবস্থান করে একই নামের কবিতায় নিসর্গ প্রেমের কথা উল্লিখিত ।

কালিম্পঙের রোমান্টিক পাহাড়ী পরিবেশ তাঁর মনে আনন্দ জুগিয়েছিল ।

কলকাতায় বঙ্কিম জন্মশত বার্ষিকীর উৎসবের আয়োজন করা হ'লে । কবি এই সময় কালিম্পঙে । তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন পূর্বক কবিতা রচনা করলেন । সেটি কলকাতায় পাঠানো হল । ঐ উৎসবে কবিতাটি পড়া হল ।

গত ভাদ্রমাসে কবি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন । তিনি শান্তিনিকেতনে ছিলেন । তারপর তিনি দীর্ঘদিন দূর পথে পা বাড়ান নি । তাঁর অসুস্থতার পর এই প্রথম দূরযাত্রা বলতে কালিম্পঙে আসা । কালিম্পঙে এসে তিনি শারীরিক সুস্থ ছিলেন । তারচেয়ে আরো ভালো ছিলেন তিনি মনে । জীবনের ক্লান্তি বিষাদ 'অচিরেই মুছে গেল । তিনি গভীর প্রশান্তি অনুভব করলেন ।

তাঁর যাবার সময় উপস্থিত । এবার ফিরে যেতে হবে সেই ব্যস্ত কর্মময় শহরে । অথচ তাঁর শরীর চায় বিশ্রাম , আর কর্মপ্রবাহ তাঁর কাছে অনেক কষ্টের মনে হয় । শান্তিনিকেতনে কর্মকেন্দ্রে ফিরে গেলে বাইরে দাবীগুলি আরও কত বেড়ে যাবে ,

এই ভেবে মাঝে মাঝে বোধহয় তিনি অসহায় বোধ করেন । বাধ্য হয়েই চিঠিগুলির উত্তর লেখাতে হয় সেক্রেটারিকে দিয়ে, কি-তু এই ব্যবস্থার মধ্যে কোথায় যেন একটা ফাঁকি আছে, কবির মন তাতে সায় দেয় না । যখন ভদ্রতার দায়িত্ব অস্বীকার করা যায় না, অথচ শরীর সয় না, মনও ক্লিষ্ট, যখন বোঝা বইবার শক্তি তিনি হারিয়েছেন, তখন সেটা অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে কোন মতে দায় রক্ষা করা যায়, কি-তু সেটা হয় ভারি লজ্জার । কাজেই সেক্রেটারির ব-কলমের হাত থেকে চাই মুক্তি, কবি বললেন : "আমি সম্পূর্ণ ছুটি চাই ।" এই ছুটির জন্যই বোধ হয় কালিম্পঙ থেকে যাবার আগে তিনি জনসাধারণের কাছে একটা আপিল লিখতে চান । বাংলা আপিল লিখে ফ্লা-তরে ও আন-দবাজারে পাঠিয়ে দিলেন, আর ইংরেজি আপিলের খসড়া দিয়ে রথী-দ্রনাথকে লিখলেন : "আপিলের ভাষা যদি কিছু বদল করতে চাস করিস কি-তু এটা অবিলম্বে প্রকাশ করা চাই—ই ।"[৩৬]

রথী-দ্রনাথকে এই চিঠি লেখার দিন দশেক পরে পাঁচ-ই জুলাই কবি শান্তিনিকেতন যাত্রা করলেন । কালিম্পঙের প্রথম অধ্যায় শেষ হ'ল ।

দ্বিতীয় পর্যায় গ্রীষ্ম ১৯৪০ :

রবী-দ্রনাথ কালিম্পঙ এলেন ১৯৪০ সালে ২১ এপ্রিল এবং ফিরলেন ১৫ জুন । এবার কালিম্পঙ বাসের প্রথম পর্বেই মৃত্যু দিয়ে শুরু । এখানে আসার পর প্রিয় মৃত্যু বিচ্ছেদের খবর পেলেন । সুরে-দ্রনাথ ঠাকুর পরলোক গমন করেছেন ।

মংপুতে আয়োজিত জ-মবাসরে শোক চিহ্ন স্লান পেল । এই ব্যথা এবং বেদনা নিয়ে কালিম্পঙে ফিরে এলেন । কালিম্পঙে আসার পাঁচদিন পরে খবর পেলেন কালী-মোহন ঘোষের মৃত্যুর বিশ্বভারতীর সাফল্যের মূলে তাঁর অবদান অনেকখানি ছিল । এই মৃত্যু তাঁকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল । কালিম্পঙ যাত্রার পূর্বে শান্তিনিকেতনে তিনি এন্ড্রুস সাহেবের মৃত্যুর খবর পেয়েছিলেন এপ্রিলের গোড়ার দিকে । ভারতের জাতীয় চেতনায় এবং শান্তিনিকেতনের বহুকার্যে তিনি জড়িয়ে ছিলেন । খুব স্বল্প ব্যবধানে তিনটি মৃত্যু কবিকে বিষন্ন করে ফেলেছিল । তাঁর রচনায় এর প্রভাব পড়েছিল । 'জ-মদিন' কাব্যে তার দৃষ্টান্ত মিলবে । সুরে-দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুতে তিনি উপলব্ধি করেছেন,

সায়াহ্ন বেলার ভালে অস্তসূর্য দেয় পরাইয়া
রক্তোজ্জ্বল মহিমার টিকা,

(জন্মদিন ৮ সংখ্যক)

কালিম্পঙ অবস্থানকালে কবির জীবন বিচিত্রভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রকৃতির অপরূপ রূপে যেমন মগ্ন ছিলেন, তেমনি শোক এবং সর্বোপরি বিষাক্ত পৃথিবী সম্পর্কে তাঁর উদ্বেগ এবং তার প্রতিকার। সমস্ত বিশ্বের লোক যাতে বিপদের সম্মুখীন না হয়, তার জন্য তিনি খুবই উৎকণ্ঠিত। তাঁর আশা আমেরিকা বুঝি আগামীদিনের শান্তি-রক্ষার দায়িত্ব নেবে। তিনি কালিম্পঙ থেকে ১৯৪০ সালে ১৫ জুন আমেরিকা যুক্ত-রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে লিখছেন,

" Today, we stand in awe before the fearfully destructive force that has so suddenly swept the world. Every moment I deplore the smallness of our means and the feebleness of our voice in India, so utterly inadequate to stem, in the least, the tide of evil that has menaced the permanance of civilisation.

All our individual problems of politics today have merged into one supreme world politics, which, I believe, is seeking the help of the United States of America as the last refuge of the spiritual man, and these few lines of mine merely convey my hope, even if unnecessary, that she will not fail her mission to stand against the universal desaster that appears so immminent."

এ যে কবির বাণী, রাজনৈতিকদের হৃদয় স্পর্শ করার মত নয়।
প্রবন্ধ, চিঠি ও কবিতায় তার প্রকাশ ঘটেছে। ২০ জুন তিনি অমিয় চক্রবর্তীকে একটি চিঠি লিখিলেন। তার কিছু অংশ উল্লেখ করি। তিনি লিখছেন, "কয়েক শতাব্দী পূর্বে য়ুরোপীয় সভ্যতা হঠাৎ সদাগরী শাবক প্রসব করতে শুরু করেছিল। তারা খাবার সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে লাগল আমাদের এশিয়া-আফ্রিকার পাড়ায়, ওদের মধ্যে কেউ কেউ

ছিল মোটা মোটা পিণ্ড চর্বচোষ্যলেহ্য নানাবিধ আকারে । এই ভোজের লোভনীয় মাংস গন্ধ পৌঁছাচ্ছিল য়ুরোপীয় নাসারন্ধ্রে । যে সব বঞ্চিত শাবকদের জিবে জল আসছিল অথচ মুখে গ্রাস জুটছিল না, তাদের জঠরানল ঠাণ্ডা ছিল না । অবশেষে ভুক্ত—অভুক্ত দুই পক্ষের মধ্যে লেগে গেছে কামড়া কামড়ি" ।

'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থে ২১ নং কবিতাটি গৌরীপুর ভবন, কালিম্পঙ, থাকার সময় (২২ মি ১৯৪০) রচনা করেন । পৃথিবীর বীভৎসতা ও ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য তিনি আবেদন রাখলেন । তিনি লিখলেন :

রক্ত-মাখা দন্ত পংক্তি হিংস্র সংগ্রামের
শত শত নগর গ্রামের
অন্ত্র আজ ছিন্ন ছিন্ন করে ;
ছুটে চলে বিভীষিকা মূর্ছাতুর দিকে দিগন্তরে ।
বন্যা নামে যমলোক হতে,
রাজ্য সাম্রাজ্যের বাঁধ লুপ্ত করে সর্বনাশা স্রোতে ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়াবহতার চিত্র ও আছে । শত শত গ্রাম নগরের উপর দিয়ে হত্যা, ধ্বংস, মৃত্যুর স্রোত বহে চলেছে । শান্তিবাদী আশাবাদী কবি মনে করেন --

এ কুৎসিত লীলা যবে হবে অবসান,
বীভৎস তাণ্ডবে
এ পাপ যুগের অন্ত হবে,
মানব তপস্বী বেশে
চিতাভস্ম শয্যাতলে এসে
নব সৃষ্টি—ধ্যানের আসনে
স্থান লবে নিরাসক্ত-মনে—
আজি সেই সৃষ্টির আহ্বান
ঘোষিছে কামান ।

(জন্মদিনে, ২১ সংখ্যক)

সারা পৃথিবী জুড়ে বিপর্যয়, তার ভূত ভবিষ্যৎ সব কিছু ঘিরেই তাঁর চিন্তা । আসলে তিনি বিশ্বকবি । তাঁর পক্ষেই এইরূপ একটি শুভ চিন্তা থাকতে পারে । কিন্তু

আশ্চর্য, কবি যখন এমন একটি অশুভ সংকেতের মধ্যে পৃথিবীময় জনজীবনকে দেখছেন, সেই সময় আবার তিনি সহজ কবি ধর্মে প্রত্যাবর্তন করছেন। ঐ ২২ মে কবি অন্যভাবে অন্য চিন্তায় সহজভাবে 'মানসী' কবিতাটি লিখলেন। আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভালবাসা ও কল্পনায় বিভোর হয়ে তীব্র অনুভূতিতে এই কবিতাটি রচনা করেন। কয়েকটি চরণ তুলে ধরি :

বাস্তব মোরে বঞ্চনা করে
পালায় চকিত নৃত্যে,
তারি ছায়া যবে রূপ ধরি আসে
বাঁধা পড়ি যায় চিত্তে।
তারার আলোকে ভরে সেই সাকী —
মদিরোচ্ছল পাত্র —
নিবিড় রাতের মুগ্ধ মিলনে
নাই বিচ্ছেদ মাত্র।
ওগো মায়াময়ী, আজি বরষায়
জাগালে আমার ছন্দ —
যাহা-খুশি সুরে বাজিছে সেতার
নাহি মানে কোন বন্ধ।

(মানসী, সানাই)

এই ভ্রমণ পর্যায়ে কবিকে সাতটি কবিতা ও একটি ছড়া রচনা করতে দেখছি। কবিতাবলী : নামকরণ, বিমুখতা, আত্মছলনা, অসময়, অপঘাত, জন্মদিন ২১ এবং ছড়া — ১।

১৯৪০ সালে ৪ এপ্রিল নবজাতকের ভূমিকায় স্পষ্টই তিনি উল্লেখ করেছেন, "কোনো কোনো বনের মধু বিগলিত তার মাধুর্যে, তার রঙ হয় রাঙা, কোনো পাহাড়ি, মধু দেখি বন, আর তাতে রঙের আবেদন নেই, যে শুভ্র; আবার কোনো আরণ্য সঞ্চয়ে একটু তিক্ত স্বাদের ও আভাস থাকে।" এই পাহাড়ী মধু সঞ্চয় কবি ব্যক্তিগত জীবনে কম করেননি। পাহাড়ে অবস্থান কালে তার স্বাক্ষর মিলেছে। নবজাতকের আত্মঅনুসন্ধানী বা আত্মবিচারক কবি ফেলে আসা দিনের মাঝে গান ও রাগরাগিনীর কথা

স্মরণ করছেন, যেখানে তিনি নতুন চোখে নতুন কিছু দেখতে পাবেন। বিরাট বিশ্বের কথা ভাবলেও ব্যক্তি-গত অনুভূতি সসীম জগতে এসে অপূর্ব রূপ মাধুর্য, রসঘন করতে সাহায্য করেছে। প্রাকৃতিক পরিবেশ তীক্ষ্ণভঙ্গিতে উপস্থিত।
কবি উচ্চারণ করলেন,

"বন নীলিমার শেষ সীমানাটিতে,
বহু জনতার মাঝে অপূর্ব একা।"

(উদ্‌বোধন)

'সানাই' কাব্যে আমরা রোমান্টিক অথচ পুরাতন দিনের মানসিকতার সঙ্গে আবার মিলতে দেখলাম। এ কাব্যে কোথাও পুরানো দিনের স্মৃতি, কোথাও সুদূরের অন্বেষণ, কোথাও বিহ্বল মন নিয়ে প্রকৃতির ক্ষণিক মাধুর্যরস আস্বাদন, কোথাও তাঁর বহু বর্ণিত লীলা সঙ্গিনীর পরিচয় পরিলক্ষিত হয়েছে। তাঁর সুর ও ছন্দ ভবে কল্পনা-অনুভূতি এক অপরূপ অভিব্যক্তি-র রূপ নিয়েছে — এক কথায় গীতিকাব্যের সুর ও ছন্দ। তাঁর বিদায় বেলার সুর সানাই কাব্যে বিধৃত। এই সানাই কাব্যের অন্তর্গত বিমুখতা লিরিকের নমুনা বলা যেতে পারে। এই কবিতায় অতি সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা ও ভাবময়তার একটা ইঙ্গিত পরিলক্ষিত হয়েছে। এই সুর মূর্ছনার প্রকাশের সহায়তায় পাহাড় প্রকৃতি এসেছে। 'মন'কে শ্রাবনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। মনের রূপকে পর্যালোচনা করতে গিয়ে তিনি কখনো নদী বা স্রোতস্বিনী প্রসঙ্গ এনেছেন। মন কখনো অভাবিত পথে যায় এবং তাতে ক্ষতির পরিণাম দেখা যায়। নদীর গতিপথ পরিবর্তনে 'ভরা ফসলের' ভয়। কবি বললেন,

"বাঁধা পথে তারে বাঁধিয়া রাখিবে যদি
বর্ষা নামিলে খর প্রবাহিনী নদী
ফিরে ফিরে তার ভাঙিয়া ফেলিবে".....

১৯৪০ সালে জুন মাসে কবিতাটির রচনাকাল। এই মাসে তো পাহাড়ে বর্ষা নেমে আসে। তাঁর চিত্র উক্তি পংক্তি-গুলিতে ফুটে উঠেছে। এখানে রচনাকাল এবং কবিতায় বর্ণিতকাল একই সময়। এ ছাড়া পাহাড় প্রকৃতির স্পষ্ট রেখা, "হঠাৎ কখন পাষাণে আছাড়ি', "ঝরনার পথে উজানের খেয়া" উল্লেখ্য। আবার "গিরি নদী-স্রোতে বাঁধা পড়িয়ো না পণ্যের ব্যবহারে।"

সানাই কাব্যে "আত্মছলনা" কবিতায় সহজেই প্রতীয়মান হবে, কবি বাস্তবের ঊর্ধ্বে রোমান্টিক প্রেমের জগতে—স্বপ্ন জগতে বিচরণ করছেন। কোমল প্রেমের কবিতা রচনা করতে গিয়ে কবির লেখনীতে চিত্রকল্প উপস্থিত। কবি উচ্চারণ করছেন,

"সন্ধ্যা মেঘের রাগে
অকারণে যত ভেসে - চলে - যাওয়া
অপরূপ ছবি জাগে।
সেই মতো ভাসে মায়ার আভাসে
রঙিন বাষ্প মনের আকাশে,
উড়াইয়া দেয় ছিন্ন লিপিতে
বিরহ — মিলন -ভাবনা।"

সানাই এর আর একটি কবিতা 'মানসী' ভিন্ন সুরের কবিতা। কবিতাটি সুদূরের রহস্য ও গূঢ়তম সত্যের ব্যঞ্জনা এনে দেয়। কবির অসামান্য রোমান্টিক প্রতিভা নীরস বাস্তবকে অসীম ভাবালোকে নিয়ে গেছে। এই কবিতাটির ভাবধর্ম স্মৃতি চিত্রণে সাহায্য করেছে। বিশদ বর্ণনার আড়ালে গীতিধর্ম বজায় রেখেছে। পাহাড় বৈচিত্র্য বিশেষ করে প্রকৃতির সৌন্দর্য ও উজ্জ্বলতা সুন্দর চিত্রকল্পের সাহায্য আমাদের অন্যজগতে নিয়ে গেছে।

কবি বলেছেন, গিরির শিখরে ডাকিছে ময়ূর
কবি কাব্যের রঙ্গে
সুপুলকে কে জাগে চমকি
বিগলিতচীর—অঙ্গে।

এই কবিতাটি ১৯৪০ সালে ২২ মে রচিত। কালিম্পঙ বসবাসকালেই। গিরি শিখরে ময়ূর ডাকার মধ্যে বর্ষার ভাব উদ্ভাসিত। সময়ের প্রভাব এ ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে।

কবি অমিয় চক্রবর্তীকে চিঠি লিখছেন। এই চিঠিতে শুধু পাহাড় পারিপার্শ্বিকতার ছবি মিলবে না, কবিতার পারিপার্শ্বিকতাকে দেখার সুযোগ মিলবে। চিঠিটা উল্লেখ করি।

গৌরীপুর ভবন
কালিম্পঙ

কল্যাণীয়েষু,

তুমি চলে যাওয়ার পর আমাদের এখানকার আসর ঘুমড়ে পড়েছে। তারপর

তারা নিজেরা অক্ষম বলেই সক্ষমদের সংকটে উল্লাস বোধ করচে । এটা হচ্চে দূর থেকে নিরাপদে দুয়ো দেবার প্রবৃত্তি ।

যখন পরমবোধ করবে এখানে এসে ঠা-ডা হয়ে নিয়ো । ইতি ২৪।৫।৪০

তোমাদের

রবী-দ্রনাথ

কবি 'অপঘাত' কবিতাটি ১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭ সালে কালিম্পং অবস্থান কালে রচনা করেছিলেন । কবিতাটি পাহাড় পরিবেশের মধ্যে বসে লিখলেও কবিতাটির অনেকখানি অংশ সমতলের গ্রামবাংলার বর্ণনা-বিধৃত । তখন বিকেল, আস্তে আস্তে বাতাস বইছে, জনশূন্য মাঠের উপর দিয়ে হাটমুখী গরুর গাড়ী যাচ্ছে । রাজবংশী পাড়ার সংলগ্ন পুকুর, বনমালী পণ্ডিতের বড়ো ছেলের মাছ ধরার জন্যে ধৈর্য, ওপরে আকাশ, নদীর চর থেকে আসা বুনো হাঁসগুলো ডেকে যাচ্ছে সেই ফাঁকা-শূন্যে । এই গ্রাম্য পরিবেশে দুই বন্ধুর দেখা হ'ল অনেকদিন পর । কেটে নেওয়া ইক্ষুক্ষেতের ধার দিয়ে তারা পায়ে হেঁটে এগোয় । তাদের মধ্যে একজন নব বিবাহিত, তার আনন্দ শেষ হতে চায় না । আশে পাশে ভাঁটি ফুল ফুটে রয়েছে, জারুলের শাখায় অদূরে কোকিলের পুনাপের সুর শোনা গেল । এই পর্যন্তই নিসর্গের বর্ণনা পাহাড় নিসর্গ থেকে সূত্র । রবী-দ্রনাথের পক্ষে তা সম্ভব । এর চেয়ে আর একটি বৈশিষ্ট্য এই কবিতাটির মধ্যে নিহিত রয়েছে । কবি এই নিসর্গের ছবি তুলতেই হঠাৎ দুই চরণ লিখলেন :

"টেলিগ্রাম এল সেইক্ষণে
ফিন্‌ল্যান্ড চূর্ণ হল সোভিয়েট বোমার বর্ষণে ।"

কবি ভারতের তথা পৃথিবীর জটিল রাজনীতি সম্পর্কে চিন্তা করছেন । সমগ্র বিশ্ববাসী যাতে ধ্বংসের মুখে না পড়ে সেই কারণেই তিনি উৎকণ্ঠিত । এই অপঘাত, এই মৃত্যু কিসের জন্য ? দুর-ত লোভ, বর্বর পশু শক্তি না শক্তির অপচয় ? অসামান্য বেদনার কথা কবির কলমে নিঃসৃত । কবিচিত্ত বিমূঢ়, কি-তু তাঁর মধ্যে জীবন-বোধের ধারা আদর্শ বাদের আধারে আশ্রিত । অপঘাতের নূতন সূচনা দেখছেন। ৩১শে মে ১৯৪০ তারিখে তিনি লিখলেন ;

দামামা ঐ বাজে
দিন-বদলের পালা এল

ঝোড়ো যুগের মাঝে ।
শুরু হবে নির্মম এক নূতন অধ্যায়—
নইলে কেন এত অপব্যয় ,
(জন্মদিনে - ১৬ সংখ্যক)

এই যাত্রায় কালিম্পঙে কবি অনেকদিন ছিলেন । কি-তু প্রচুর তথ্যের অভাবে তাঁর জীবনের ব্যক্তি-গত দিকগুলি উল্লেখিত হয়নি । সে সুযোগ নেই । তবু এই সময়ে তাঁর মানসিকতার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর পাওয়া গেছে । বিভিন্ন রচনার মধ্যে দিয়ে তার প্রকাশ ঘটেছে । কবির শেষ জীবনে কালিম্পং অনেক দিয়েছে । তিনি অফুর-ত অবসর পেয়েছেন এবং এই অবসরের ফাঁকে ফাঁকে অমূল্য রচনা বাংলা সাহিত্যের পাঠক পেয়ে গেছেন ।

তৃতীয় পর্যায় । শরৎ ১৯৪০

রবী-দ্রনাথ ১৯৪০ সালে ২০ সেপ্টেম্বর কালিম্পঙ এলেন । সরাসরি মংপুতে তাঁর যাওয়ার কথা ছিল । মৈত্রেয়ী দেবীকে কথা দিয়েছিলেন । প্রতিমাদেবী তিন সপ্তাহ আগে কালিম্পঙে এসেছেন । গৌরীপুর ভবনের ঘর গুলি সযত্নে সাজিয়ে রেখেছেন । এবার এখানে আসার অনেকগুলি অসুবিধা ছিল । অন্যতম অসুবিধা ছিল , কবির শরীর । তাঁর শরীর ভালো ছিল না । ডা: নীলরতন সরকার ও ডা: বিধানচ-দ্র রায় দুজনই কবিকে পাহাড়ে আসতে নিষেধ করেছিলেন । কবি সে আপত্তি শোনেন নি । তিনি কালিম্পঙে এসে উঠলেন । মংপুর চেয়ে কালিম্পঙ তাঁর কাছে ভালো মনে হল । কেননা ওখানে প্রতিমা দেবী আছেন । কবির সঙ্গে এলেন সুধাকা-ত বাবু । তাঁর ছেলের অসুখ থাকায় তিনি ফিরে গেলেন শান্তিনিকেতনে । কি-তু আবার ফিরে এলেন , অনিলকুমার চ-দ প্রমুখের সঙ্গে । কবির অসুস্থ শরীরের কথা জেনে । তাঁর শরীরের ক্লা-তির ছায়া মুখের উপর ছিল । দু'দিনের মধ্যে তাঁর শরীরের উন্নতি ঘটল ।

কালিম্পঙে শরৎ । চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে সোনার রঙ , ফুলের বিচিত্র গন্ধ । রৌদ্রের উজ্জ্বলতা দিগ-ত ব্যাপী । খুব ভোরে কবি আরাম কেদারায় এসে বসেছেন । চিরাচরিত প্রথায় কবির ঘরের সব জানালা খোলা ।

কবির পূবদিকে মুখ করে বসা অভ্যাস , কি-তু এখানে পূবদিকটি ফাঁকা নয় । উত্তরদিকে চোখ গেলেই শুভ্র পাহাড় । আজকের সকালে ধরিত্রী নতুন সাজে সেজেছে ।

আকাশের রঙ গাঢ় নীল। দারুণ ঘন সবুজ প্রাণময় বৃক্ষলতা। ফুলের রঙ এবং গন্ধ বাতাসকে মাতিয়ে তুলেছে। এ যেন উৎসবের প্রারম্ভ সাজ। চায়ের পাট চুকে গেলে প্রতিদিনের মত তিনি লেখবার ঘরে এসে বসলেন। গৌরীপুর ভবন থেকে ১৯৪০ সালে ২৪ সেপ্টেম্বর তিনি "জন্মদিন" কাব্যগ্রন্থের ২০ সংখ্যক কবিতাটি রচনা করলেন। প্রকৃতি পরিবেশের চিত্র এই কবিতায় ধরা পড়ল। কালিম্পঙ পাহাড়ের নাগোয়া পাহাড়ের কথা কবির মনে পড়ছে। শ্রাবণ মাসের প্রাণময় "পাগল ঝোরা"র কথা ভুলবার নয়। কবি শ্রাবণের দূতরূপে কল্পনা করেছেন। তিনি লিখলেন :

"গিরি শিরে যে পাগল-ঝোরা
শ্রাবণের দূত, তারি আত্মীয়া আমরা
আসিয়াছি লোকালয়ে
সৃষ্টির ধ্বনির মন্ত্র লয়ে।
মর্মমুখর বেগে
যে ধ্বনির কলোৎসব অরণ্যের পল্লবে পল্লবে
যে ধ্বনি দিগন্তে করে ঝড়ের ছন্দের পরিমাপ,
নিশান্তে জাগায় যাহা প্রভাতের প্রকাণ্ড প্রলাপ,
সে ধ্বনির ক্ষেত্র হতে হরিয়া করেছে পদানত
বন্য ঘোটকের মতো
মানুষ শব্দেরে তার জটিল নিয়ম সূত্র জাল
বার্তা বহনের লাগি অনাগত দূর দেশে কালে।"

এই কবিতাটির আর একটি রূপের অভিব্যক্তি প্রতিমা ঠাকুর 'নির্বাণ' গ্রন্থে দেখিয়েছেন।[৩৭] ২৪ সেপ্টেম্বর কালিম্পঙে যে কবিতা লিখেছেন তার থেকে বোঝা যায় সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে তিনি ঐ সময়ে একটি ধ্বনি ও ভঙ্গীর আনন্দলোকে বিচরণ করছিলেন :

উদ্দাম হইয়া উঠে শুধু ধ্বনি শুধু ভঙ্গী তার।
মনে মনে দেখিতেছি সারা বেলা ধরি',
দলে দলে শব্দ ছোটে অর্থ ছিন্ন করি',
আকাশে আকাশে যেন বাজে,
আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম ঘোড়াডুম সাজে। (জন্মদিনে, ২০ সংখ্যক)

তাঁর জীবনের বিষাদপূর্ণ অধ্যায় শুরু হবার কয়েকদিন আগে তিনি যে চিন্ময়লোকে বাস করছিলেন তাঁর সেই অনুভূতি এই ক'দিনের লেখার মধ্যে ধাঁধা পড়েছে। সমস্ত সৃজনী শক্তি যেন উদ্দামতায় উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল, তাই ধ্বনি ও ভঙ্গীগুলো তাঁর মানস-আকাশে সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষায় পাখা মেলে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, যাকে কোনো নাম দেওয়া যায় না, তাকেই তিনি বলেছেন, "আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম ঘোড়াডুম সাজে।"

কালিম্পঙের প্রকৃতি পরিবেশ কবির ভাবাবেগ, আনন্দ যতটা না প্রকাশ পেয়েছে তার অনেকগুণ বেশি প্রকাশ পেয়েছে ২৫ সেপ্টেম্বরের রচিত কবিতায়। কবি এই কবিতায় নিসর্গের দরজা শুধু উন্মুক্ত করেন নি, সেখানে তাঁর জীবন সায়াহ্নের চিত্র তুলে ধরেছেন। কবিতাটিতে তাঁর লেখার সাবলীল গতি অপরূপ রূপরসে ভার উঠেছে। কালিম্পঙের স্মৃতি লাবণ্যময় রূপ লাভ করেছে। বিশ্বপ্রকৃতির অফুরন্ত আনন্দভাণ্ড আজ ছাপিয়ে পড়ছে, কবি ভুলে গেছেন নিজের অসুস্থতা। তিনি লিখলেন :

পাহাড়ের নীলে আর দিগন্তের নীলে
শূন্যে আর ধরাতলে মন্ত্র বাঁধে ছন্দ আর মিলে।
বনেরে করায় স্নান শরতের রৌদ্রের সোনালি।
হলদে ফুলের গুচ্ছে মধু খোঁজে বেগুনি মৌমাছি।
যাবখানে আমি আছি,
চৌদিকে আকাশ তাই দিতেছে নিঃশব্দ করতালি।
আমার আনন্দে আজ একতারা ধ্বনি আর রঙ,
জানে তা কি এ কালিম্পঙ।
ভাণ্ডারে সঞ্চিত করে পর্বতশিখর
অন্তহীন যুগ যুগান্তর।
আমার একটি দিন বরমাল্য পরাইল তারে,
এ শুভ সংবাদ জানাবারে
অন্তরীক্ষে দূর হতে দূরে
অনাহত সুরে
প্রভাতে সোনার ঘণ্টা বাজে ঢঙ ঢঙ,
শুনিছে কি এ কালিম্পঙ।

কবিতাটি 'জন্মদিন' কাব্যে ১৪ সংখ্যক কবিতা রূপে স্থান পেয়েছে। সমগ্র কবিতাটি কালিম্পঙ পাহাড়ের প্রকৃত চিত্র এবং কবির ব্যক্তি-অনুভব স্থিররূপে ধরা পড়েছে।

এই কবিতাটি 'বরণ' নামে 'সঞ্চয়িতা'য় স্থান পেয়েছে। চরণাবলী একই ধরণের নয়। 'জন্মদিন' কাব্য গ্রন্থে ১৪ সংখ্যক থেকে একটু আলাদা। কালিম্পঙকে বরণ করা হয়েছে। কালিম্পঙের মৌন, ধ্বনিহীন প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। সোনার ঘণ্টার ধ্বনিতে সব কিছু সোনা হয়ে উঠেছে, তারই আকৃতিতে কবি কালিম্পঙকে বরণ করেছেন। তাঁর রচনায় বা ব্যক্তিগত জীবনে কালিম্পঙের প্রভাব চিরস্মরণীয় নয় সত্য, তবু জীবনের শেষ দিনগুলিতে বাঁচার অনুপ্রেরণা এবং জীবনকে সুন্দর করে দেখার প্রয়াস লক্ষণীয়। কালিম্পঙের গোপন স্থানের কথা কবি ভুলতে পারছেন না। তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতির কারণে, পাহাড় পরিবেশের অনুষঙ্গ এবং বিশেষ বিশেষ অনুভূতিতে কবি এই অখ্যাত পাহাড়ের কাছে দায়বদ্ধ। স্বভাবতই তিনি বরণ নামে অভিহিত করেছেন।

এই সময় রবীন্দ্রনাথ শরীরে জোর পাচ্ছেন না। দুর্বল বোধ করছেন। ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৪০ তারিখে অমিয় চক্রবর্তীকে যে চিঠি লিখতে শুরু করেছিলেন, তা শেষ করছেন ২৫ সেপ্টেম্বরে। আরো লক্ষ্য করা গেল, এই চিঠিতে তিনি লিখছেন, চিঠির প্রথমাংশ সমেত কবিতাটি কবি করে 'পরিচয়'এ সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ঠিকানায় পাঠাতে। তাঁর আর একটা চিঠি লেখা বা কপি করা দুই-ই শক্ত ব্যাপার। শারীরিক দুর্বলতাই কারণ। এত অসুবিধার মধ্যেও কবি পাহাড়ের আকর্ষণের কথা অমিয় চক্রবর্তীকে না জানিয়ে পারছেন না। চিঠিটা তুলে ধরা হ'ল :

২০ সেপ্টেম্বর ১৯৪০

কল্যাণীয়েষু,

অমিয়, কর্তব্যের সংসারের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে আছি। রক্তে জোয়ার আসবে বলে মনে হচ্চে যেন। শারদা পদার্পণ করেছেন পাহাড়ের শিখরে, পায়ের তলায় মেঘপুঞ্জ কেশর ফুলিয়ে স্তব্ধ হয়ে আছে। মাথার কিরীটে সোনার রৌদ্র বিচ্ছুরিত। কেদারায় বসে আছি সমস্ত দিন, মনের দিক প্রান্তে ক্ষণে ক্ষণে শুনি বীণা পাণির বীণার গুঞ্জরণ। তারি একটু খানি নমুনা পাঠাই —

পাহাড়ের নীলে আর দিগন্তের নীলে
শূন্যে আর ধরাতলে মন্ত্র বাঁধে ছন্দের মিলে ।
বনেরে করায় স্নান শরতের রৌদ্রের সোনালি ।
হলদে ফুলের গুচ্ছে মধু খোঁজে বেগুনি মৌমাছি ।
মাঝখানে আমি আছি ,
চৌদিকে আকাশ তাই দিতেছে নিঃশব্দ করতালি ।
আমার আনন্দে আজ একাকার ধ্বনি আর রঙ
জানে তা কি এ কালিম্পঙ ?
ভাঙারে সঞ্চিত করে পর্বতশিখর
অন্তহীন যুগ যুগান্তর ।
আমার একটি দিন বরমাল্য পরাইল তারে
এ শুভ সংবাদ জানাবারে
অন্তরীক্ষে দূর হতে দূরে
অনাহত সুরে
প্রভাতে সোনার ঘন্টা বাজে ঢং ঢং
শুনিছে কি এ কালিম্পঙ ?

২৫।১।৪০

লিখতে রীতিমত কষ্ট বোধ হয় । চিঠির প্রথমাংশসমেত কবিতাটি যদি কপি করে 'পরিচয়'এ সুধী-দ্রনাথ দত্তের ঠিকানায় পাঠাতে পার খুশি হব । ইতি

তোমাদের রবী-দ্রনাথ

এখানে শরৎকালটা রমণীয় , যদি কিছুদিন কাটিয়ে যেতে পারো ভালো লাগবে , আমারো লাগবে ভালো । এখানে লেখাপড়ার কাজ অবাধে করতে পারবে ।

তোমাদের

রবী-দ্রনাথ

কবির আন-দঘন মুহূর্ত যে শেষ হয়ে আসছে , গাঢ় অন-ধকার যে অপেক্ষা করছে , গাঢ় অন-ধকার যে অপেক্ষা করছে , যে কথা কারো অজানা নয় । সন-ধ্যা সমাগত , ঘরে ফিরতেই হয় ।

২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪০ তারিখে বিকালে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন ।

মানসিক এবং দৈহিক সুস্থ অবস্থায় "জন্মদিনে" ১৪ সংখ্যক কবিতাটি শেষ রচনা । তাঁর মৃত্যুর পরে চিত্রভানুর নির্মাণ কার্যের পর তার দেওয়ালে এই কয়েকটি লাইন রাখা হল একটি মার্বেল পাথর খোদিত করে । তাঁর ছবি নীচে । মূল ছবিটি অবনী-দ্রনাথের আঁকা, তা থেকে বড় করে প্রতিমাদেবী স্কেচ করিয়েছিলেন এবং সেটি স্থাপন করেছিলেন চিত্রভানুর প্রাঙ্গণে । রাতটা ভাল গেল না । পরের দিন সকলে প্রতিমাদেবী ডাক্তার ডাকার কথা কবিকে জিজ্ঞাসা করেন । কবি অনুমতি দিলেন । স্থানীয় ডাক্তার গোপাল দাশগুপ্ত এলেন । তাঁর সঙ্গে কবির কথা হয় । ডা: দাশগুপ্ত প্রেসক্রিপশান করেন এবং সব ব্যবস্থাদি করে চলে গেলেন । দুপুরে আবার ডা: দাশগুপ্তের ডাক পড়ে । ইতিমধ্যে মৈত্রেয়ী দেবীরা মংপু থেকে চলে এসেছেন ।

ডা: দাশগুপ্ত ভিতরের ঘরে গেলেন । তিনি কোন উত্তর পেলেন না কবির কাছ থেকে । তিনি বুঝলেন অসুখটা সহজ নয় । প্রতিমাদেবীর অনুমতিক্রমে কালিম্পঙ হাসপাতালে সদ্য আগত সাহেব ডা: ক্রেগকে ডাকা হল । ডা: ক্রেগ কিড্‌নির অসুখ বললেন । তখনই করার কিছু ছিল না । অগত্যা রাতটা অপেক্ষা করতে হ'ল । ভোরের দিকে তিনি একটু ভাল বোধ করলেন । ইতিমধ্যে বোলপুরে খবর পাঠানো হয়েছে । দু'বছরের অল্প কিছু আগে, কবি কালিম্পঙে টেলিফোন উদ্বোধন করেছিলেন, সেই টেলিফোনে আজ সরাসরি কথা হল ।

দুপুর থেকে আবার শরীর খারাপ হল । রথী-দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে নেই । জমিদারির কাজে পতিসরের দিকে, তাঁর ঠিকানা জানা নেই ।

প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশকে কলকাতা থেকে ডাক্তার নিয়ে আসার কথা জানানো হল । দার্জিলিঙের সাহেব সিভিল সার্জেনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হল । তিনি বললেন সন্ধ্যার পর এসে পৌঁছবেন । গৌরীপুর ভবনে সেদিন কবি অচৈতন্য অবস্থায় শুয়ে আছেন । আর বাইরে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া । দার্জিলিঙ এবং কালিম্পঙের মাঝে পেশক রোড খুব বিপদসঙ্কুল । ঐ রাস্তা ধরে দুর্যোগের মধ্যে সাহেব ডাক্তার এসে পৌঁছলেন । সিভিল সার্জেন রবী-দ্রনাথকে পরীক্ষা করলেন । ডা: গোপাল দাশগুপ্তকে বললেন, তখনি অপারেশন করার কথা । প্রতিমাদেবী অনুমতি দিলেন না । কেননা রবী-দ্রনাথ অস্ত্রোপচার

পছন্দ করতেন না। সাহেব সিভিল সার্জেনকে বোঝানো হল। ঐ দিনই প্রশান্ত বাবুরা ডাক্তার নিয়ে রওনা হয়েছেন। ডা: দাশগুপ্তকে রাতে থাকার জন্য প্রতিমাদেবী অনুরোধ করেন। ডা: দাশগুপ্ত সম্মত হলেন। রাতে হোমিওপ্যাথ ডাক্তার জ্ঞান মজুমদারের সঙ্গে যোগাযোগ হল। তাঁর বিধানমত ওষধ খাওয়ানো হল। স্থানীয় হোমিওপ্যাথ ডাক্তার সত্য নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এই কাজটি করলেন। খানিকটা প্রস্রাব হল। ফলে সুস্থ বোধ করলেন। চিনতে পারলেন সকলকে। ভোরের সঙ্গে সঙ্গে অশুভ রাত্রি শেষ হল।

সকাল ন'টা - দশটার মধ্যে এসে পড়লেন প্রশান্তবাবু ডাক্তারদের সঙ্গে নিয়ে। ডা: জ্যোতি-প্রকাশ সরকার, ডা: অমিয় নাথ বসু এবং ডা: সত্যসখা মৈত্র এসেছেন। এ সেই গ্লুকোচ ইন-জেকশন দিলেন। ফল ভাল পাওয়া গেল। খবর এল —শিলিগুড়িতে রবী-দ্রনাথ আসছেন।

যাবার জন্য সকলেই তৈরী। শেষে কবিকে নিয়ে তাঁরা কলকাতা অভিমুখে রওনা হলেন। এই পর্যন্তই কবির কালিম্পঙের কথা। তাঁর শেষ জীবনের যেটুকু আনন্দের জোয়ার দেখা গিয়েছিল, তা এই নির্জন কালিম্পঙকে ঘিরেই। তাঁর আন-দবেদনার স্মৃতিসৌধ এই কালিম্পঙ। কবির উজ্জ্বল দিনগুলির স্মৃতি বহন করে রেখেছে নির্জন উপত্যকায় গড়ে ওঠা নীলনির্জন "চিত্রভানু"।[৩৮]

মংপু :

রবী-দ্রনাথ মংপু পাহাড়ে চারবার গিয়েছেন । প্রতিবারেই মৈত্রেয়ী দেবী ও তাঁর স্বামী ডা: মনোমোহন সেনের অতিথি হয়েছেন । তাঁদের আ-তরিকতায় এবং সহায়তায় মংপুর দিনগুলো কবির সু-দর হয়ে উঠেছিল । স্মৃতিময় শুধু হয়নি , তাঁর রচনা সমৃদ্ধ হয়েছে । মৈত্রেয়ী দেবীর সঙ্গে টুকরো টুকরো কথাবার্তা রসময় হয়ে উঠেছে এবং ব্যক্তির বাইরে তার রূপ নিয়েছে । তার বিস্তৃত বিবরণ 'মংপুতে রবী-দ্রনাথ ' গ্রন্থে মৈত্রেয়ী দেবী দিয়েছেন । ঐ বর্ণনা আলোচ্য অংশে জরুরি নয় । জরুরি সেই সব অংশ যেখানে তাঁর রচনার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে , বহুল অনুষঙ্গ অথবা পাহাড় প্রকৃতির প্রাণময় প্রভাব ।

১৯৩৮ সালে ২১ মে প্রথমবার তিনি কালিম্পং থেকে মংপু এসেছিলেন । ১ জুন আবার কালিম্পং ফিরে যান । মৈত্রেয়ী দেবী জীবনের জীবনী প্রবাহ বলেছেন , তাঁর স্মৃতিকথাকে । রবী-দ্রনাথ অতি সাধারণভাবে মৈত্রেয়ী দেবী ও তাঁর পরিবারবর্গের সঙ্গে মিশেছেন । অতি সাধারণ কথাবার্তা অনেক সময় বৃহত্তর আকার ধারণ করেছে । তার প্রমাণ কিছু দেওয়া যায় । কবির কথায় প্রকৃতির প্রতি কবির মমত্ববোধ , ভালবাসা প্রকাশ পেয়েছে । রবী-দ্রনাথ বলেছেন , "না , না , তোমাদের পাহাড়ের বাংলো তো খুব সু-দর হয় আমি জানি । তবে কিনা আমারই কল বিগড়েছে , নড়ঘড়া কষ্ট সাধ্য হয়েছে ।"

কবি বারান্দায় একটা চৌকিতে একটু বিশ্রাম করলেন । তিনি বললেন , 'পথে আমার কোনো কষ্ট হয়নি । এমন সু-দর অরণ্যপথ । তোমাদের এই বনটি কি-ত্তু অপূর্ব । লম্বা লম্বা সব গাছ সোজা ঊর্ধ্বমুখে দাঁড়িয়ে আছে , নিচে ঘন ছায়ায় কালো কালো অ-ধকার —একেই তো বলে অরণ্য ।" মৈত্রেয়ী দেবীর বর্ণনায় কবির পাহাড় প্রকৃতির উপর ভালবাসার লক্ষণ ধরা পড়েছে । "সুরেলের বাড়িতে ভোর পাঁচটায় চা খেয়ে নিয়ে ন'টা সাড়ে ন'টা পর্য-ত চিঠি লেখা ও "বাংলা ভাষা পরিচয়" বইটা নিয়ে কাজ চলত । ওঁর বসবার ঘরের পশ্চিম দিকের জানালা দিয়ে একটা প্রকা-ড araucaria পাম গাছ দেখা যেত , বিশাল মহীরুহ , তার সোজা সোজা ডাল-গুলো যেন দুদিকে হাত বার ক'রে দাঁড়িয়ে আছে । নিচেই একটা ক্যামেলিয়া গাছ সাদা হ'য়ে থাকত ফুলে , ক্যামেলিয়াকে উনি বলতেন মোমের ফুল । কতদিন দেখেছি লিখতে লিখতে কলম ব-ধ করে ঐ বিশাল ছায়াময় বনস্পতির দিকে চেয়ে ব'সে আছেন ।"

কবির কথায় আবার আসতে হয় । ৬ জুন তিনি সদলবলে নীচের বাড়িতে নামলেন ।

সুরেল ভবন

কথায় কথায় তিনি মৈত্রেয়ী দেবীকে বলছেন,

"এই অরণ্যের একটা ছবি আঁকতেই হবে, এর একটা বিশেষত্ব আছে।" অনিলবাবু বললেন, "গুরুদেব, a forest of Parallelograms ?" কবি বলছেন, "এতো চমৎকার বাড়ি। তুমি কেন আপত্তি করেছিলে ? কি সুন্দর এই সামনের ঢালু পাহাড়টি, আকাশের কোল থেকে সবুজ বন্যা নেমে এসেছে। এই সামনের মাঠটি ও তোমার ভালো, আমি কাছাকাছিই থাকতে চাই। চলৎশক্তি কমে এসেছে; মাটির স্পর্শ চোখ দিয়েই তাই মিটিয়ে নিতে হয়। চল তাহ'লে, তোমার বাড়ির জিয়োগ্রাফীটা জেনে আসি। .....এই কাঁচের ঘরটি বুঝি আমার লেখবার ? এতো খুবই ভালো, একেবারে উত্তম বলা যেতে পারে। এ চৌকিতে সকাল বেলা বসব আর রোদ্দুর এসে পড়বে কাঁচের ভিতর দিয়ে। —তোমার ঐ বৃহদাকার বনস্পতির পাতার ফাঁক দিয়ে শত ধারায় ঝরে পড়বে সকালবেলার আলো, ভোরের সেই রৌদ্র স্নানটি আমার মত সুন্দর হবে। কেন তুমি এখানে আসতে চাইছিলে না ?" এই অনুষঙ্গে কিরণবালা সেনকে লেখা একটি চিঠি উল্লেখ করি।

মংপু

কল্যাণীয়াসু,

তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুশি হলুম। সেদিন আমার কণ্ঠস্বর ছড়িয়ে ছিল অনেক দূরে - রেডিয়ো ওয়ালারা সতর্ক ছিল কোন বাধা ঘটতে দেয়নি পথে। ওরা এত করে উদ্যোগ করেছিল যে সেইজন্যে আমি ও আমার বাণীরচনা করতে আলস্য করিনি। এ জায়গাটি ভালো লাগছে—বেশ নির্জন—বেশি বৃষ্টি নেই—যথেষ্ট আলো — সামনেই হিমালয়ের শুভ্র কিরীট মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যায়। বর্ষা যখন নামবে তখন বর্ষা মঙ্গলের কবিও নামবে নিম্নভূমিতে, কেয়া ফুটবে কোপাইয়ের ধারে, আমার দ্বারের কাছে শিমুল শাখা থেকে মালতীলতা পুষ্প বৃষ্টি করবে। ইতি ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫

রবী-দ্রনাথ ঠাকুর

৮ জুন সন্ধ্যেবেলা প্রবল ঝড় উঠেছে। বাইরে বন্য বনস্পতিদের তাণ্ডব নৃত্য চলেছে। কাঁচের ঘরে জানালা বন্ধ করতে ঢুকে মৈত্রেয়ী দেবী দেখেন, কবি স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন বাইরের দিকে চেয়ে। কবি তাঁকে বললেন, "কলমটা দেবে ?" পরের দিন

সকালে যথারীতি ঘন্টা বাজল —ছুটলেন সকাল । কবি শোনালেন, নতুন কবিতা 'অধীরা'। কবিতাটি 'সানাই' কাব্যগ্রন্থে স্থান পেয়েছে । কবি 'অধীরা' কবিতার রূপকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মৈত্রেয়ী দেবীকে বলছেন, এ কিন্তু তোমার বেথুন ইস্কুলের বেণী-দোলানো অধীরা নয় — তা ব'লে দিতে হবে না তো বোকাদের জন্য ? কাল ঝড়ের প্রলয় মূর্তির দিকে চেয়ে চেয়ে মনে হচ্ছিল —এই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে এক চঞ্চলা অধীরা ছুটে চলেছে, সে বন্ধন মানে না, সে দুর্বার —

মানে না শাস্ত্র জানে না শঙ্কা
নাই দুর্বল মোহ
প্রভু শাপ 'পরে হানে অভিশাপ
দুর্বার বিদ্রোহ ।

সে বিদ্রোহিনী —

তাপসের তপ করে না মান্য
ভাঙে সে মুনির মৌন ।
মৃত্যুরে দেয় টিটকারি তার হাস্যে
মঞ্জীরে বাজে যে-ছন্দ তার লাস্যে
নহে মন্দাক্রান্তা—
প্রদীপ লুকায়ে শঙ্কিত পায়ে
চলে না কোমলকান্তা ।

সেই সমস্ত সংকোচ —আবরণহীন একটা সত্যমূর্তি প্রকৃতির আছে —সে চঞ্চলা অধীরা, সৃষ্টির বেদনা বহন ক'রে অনাদিকাল থেকে ছুটে আসছে, ..সে আসছে,

"নিলাজ ক্ষুধায় অগ্নি বরষে
নিঃসংকোচ আঁখি,
ঝড়ের বাতাসে অবগুণ্ঠন
উড্ডীন থাকি থাকি ।"

প্রত্যক্ষ নিসর্গের প্রভাব কবিতাটির উপর পড়েছে । কবি ঝড়ের আদিম রূপকে বর্ণনা করতে করতে আনমনে পাহাড় প্রকৃতিতে এসে পড়েছেন । কয়েকটি পংক্তি তুলে ধরা হ'ল :

"হু হু হুংকার ঝর্ঝর বর্ষণ,
সঘন শূন্যে বিদ্যুৎ ঘাতে
তীব্র কী হর্ষণ।
দুর্দাম প্রেম কি এ—
প্রস্তর ভেঙে খোঁজে উত্তর
গর্জিত ভাষ্য দিয়ে।"

মংপুতে অবস্থান কালে এই সময় আরো কয়েকটি কবিতা রচনা করেন, যেমন, পত্রোত্তর, রাজপুতানা, এবং মংপু পাহাড়ে।

পত্রোত্তর কবিতাটি ১৩৪৫ সালে ১৬ জ্যৈষ্ঠ রচনা করেন। পত্রোত্তর কবিতাটি ডাক্তার শ্রী সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তকে লিখিত এবং এটি সেঁজুতি কাব্য গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত। এই কবিতায় প্রকৃতির প্রভাব নেই, কবির অন্তরঈতা প্রকাশ পেয়েছে।

কবি ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ সালে মংপু থেকে 'রাজপুতানা' নামে আর একটি কবিতা লেখেন। কবিতাটি নবজাতক কাব্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কবিতাটিতে প্রত্যক্ষ পাহাড় চিত্র বা পাহাড় নিসর্গ নেই। কিন্তু রাজপুতানার চিত্র পরিবেশন করতে করতে কবির মংপু পাহাড়ের কথা ভাবছেন এবং তার ইমেজ পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন:

"ঐ তার গিরি দুর্গে অবরুদ্ধ নিরর্থ ভ্রুকুটি
ঐ তার জয়স্তম্ভ তোলে ক্রুদ্ধ মুষ্টি
বিরুদ্ধে ভাগ্যের পানে।"

আবার পাহাড়ে যে প্রতিধ্বনি শোনা যায়, তার ছবি ফুটে উঠেছে।

"জীবন মৃত্যুর দ্বন্দ্ব-মাঝে
সেদিন যে দুন্দুভি মন্দ্রিয়া ছিল তার প্রতিধ্বনি বাজে
প্রাণের কুহরে গুমরিয়া।"

মংপুতে কবির দিনগুলি সুন্দরভাবে অতিবাহিত হচ্ছে। ১০ ই জুন সুন্দর রোদ ঝলমল করে উঠল। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ কুয়াশা কেটে গিয়ে নির্মল নীল আকাশ। কবি বললেন, "এ যেন ঠিক বসন্তকাল, তেমনি ঝুর ঝুর করে বাতাস দিচ্ছে, অসময় এ বসন্ত ভারী সুন্দর।"

বিকেল বেলা যখন মৈত্রেয়ী দেবী সংবাদ দিতে গেলেন, একটা লেখা তাঁর হাতে দিলেন। বললেন, "এই লও, যতক্ষণ তুমি ঘুম লাগাচ্ছিলে, আমি ততক্ষণ এটা লিখে ফেলেছি। রয়ে গেল মংপুর একটা কবিতা —এখন তুভ্যং অহং সম্প্রদদে।" কবিতাটি ১০ ই জুন ১৯৩৮ সালে লেখা হল, নাম দিলেন —মংপু পাহাড়ে। কবিতাটি 'নবজাতকে' স্থান পেয়েছে। এই কবিতাটিতে পাহাড় প্রকৃতির প্রভাব স্পষ্ট। প্রথমেই তিনি লিখলেন,

"কুজ্ঝটিজাল যেই
সরে গেল মংপু-র
নীল শৈলের গায়ে
দেখা দিল রঙপুর।

কবি শ্রোতাবর্গকে জানিয়ে দিলেন E.B.R. -এর রংপুর নয়। বোকাদের জন্যে তা বলে দিতে হবে না তো?

কবি যে বাড়ীটায় ছিলেন, তার সামনে প্রকাণ্ড সেগো — পামের গাছ ঝুরি নামিয়ে দিয়েছে মালার মত। সে গাছটা ওঁর ভারি ভাল লাগল। মংপু পাহাড়ে তার প্রকাশ —

"ঐ গাছ চিরদিন যেন শিশু - মস্ত,
সূর্য-উদয় দেখে, দেখে তার অস্ত।"

মৈত্রেয়ী দেবী কবিতাটি সম্পর্কে বলেছেন যে, কবি পড়ে চল্লেন সামনের পাহাড়ের দিকে দেখিয়ে —

"ঐ ঢালু গিরিমালা, রুক্ষ ও বন্ধ্যা,
দিন গেলে ওরই 'পরে জপ করে সন্ধ্যা।
নিচে রেখা দেখা যায় ঐ নদী তিস্তার,
কঠোরের স্বপ্নে ও মধুরের বিস্তার।

সমগ্র অংশ থেকে কিছু অংশ তুলে নেওয়া হল। এই অংশে প্রত্যক্ষভাবে পাহাড় প্রকৃতির প্রভাব পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ মংপুতে এসে কথা প্রসঙ্গে মৈত্রেয়ী দেবীকে ঢালু পাহাড়ের কথা বলেছেন। ঢালু পাহাড় সুন্দর, তাও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এখানে রুক্ষ ও বন্ধ্যার কথা বলেছেন। পাহাড়ের সজীবতা ছাড়াও একটা রুক্ষ দিক আছে। হিমালয়ের অধিকাংশ অংশ বনানী পরিবেষ্টিত। দক্ষিণ ভারতের পাহাড়ের রুক্ষতা বেশী। এই রুক্ষতার ইমেজের সঙ্গে বন্ধ্যার সম্পর্ক গভীর। রুক্ষ পাহাড়ে রুক্ষের কথা এসে পড়ে।

সেই সঙ্গে তপস্যায় আবিষ্ট সন্ন্যাসীর প্রসঙ্গ । এখানে সন্ন্যাসীর চিহ্নমাত্র নেই । কবি সন্ধ্যাকে ঐস্থানে কল্পনায় এনেছেন । দিনের শেষে নি:সঙ্গ পাহাড় পরিবেশে রুক্ষ পাহাড়ে কেউ থাকে না, সেই কারণে মংপুর মত স্থানে সূর্যাস্তে সন্ধ্যার কল্পনা করেছেন । একটা বিষয়ে পরিষ্কার হওয়া গেল, জীবনের কোন ছোঁয়া নেই । অথচ পরের দুই চরণে কবি জীবনের প্রত্যাশার কথা তুলে ধরেছেন । তিনি মংপু থেকে তিস্তা নদীকে দেখতে পেয়েছেন এবং তা রেখার মত । নদী প্রকৃতই জীবনের প্রতীক । তারমধ্যে তিনি কঠোরের স্বপ্ন ও মধুরের বিস্তার দেখতে পেয়েছেন । পাহাড়ের অতি বর্ষা বন্যার কারণ হয়ে দেখা যায় এবং সমতলের বিপদ ঘটে । সাধারণত নদী মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত । "লই তো জীবন । নদীর কাছে খানের বোঝা অপরিসীম । কবি তাই মধুররূপে দেখেছেন ।

এই কবিতাটির শেষের কয়েকটি চরণ উল্লেখ করি ।

> "এই গিরিতটে এই নীলিম অরণ্যে,
> এখনো চলিবে খেলা নাই যার মুক্তি
> বার বার ঢাকা দেওয়া বার বার মুক্তি ।"

আজও এই গিরিতটে মেঘ রৌদ্রের খেলা চলেছে, নীলিম অরণ্যের নীলিমা ম্লান হয়নি তা জানি । নির্মম প্রকৃতি হাসি মুখে চেয়ে আছে, জানে না তার দর্শক নেই—তবু আজও মনে করতে চাই শেষ ক্ষয় হয়নি, ভরা পাত্র শূন্য নয় —

> "এ জীবনে পাওয়াটারই সীমাহীন মূল্য
> মরণে হারানোটা নহে তার তুল্য ।"

মংপু পাহাড়ের পারিপার্শ্বিকতা কবিকে আপ্লুত করে রেখেছিল । তিনি অমিয় চক্রবর্তীকে একটি চিঠিতে অনেকগুলি সিরিয়াস কাজের কথা লিখছেন । কিন্তু তার মধ্যে পাহাড় পরিবেশের কথা উল্লেখ না করে পারছেন না । অমিয় চক্রবর্তীকে ২৭মে ১৯৩৮ সালে লেখা চিঠিটি তুলে ধরা হ'ল ।

২৭ মে ১৯৩৮

মংপু,
দার্জিলিং

কল্যাণীয়েষু,

তুমি কি গ্রীক তর্জমার বই আমাকে পাঠিয়েছ ? এখনো পাইনি, পেলে স্বাদ গ্রহণ করব । মিসেস সেলিগম্যানের রচনাটা পড়ে ওটা আমার পক্ষে দু:সাধ্য-

কেননা সম্প্রতি আমার চোখের দৃষ্টি ক্রমে ক্ষীণ - হয়ে আসচে । সেই জন্যে নিতান্ত দায়ে না পড়লে চোখ ব্যবহার করতে সাহস হয় না । এমন কি বড়ো চিঠি অনিলকে দিয়ে পড়িয়ে নিতে হয় —বিশেষত অপরিচিত হাতের অক্ষর । চোখের কাজ অনেক হয়ে গেছে , এখন কিছু বাঁচিয়ে রাখতে চাই ছবি আঁকার জন্যে । চিত্রলেখার সঙ্গে আমার মিলন হোলো গোধূলি লগ্নে । আসন্ন রাত্রির মুখে , ভেবেছিলুম যাকে বলে হানিমুন , নির্জনতায় তাকে সম্ভোগ করা যাবে – তাকে আচ্ছন্ন করচে কাজে এবং জনতায়-এদিকে চোখের জ্যোতি ম্লান হয়ে আসচে ।

ম্যাকনিকলের ঈশোপনিষদের তর্জমা আমার ভালো লাগল না । ঐ উপনিষদটি আমার সবচেয়ে প্রিয় —ওর মধ্যে তত্ত্বের গভীরতা আশ্চর্য্য গভীর । কিন্তু অনুবাদক এর অন্তরে প্রবেশ করতে পারেন নি । দেখা হোলে বলব—আরো অনেক কথা বলবার আছে । আমরা নামব জুলাইয়ের আরম্ভে । যদি তার আগেই তোমরা আস এখানে একবার আসতে পারো । ইতি ২৭।৫।৪৫ (১৯৩৮)

তোমাদের
~~সমাজের~~
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দ্বিতীয় পর্ব :

পুরী থেকে কবি এবার মংপুতে এলেন ১৪মে ১৯৩৯ তারিখে । তাঁর আসার খবর আগেই জানাজানি হয়ে গিয়েছিল । সেকারণ শিলিগুড়ি ষ্টেশনে ভিড় । বিশ্বকবির সঙ্গে জনজীবনের যোগ ছিল । কবিকে দেখার আনন্দ অপার । তাঁর স্পর্শে অনেকে ধন্য ; কত মূককে তিনি ভাষা দিয়েছেন , কত অকথিত কথা তিনি বলেছেন , সে কথা আমাদের জানা । তাঁর শরীরী উপস্থিতি , ক্ষণিকের দর্শনে মানুষের মন ভরে উঠবে । তিনি সহজেই মানুষের হৃদয়ে ফুল ফোটাতে পারতেন । জড় মৃত্তিকার মধ্যে যেমন ফুল ফুটে উঠে –

নিঃশ্বাসে তার নিমেষেতে

ফুল যেন চায় উড়ে যেতে
পাতার পাখা মেলে দিয়ে
হাওয়ায় থাকে লোটাতে

সকাল সাড়ে ন'টায় নর্থ বেঙ্গল এক্স প্রেস শিলিগুড়িতে ঢুকল । জনতার শুভেচ্ছা নিয়ে

কবি মংপুতে এসে যখন পৌছলেন তখন দুপুর হয়ে গেছে। তাঁর এখানে সময় সুন্দর-ভাবে কেটে যায়। তিনি সন্ধ্যেবেলা একটা চৌকিতে বসতেন, সামনের পাহাড়ের গায়ে একটি একটি ক'রে আলো জ্বলে উঠত। এইটি ওঁর ভারী ভালো লাগত দেখতে। অন্ধকারে সমস্ত ঢেকে গেছে, একাকার হ'য়ে গেছে আকাশ আর পাহাড়। শুধু মাঝে মাঝে ছোট ছোট দীপবর্তিকা দূর অদৃশ্য জীবনের বার্তা বহন ক'রে আনছে। বলতেন, "আশ্চর্য্য লাগে ভাবতে ওখানেও মানুষের জীবন যাত্রা চলেছে। এই রকম ছোট ছোট তাদের ঘর; কী রকম তারা মানুষ, কী রকম তাদের জীবন যাত্রা, কিছুই জানি নে, শুধু গভীর অন্ধকারের মধ্যে এতটুকু এতটুকু আলো, প্রাণের আলো।"

রবীন্দ্রনাথ মংপুর প্রকৃতিকে ভালবেসেছেন। খুব সকালে তিনি কাঁচের ঘরে বসে আছেন। তিনি মৈত্রেয়ী দেবীকে প্রশ্ন করছেন, "তোমার এই হলদে ফুলের সারিটি কি-চু অতি অপরূপ হয়েছে, আমি এতক্ষণ বসে দেখছিই দেখছিই। কি ফুল এ? কোনো অভিজাত বংশীয়া নিশ্চয়।" "মোটেই নয়, বন্য লিলি, একেবারে বন্য।' মৈত্রেয়ী দেবী বললেন। কবি " এ কি-চু ফুলের রাজ্য, ফুলের দেশ।"

মৈত্রেয়ী দেবী, "কি-চু এখন মোটেই ফুলের সময় নয় —মার্চ—এপ্রিলে এখানে ফুল দেখবার মত হয়। এখন তো বাগান শূন্য আমার।"

কবি, "এই যা করেছ এর জন্যেই আমি grateful madam — I am grateful to you. শুধু যদি দয়া ক'রে তোমার চাকরদের বুঝিয়ে দাও এমন ক'রে একটা পাত্রে এত ফুল না গুঁজে দেয়; ওই দেখনা, মহাদেব এই মাত্র ঐ ফুল গুলো রেখে গেল। এতগুলোকে এক সঙ্গে গুঁজে দিলে ওদের প্রত্যেকের জাত মারা হয় —ওতে সকলেরই বিশিষ্টতা নষ্ট হয়, আর সকলকে মিলিয়েও এমন কিছু একটা সার্থক সৌন্দর্য সৃষ্টি হ'য়ে ওঠে না। জাপানীদের ফুল সাজান এত সুন্দর, কারণ সে ভারি Simple ওরা একটা পাত্রে একটি মাত্র ফুল রাখে, তাই সেটিকে দেখা যায় পরিপূর্ণ রূপে। সেই একটিই যথেষ্ট হ'য়ে ওঠে।" তাঁর এই কথাগুলো, প্রকৃতি পরিবেশ তাঁকে যে মোহিত করেছিল, তারই দৃষ্টান্ত।

কবি সমস্ত দুপুর ধরে একটা লেখা লিখছিলেন —পাঁচ ছ'বার সে লেখা হ'ল। তারপর অনেক পরিবর্তন করেন ঐ কবিতাটির। নাম দিলেন—'পরিচয়'। লেখার তারিখ ১৩ জুন ১৯৩৯।

ডা. মনোমোহন সেনের কোয়ার্টার

কবি ৮ জুন দুটি কবিতা লিখলেন । কবিতাগুলো সাড়ে নটা ও স্মৃতির ভূমিকা । সাড়ে নটা কবিতাটিতে প্রকৃতি প্রভাব লক্ষণীয় । কবিতাটির নামের সঙ্গে মিল রয়েছে প্রারম্ভে ।

পাহাড় প্রকৃতির ছায়া স্পষ্ট :-

"পাহাড়ের উপত্যকা -নিচে
বনের মাথায়
সবুজের আম-ত্রণ-বিছানো পাতায় ।"

কবি সকালের মৃদু শীত, উপলব্ধি করছেন এবং তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে রোদ পোহাচ্ছেন । মংপুতে তখন সকলে সাড়ে নটা ।

তিনি পাহাড় ও সবুজের আম-ত্রণ যেমন জানাচ্ছেন, তেমনি তার প্রতিকূল বিপদের ইঙ্গিত এই কবিতায় তুলে ধরেছেন ।

"গিরি নদী সমুদ্রের মানে কি নিষেধ,
করিয়াছে ভেদ
পথে পথে বিচিত্র ভাষায় কলরব,
পদে পদে জন্ম-মৃত্যু বিলাপ-উৎসব ।"

প্রকৃতির অপরূপ লাবণ্যে মর্ত্যবাসীরা আনন্দ, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এমন কি জীবন ধারণের সব কিছুই পেয়ে থাকে । উদার প্রকৃতি নিঃশব্দে বিনাসর্তে সব দান করে যায় প্রাণী কুলের । প্রকৃতির উপর অত্যাচার বহু প্রকারে হয়ে থাকে । সতত মনে হয়, অতীব অত্যাচারের ফল মর্ত্যবাসী প্রাণীকূল পেয়ে যায় । চড়াই উৎড়াই পাহাড় অতিক্রম করতে করতে অসাবধানবশত অনেকে খাদে পড়ে যায় । আবার গাড়ি খাদে পড়লে সেই একই বিপদ । সমুদ্র ও নদীর হাতছানি এমনই । সব সময় বিপদ হতে পারে । এই কারণে প্রকৃতির আশ্রয়ে আনন্দ ও বেদনা দুটিই লক্ষ্যণীয় । ভালবাসা ও মরণ এই দুটিকে কবি জন্ম-মৃত্যু বলে আখ্যা দিয়েছেন । তাঁর কল্পনা শক্তি এত প্রবল এবং বাস্তবমুখী যে, যাঁরা পাহাড়ের রাস্তায় নিত্য নৈমিত্তিক যাতায়াত করেন, তাঁরা জানেন পাহাড়ের ধস খেলা মৃত্যুর আম-ত্রণ ছাড়া অন্য কিছু নয় । তবু বলতে হয়, প্রকৃতির আম-ত্রণকে অস্বীকার করবার উপায় নেই । রবী-দ্রনাথের কাছে পাহাড় ও সমুদ্র দুই-ই খুব ভাললাগার বিষয় ।

কবি ৮ জুন সকালে মৈত্রেয়ী দেবীকে বলছেন, "এই কবিতাটা copy ক'রে ফেল, তোমার মংপুর সকাল বেলার একটা ছবি। আজ সকালে হঠাৎ একটা প্রজাপতি আমার চুলে এসে বসল।" কবিতাটি স্মৃতির ভূমিকা' সানাই কাব্যে স্থান পেয়েছে। সাড়ে নটা' কবিতাটির সঙ্গে অনেকাংশে সাদৃশ্য বিদ্যমান। একই দিনে কবিতা দুটি লেখা। কিছু অংশ তুলে ধরা হ'লে।

"সাড়ে নটা বেজেছে ঘড়িতে;
সকালের মৃদু শীতে
তন্দ্রাবেশে হাওয়া যেন রোদ পোহাইছে
পাহাড়ের উপত্যকা-নিচে
বনের মাথায়".....(সাড়ে নটা)

আবার "আজি এই মেঘমুক্ত সকালের স্নিগ্ধ নিরালায়
অচেনা গাছের যত ছিন্ন ছিন্ন ছায়ার ডালায়
রৌদ্রপুঞ্জ আছে ভরি।
সারাবেলা ধরি
কোন পাখি আপনারি সুরে কুতূহলী
আলস্যের পেয়ালায় ঢেলে দেয় অস্ফুট কাকলি।"
(স্মৃতির ভূমিকা)

সাদৃশ্যের প্রসঙ্গ তুলে বলা যায়, কবি বিশেষ পরিবেশকে সারাদিন ভুলতে পারছেন না। তাই পাহাড়ে প্রকৃতির ইমেজ শুধু তাঁর কবিতার মধ্যে এসে পড়েছে। একটা বিষয় লক্ষ্য করা গেল, সকাল বেলা যে কল্পনার রঙ তাঁর মধ্যে খেলা করেছে, তারই অনুরণন সমস্তদিন তিনি বয়ে চলেছেন। আসলে প্রকৃতির অনুপম চিত্রকে প্রত্যক্ষ থেকে পরোক্ষে আনতে পারছেন না। প্রকৃতি প্রেমিক রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এটা আশা করা অন্যায় হবে না। 'স্মৃতির ভূমিকা' কবিতায় তাঁর আত্ম ভাবনা প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। জীবনের শেষ পাদে এসেও কবি রোমান্টিক, তাঁর কল্পনার জাল কত ঘনবদ্ধ। মংপু পাহাড়ের চিত্র 'সরাসরি কবিতায় এসে পড়েছে।

"ধরা পড়ে যায় পাছে, আমি নই পাছের দলের,
আমার বাণী সে নহে ফুলের ফলের।

চেয়ে দেখি ঘন হয়ে কোথা নেমে গেছে ঝোপঝাড় ;
সম্মুখে পাহাড়
আপনার অচলতা ভুলে থাকে বেলা—অবেলায়,
হামাগুড়ি দিয়ে চলে দলে দলে মেঘের খেলায়।
কোথা শুষ্ক জলধারা
শব্দহীন রচিছে ইশারা
পরিশ্রান্ত নিদ্রিত বর্ষার। নুড়িগুলি
বনের ছায়ায় মধ্যে অস্থিসার প্রেতের অঙ্গুলি
নির্দেশ করিছে তারে যাহা নিরর্থক,
নির্ঝরিণী-সর্পিণীর দেহচ্যুত ত্বক।
এখনি এ আমার দেখাতে
মিলায়েছে শৈলশ্রেণী তরঙ্গিত নীলিম রেখাতে
আপন অদৃশ্য লিপি। বাড়ির সিঁড়ির 'পরে
স্তরে স্তরে
বিদেশী ফুলের টব, সেথা জেরে নিয়মের গন্ধ
গুমিয়া নিয়েছে মোর ছন্দ
এ চারিদিকের এই—সব নিয়ে সাথে
বর্ণে গন্ধে বিচিত্রিত একটি দিনের ভূমিকাতে
এটুকু রচনা মোর বাণীর যাত্রায় হোক পার
যে কদিন তার ভাগ্যে সময়ের আছে অধিকার।"

দীর্ঘ উদ্ধৃতি তুলে ধরা হল এই কারণে যে, কবি চিন্তাভাবনা সবটা পাহাড় ও তার পরিবেশ ঘিরে। তিনি মংপুতে মৈত্রেয়ী দেবীর অতিথি হয়ে ছিলেন। অথচ অবসরে তিনি ঘন বৃক্ষলতাপাতাকে নেমে যেতে দেখছেন। সমুখে ও পাহাড় দেখছেন। দিবারাত্র পাহাড়ের সঙ্গে মেঘের খেলা, একমাত্র পাহাড়ে থাকাকালীন দেখা যায়। পাহাড় থেকে দূর নীচে শুষ্ক জলধারাকে দেখছেন। কেননা তখনও বর্ষা নামেনি। তবে বর্ষার ঘুম যে ভেঙে যাবে, সে ইঙ্গিত কবি পেয়েছেন। ছোট বড় পাথর ইতস্তত ছড়ানো, সেগুলি কবি ভূতের কঙ্কালের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আর নীচের স্রোতস্বিনীকে

সঙ্গিনীর দেহের খোলস রূপে কল্পনায় এনেছেন। তাঁর সার্থক চিত্রকল্প আরো দেখা গেছে। দূরের পাহাড় ঢেউ এর আকার ধারণ করে আরো দূরে চলে গেছে। শীতকালে অথবা বর্ষার পরে পাহাড় ঘন নীল রূপে দেখা যায়। কবি সেই চিত্র এখানে তুলে ধরেছেন। পাহাড়ের এই মনোরম দৃশ্য ভুলবার নয়। তাঁর আশ্রয়ের সিঁড়ির ধারে রাখা ফুল গাছের ফোটা ফুলের গন্ধ কে তিনি ভুলতে পারছেন না। তাঁকে ছন্দময় করে তুলেছে মূক প্রকৃতি। কবি প্রকৃতির সাম্রাজ্যে আত্মমগ্ন। সরাসরি এমন দৃষ্টান্ত এবং ব্যক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার ছবি মিলে না। সেদিক থেকে স্মৃতির ভূমিকা - স্মৃতিময় হয়ে থাকার পক্ষে যথেষ্ট তাঁর কাছে।

কবি "মূঢ় ম্লান মূক মুখে" ভাষার সন্ধান পেয়েছেন। চারিদিকের এই বিশাল পরিবেশে তিনি পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে উপলব্ধি করেছেন। এই অনুভবের প্রত্যয় তাঁর একদিনের ছলে ও তা তাঁর স্মৃতির ভূমিকায় চির কালের। তিনি যতদিন বাঁচবেন, ততদিন এই ভার বহন করে চলবেন।

১ জুন ১৯৩১ তারিখে 'মানসী' কবিতা রচনা করেছেন। এই কবিতায় সমতল প্রকৃতির কথা তুলে ধরেছেন। তাঁর প্রত্যক্ষ পাহাড় প্রকৃতি থেকে অন্যচিত্র। তবু 'মানসী'র একটা চরণ, "অরণ্যে নিবিড় শ্যাম নীলিমার নিম্নান্তের পটে" এর সঙ্গে 'স্মৃতির ভূমিকা' কবিতা একটি চরণ "মিলায়েছে শৈলশ্রেণী তরঙ্গিত নীলিম রেখাতে" সাদৃশ্য রয়েছে। আসলে প্রকৃতি ভাবনায় কবির ফসল।

তিনি মৈত্রেয়ী দেবীকে বলছেন, "দেখ আমি কখনই তোমাকে একথা বলব না, কিছুতেই না, সত্যি হ'লেও না, মনে হ'লেও চেপে যাব।"

রজনী শাঙন ঘন
ঘন দেয়া বরিষণ
ঝিম ঝিম শরদে বরিষে।
রজনী শাঙন ঘন ....."

কাঁচের ঘরে চলে এলুম তোমরা উঠে যেতেই, ভাবলুম বৃষ্টির শব্দ শুনব বসে বসে। কী ঘোর বর্ষাই নেমেছে। কিন্তু বিধাতা তো পথ বন্ধ করেছেন; তুমি এমন এঁটে দরজা বন্ধ করেছ। তাই বসে কুঁড়েমি করছি আর ভাবছি – রজনী শাঙন ঘন,

ঘন দেয়া বরিষণ ।" কবির টুকরো টুকরো কথায় এই পরিবেশের কথাও ব্যক্ত হয়েছে ।

রবী-দ্রনাথের লেখায় প্রকৃতির প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে । কি-তু পরিবেশ কবি ও তাঁর সঙ্গীদের কতখানি প্রভাবিত করেছিল, বিশেষ করে কবিগুরুর মনে ও প্রাণে এই পরিবেশ সাড়া জাগিয়েছিল, আলাপ আলোচনায়, কথায় তার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় । সুরচিত রচনা না হলেও সংস্কৃত বাণী তাঁকে আপ্লুত করেছে, তার দৃষ্টা-ত তুলে ধরা হল ।

কবি বলছেন, "যাই বল কুমার সম্ভবের ওই তৃতীয় সর্গটি ছাড়া আর কোনোটা সাহিত্য নামের যোগ্য নয় । ওই একটি সর্গ ভালো, খুব ভালো —

আবর্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং বাসোবসানা তরুণার্করাগং
পর্য্যাপ্ত পুষ্প স্তবকাবনম্রা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব ।

কি-তু ভালো নয় ঐ হিমালয়ের বর্ণনা, তা বলতেই হবে । এত আর্টিফিসিয়াল ভাবতে আশ্চর্য লাগে, কি করেই বা মহাকবি লিখলেন, কি করেই বা লোকের ভালো লাগত এত, বিশেষ ক'রে যাঁরা কাব্য রসিক । কি, না, "ভিন্ন শিখ-ডী বই : "কী কবিত্ব -ময়ূরের পুচ্ছ চেরার মতই অতি সূক্ষ্ম কবিত্ব । যত ধনরত্ন, কিন্নর কিন্নরী, এই কি হিমালয়ের বর্ণনা ! সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্যই বড় বেশি রকম আর্টিফিসিয়াল, ইনিয়ে বিনিয়ে বানিয়ে লেখা ।"

মলুতে বসে কবি নিসর্গের প্রকৃতরূপ অবলোকন করছেন, ফলে সংস্কৃত সাহিত্যের আর্টিফিসিয়াল বর্ণনা এবং তার রূপ কে সহজেই তুলনামূলক ভাবে দেখতে পারছেন । বিশ্বকবি প্রত্যক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর কাছে কুমার সম্ভবের বর্ণনা নিষ্প্রভ । সংস্কৃত সাহিত্যের তুলনাকে পরোক্ষ প্রভাব পর্যায়ে ফেলা যায় ।

কবির মংপু অবস্থানকালে একদিন গ্রামোফোনে তাঁর অনেকগুলি গান বাজানো হল । তিনি ঐ গানগুলির সঙ্গে সঙ্গে গাইলেন, "গগনে গগনে আপনার মনে কী খেলা তব ', 'জটার গভীরে লুকালে রবিরে, ছায়া পটে আঁকো এ কোন ছবিরে ।" আমি তোমায় যত শুনিয়ে ছিলাম গান ।" ইত্যাদি । গানগুলি তাঁর গাওয়ার পরে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, তাঁর ওখানকার কথা মনে পড়বে কি না ? কবি তার উত্তর হেসেই দিলেন, "তা পড়বে, সত্যিই পড়বে সামনের পাহাড়ের বুকে সবুজ বন্যা, ওই

উদ্ধত গাছ, দূরের পথে পাহাড়িয়াদের যাতায়াত, —সিঁড়ির টবের জিরেনিয়াম, সন্ধ্যেবেলা আলো জ্বেলে ইঙ্গিত। সবই মনে পড়বে।"

মৃদু হেসে আরো বললেন, "জানি, মংপু আমার মনে থাকবে —

"সেই কথাটি কবি পড়বে তোমার মনে।
বর্ষা মুখর রাতে ফাগুন সমীরণে।"

এই মাত্র মনোমোহন এসেছিলেন, আলুর সাহায্যে আমায় বুঝিয়ে গেলেন যে সেপ্টেম্বর মাসটা এখানে খুব ভাল, সবচেয়ে ভাল, তার অল্প পরেই না কি চেরি ফুল ফোটে তোমাদের পাহাড়ে? Cherry ripe, Cherry ripe, Cherry ripe, a full and fair one come and try! চেরী ফুল যখন ফোটে তখন তোমাদের সুসজ্জিত অরণ্যানী দেখবার মত হয়। তোমার বাড়ীতে আছে চেরী গাছ?"

মৈত্রেয়ী দেবী বললেন, "বাড়ীতে আছে, সে বিশেষ কিছু নয়, কিন্তু রাস্তার দুধারে যে গাছের সারি একসঙ্গে সব ফুটে ওঠে — ।"

কবি, "হ্যাঁ, একসঙ্গে অনেক না হ'লে চেরীর রূপ ঠিক ফোটে না। সে সময় ঘরে আগুন জ্বালো? log fire? বেশ লাগে দেখতে আগুন। আসা যাবে সেপ্টেম্বরে, দেখব মংপুর মেঘমুক্ত অবগুন্ঠনহীন মুখ।"

রবীন্দ্রনাথের মংপু ভাললাগা, প্রকৃতির আকর্ষণের প্রসঙ্গ নিয়েই ঐ কথোপকথন তুলে ধরা হল। তাঁর এই ভাল লাগাই তো সাহিত্যে স্থান পেয়েছে।

মৈত্রেয়ী দেবী একটা বিশেষ মুহূর্তের ছোট বর্ণনা দিচ্ছেন। সেদিন সন্ধ্যেবেলা আর পড়া হয়নি। বারান্দায় মাঝখানে চৌকি টেনে এনে বসেছিলেন। ক্রমে রাত্রি হয়ে এল, বৃষ্টি থেমে কুয়াশার বন্ধন মোচন ক'রে পাইন গাছের আড়ালে হোলো চন্দ্রোদয়। মৃদু জ্যোৎস্নায় সামনের পাহাড়ের আঁকা বাঁকা সীমান্ত রেখা ফুটে উঠেছে। নিবিড় নিস্তব্ধতার মাঝখানে শুধু বিরামহীন ঝিঁ ঝিঁর ডাক। বহুক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে বসেছিলেন, তারপর বল্লেন — "না, মানতেই হয় এ জায়গাটা বড় নির্জন। তোমাদের বয়সের পক্ষে বড় বেশী নির্জন। এই রকম সন্ধ্যায় দিনের পর দিন যদি একা বসে থাকতেই হয়, তবে তার বেদনা, তার ভার মনকে ক্লান্ত করতে পারে।"

কবির এবার যাবার সময় উপস্থিত। ঠিক হয়েছে রিয়াং থেকে ট্রেনে ফিরবেন। সঙ্গে মৈত্রেয়ী দেবীরা যাবেন। নদীর পাশ দিয়ে ট্রেনের পথ অনেক সুন্দর। এই ট্রেনের

Teesta Valley Extension.

Trains between Siliguri and Gielle Khola.

UP.

Mile from Siliguri.	Intermediate distance.	STATIONS.			Code Initials.	Daily.	As Ordered.			
						41 Up Mixed.	43 Up Goods.	45 Up Goods.	47 Up Goods.	49 Up Goods.
		E. B. Ry. Train	...	Arr.	.....	6 30	.....	.....	.....	.....
...	...	SILIGURI ...	...	EW Dep.	SGU	6 45	5 15	9 30	12 40	16 30
½	½	Siliguri Road Jn.	...	...	SGUR	6 47 6 49	pass 5 18	pass 9 32	pass 12 42	pass 16 33
11	10½	Sevoke Forest Siding	...	...	FTS	pass 7 22	pass 5 59	pass 10 4	pass 13 15	pass 17 14
13	2	Sevoke ...	...	...	SVQ	7 40 7 45	6 14 6 24	10 15 10 29	13 25 13 29 **46**	17 29 **48** 18 20 **42**
14	1	13½ Mile ...	...	W...	.....	7 50 7 55	6 35 6 42	10 32 10 38	13 40 13 47	18 31 18 38
17	3	Kalijhora Siding	...	...	KJFS	pass 8 13	pass 6 58	pass 10 54	pass 15 3	pass 18 54
23½	6½	Billi Siding ...	...	...	RIL	8 54 9 1	pass 7 42	11 38 11 45	pass 15 47	pass 19 38
24½	½	Riyang ...	...	W...	RYN	9 6 9 15 **44**	7 47 7 57	11 50 12 0 **46**	15 52 **48** 16 41 **42**	19 43 19 51 **50**
29	4½	GIELLE KHOLA	...	W Arr.	GEKA	9 45	8 27	12 30	17 11	20 21

DOWN.

Miles from Siliguri.	Intermediate distance.	STATIONS.			Code Initials.	Daily.	As Ordered.			
						† 42 Down Mixed.	* 44 Down Goods.	46 Down Goods.	48 Down Goods.	50 Down Goods.
29		GIELLE KHOLA	...	WDep.	GEKA	16 0	8 40	11 15	15 15	18 45
24½	4½	Riyang ...	...	W...	RYN	16 30 16 40 **47**	9 10 **41** 9 20	11 45 **45** 11 55	15 45 **47** 15 55	19 15 **49** 19 44
23½	½	Billi Siding ...	...	...	RIL	16 45 17 5	9 25 9 30	12 0 12 5	pass 16 0	pass 19 49
17	6½	Kalijhora Siding	...	...	KJFS	pass 17 49	pass 10 12	pass 12 49	pass 16 44	pass 20 33
14	3	13½ Mile ...	...	W...	.....	18 0 18 7	10 28 10 34	13 5 13 12	17 0 17 7	20 49 20 56
13	1	Sevoke ...	...	...	SVQ	18 18 18 23 **49**	10 45 10 55	13 24 13 30 **47**	17 18 17 30 **49**	21 07 21 11
11	2	Sevoke Forest Siding	...	...	FTS	pass 18 41	pass 11 6	pass 13 40	pass 17 45	pass 21 26
½	10½	Siliguri Road Jn.	...	...	SGUR	19 0 19 5	pass 11 40	pass 14 15	pass 18 26	pass 2 7
...	½	SILIGURI ...	...	EW Arr.	SGU	19 10	11 45	14 18	18 29	22 10
...	...	*E. B. Ry. Train*	...	Dep.	.....	21 0	.....	.....	.....	.....

*When 45 Up is running, 44 Down will not run.

†From 1st June to 30th September, 42 Down will leave GEKA at 15-30 arriving SGU 18-38 hrs.

লাইনটি বর্তমানে নেই । অনেকদিন আগেই উঠে গেছে । এটি গেলে খোলা থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত ছিল । কবি ও তাঁর সঙ্গীরা বিকাল ৪-৩০ মি: শিয়ালদহ স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠেন এবং শিলিগুড়ি স্টেশনে এসে পৌছান-সন্ধ্যা ৭-১০ মি: । তারপরে E.B. Rly trains - রাত ৯ টায় ।

শিলিগুড়িতে পৌছবার পর - খবর ছড়িয়ে পড়ল । প্ল্যাট ফর্মে লোক ধরে না । কবিকে দেখার জন্য ভিড় । ইস্কুলের ছেলেমেয়ে, শিশু যুবা, বৃদ্ধ এমন কি অবগুণ্ঠন-বতীরা ঠেলাঠেলি করে দাঁড়ালেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন । সারি সারি ছেলেমেয়েরা খাতা পেনসিল নিয়ে দাঁড়িয়ে অটোগ্রাফ নেবে বলে । কবি সকলের সঙ্গে অবশ্যই প্রীতি-নমস্কার বিনিময় করেছিলেন ।

তৃতীয় পর্ব :

রবী-দ্রনাথ ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ তৃতীয়বার মংপু এলেন । কবি সেপ্টেম্বরে মংপু আসবেন বলে গিয়েছিলেন, সত্য সত্যই তিনি কথা রাখলেন ।

মৈত্রেয়ী দেবীর বর্ণনায় জানা গেল একটা দিনের কথা । সেদিন সু-দর রোদ উঠেছে, আকাশে অল্প অল্প শরৎকালের মেঘ-মংপুর পক্ষে দিনটা ঈষৎ গরম বলা যেতে পারে । এখানকার কুয়াশার বন্ধন মোচন ক'রে যেদিন রোদ উঠত, রবী-দ্রনাথ খুব খুশী হয়ে উঠতেন । যথারীতি বারা-দার বড় চৌকিটাতে বসে, মৈত্রেয়ী দেবীরা সেখানে উপস্থিত ।

কবি বললেন, "আজ চমৎকার দিনটি হয়েছে । কেবল কুঁড়েমি করতে ইচ্ছে করছে, তাই এই চৌকিতে হেলান দিয়ে বসেই আছি, বসেই আছি ।" গান গেয়ে যেতে লাগলেন, -হে তরুণী, তুমিই আমার ছুটির কর্ণধার ।"

গানটি লিখলেন :

"হে তরুণী তুমিই আমার ছুটির কর্ণধার
অলস হাওয়ায় বাই চো সুপন তরী
নিয়ে যাবে কর্ম নদীর পার ।"

এই গানটির চরণগুলির মধ্যে ঐ দিনটির প্রভাব পড়েছে। অবশ্য পাহাড় পরিবেশের কুঁড়েমি বা অলসতার চিত্র উদ্ভাসিত।

বিকেল বেলা যখন মৈত্রেয়ী দেবীরা কবির কাছে এলেন, তাঁরা দেখলেন, লেখাটা প্রায় সবই বদল হয়ে গেছে এবং বিচিত্রিতভাবে আগেকার লেখাটিতে কালির আচ্ছাদনে মণ্ডিত ক'রে আঁকা হয়েছে সুন্দর একটি ছবি, তার ফাঁকে ফাঁকে নতুন লেখাটা এই রূপ :

"হে অদৃশ্য ছুটীর কর্ণধার
অলস হাওয়ায় দিচ্ছ পাড়ি
কর্ম নদীর পার।
দিগন্তের কুঞ্জবনে
অশ্রুত কোন গুঞ্জরণে
বাতাসেতে জলে বুনে দেয়
যদির তন্দ্রার।
নীল নয়নের মৌনখানি
সেই যে দূরের আকাশ বাণী
দিনগুলি মোর ওরই ডাকে
যায় ভেসে যায় বাঁকে বাঁকে
উদ্দেশহীন অকর্মণ্যতার।"

মণ্ডপুর চিত্র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ফুটে উঠেছে।

এই কবিতাটি অনেক পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত হতে হতে 'সানাই' কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে।

৩০ সেপ্টেম্বর তিনি মংপুতে বসে 'উদ্‌বৃত্ত' নামে আর একটি কবিতা লিখলেন। এই কবিতায় কবি জীবনের গভীরতর দিক তুলে ধরেছেন। নির্জন পরিবেশে থেকে কবির একাকীত্ব অনেক লেখায় ধরা পড়েছে। উদ্‌বৃত্ত কবিতায় শেষের চরণগুলি লক্ষণীয়।

যতটুকু পাই তীব্র বাসনার
অঞ্জলিতে
নাই বা উচ্ছলিল

সারা দিবসের দৈন্যের শেষে
সঞ্চয় সে যে
সারা জীবনের স্বপ্নের আয়োজন ।

এখানে তাঁর ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে । দিনের শেষে তাঁর প্রাপ্তির হিসাব নিকাশ করছেন । স্নেহ ভালবাসা বৈশাখের কৃশ নদীর মত তাঁকে পিপাসিত মনকে জাগাবে কি না, এটাই তাঁর প্রশ্ন ? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই তিনি সারাদিনের ক্লান্তির শেষে সারা জীবনের স্বপ্ন দেখতে পাচ্ছেন । কবিতাটি নিসর্গ প্রভাবিত নয় বটে, তবু কবিতাটির গভীরে মংপুর মত স্থানের একটা হাত রয়েছে, যেখানে বসে বিশ্বকবিই নিঃসঙ্গের অব্যক্ত কথা লিখতে পারেন ।

কবি কবিতা ছাড়া চিঠি লিখছেন । প্রমথ চৌধুরীকে লেখা একটি চিঠি উল্লেখ করি । এখানে সমতল প্রকৃতি পরিবেশের চিত্র ফুটে উঠেছে ।

পোস্টমার্ক, মংপু

কল্যাণীয়েষু,

প্রমথ বিশিকে একখানা পত্র লিখেছি । কি-তু ঠিকানা পাচ্চি নে । তুমি নিশ্চয় জানো । যথাস্থানে পাঠিয়ে দিয়ো ।

এখানে শরৎকালের দুর্গতির একশেষ ঘোর শ্রাবণ হিটলরের মতো এর করিডর অধিকার করে বসে আছে — একেবারে সারেন্ডার । আয়ু থেকে একটা শরতের আলো বাদ পড়লে ভালো লাগে না, কটাই বা আছে । কবির জন্যে তাকিয়ে রয়েছে শান্তিনিকেতনের শিউলি বন, আর সূর্যাস্তের আকাশ । ইতি ২।১০।৩৯

রবী-দ্রনাথ

অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা আর একটি চিঠি এই প্রসঙ্গে তুলে ধরি ।

২২ অক্টোবর ১৯৩৯

মংপু

কল্যাণীয়েষু

অমিয়, তোমার "চেতন স্যাকরা" আগেই পড়েছিলুম । পড়ে রীতিমতো ভালো লেগেছিল । কিছুদিন থেকে তোমাকে লিখব লিখব করছি সময় পেয়ে উঠিনি ।

তোমার এই লেখাটি আধুনিক কাব্যের একটি সেরা নিদর্শনরূপে দেখা দিয়েছে। কবিতা রচনায় যথেচ্ছ শৈথিল্যের দ্বারা যাকে সহজ দেখায় সে আবর্জনা, কি-তু যথার্থ যা সহজ তাই দু:সাধ্য তোমার এই লেখায় সেই দুরূহ সহজ অনায়াসের প্রতীতি নিয়ে দেখা দিয়েছে। তোমার এই কবিতায় আধুনিকের স্বরূপ আমি দেখতে পেলুম। নিজের চিরা-ভ্যস্ত রচনাধারার সঙ্গে তুলনা করে সেটা আমার পক্ষে বোঝা সহজ। পাহাড়ে আছি তাই পার্বত্য তুলনা মাথায় আসচে। দূরে পাহাড়ের শিখরের নীলিমার ভিতর থেকে দেখা যাচ্চে নির্ঝরের যাত্রা – সে স্বচ্ছ, সে নির্মল, সূক্ষ্ম আলোয় ছায়ায় রচিত তার উত্তরীয়। তার কলধ্বনিও লাগে ভালো, দৃষ্টির উপরেও তার প্রভাব আছে। সেই ঝরনা যখন নেমে এল নিম্নভূমিতে তখন সব কিছুর সঙ্গে মিলিয়ে সে বিচিত্র, কত ভাঙা চোরা কত খসে পড়া জিনিসকে সে টেনে নিয়ে চলেছে, কত আওয়াজ মিলচে তার কলস্বরে যার সঙ্গে তার সঙ্গতি নেই, কোথাও ফেনা উঠচে ফেনিয়ে, কোথাও পলি কোথাও কাদা ঘুলিয়ে উঠচে ফেনিয়ে, কোথাও বালি কোথাও কাদা ঘুলিয়ে উঠচে আর আবর্তে –এই সমস্ত কিছুকে আত্মসাৎ করে অতিক্রম করে তার ধারা তার চলমান রূপ, কিছুই তাকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করচে না, তার সমগ্রতাকে রক্ষা করচে, তার সঙ্গে অনায়াসে মিশিয়ে দিচ্চে তুচ্ছতা, সেই তুচ্ছতাকে উপহাস করবার উপলক্ষ্য ফেরার জন্যেই।

... ... ইতি বিজয়া। ১৩৪৬

তোমাদের

রবী-দ্রনাথ ঠাকুর

এই ভ্রমণ পর্বে রবী-দ্রনাথ 'শেষ কথা' নামে একটি ছোট গল্প রচনা করেন। গল্পটি দীর্ঘ। গল্পটি শেষ হয়ে গেলে, তিনি বল্লেন, "এখনকার গুলো গল্প গুচ্ছের মত নয় — গুলো বড় বেশি সাইকোলজিক্যাল হয়ে পড়ে। গল্প গুচ্ছের গল্প গুলো যেমন মানুষের প্রত্যহের ঘরোয়া জীবন নিয়ে গড়ে উঠেছে আজকাল আর সে রকম হয় না। আশ্চর্য লাগে আমার, কি ক'রে অত details মনে হোতো, লিখতুম কি ক'রে।" 'শেষ কথা' গল্প গুচ্ছ গ্রন্থের তিন সঙ্গীর অ-র্অত। রবী-দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, 'সাইকোলজিক্যাল 'এর ছোঁয়া আছে গল্পটিতে। কি-তু তিনি বর্ণনার অনেকক্ষেত্রে পাহাড়ী বৃক্ষ, ঘন বন এমন কি নির্জনতার কথা বলেছেন। এই রকম চি-তায় নিসর্গের প্রভাব

সরাসরি পাওয়া যাবে না। তবে কবির সামনে ঘন বনরাজি, নিঃশব্দ তাঁকে যে সবসময় আপ্লুত করে রাখে, সেকথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। বিশ্বকবির কলমে, উপস্থাপনায় সরাসরি প্রভাব থাকবে, এমন আশা করা যায় না। কেননা চিন্তার সূতো বহু দূর বিস্তৃত, তাঁর জীবনবোধ এবং দৃষ্টিশক্তি অনেক প্রখর। ইন্দিরা দেবীকে একটা চিঠি লিখছেন এখান থেকে। মংপুর জলহাওয়া ও অন্যান্য বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে।

মংপু

কল্যাণীয়াসু,

তোদের বিজয়ার প্রণাম না পেলে মনে হয় পাঁজির ভুল হয়েছে, এবারে তাই সন্দেহ হচ্ছিল এমন সময়ে তিথির পরিচয় নিয়ে জিনিসটা পৌঁছল আমার হাতে।

পাহাড়ের শুশ্রূষায় ভালো থাকবারই কথা, এবারে ছিলুম না। এখানকার জল হাওয়ায় উপদ্রব ঘটেছিল, যাকে বলে হিটলারের ছোঁয়াচ। সময় হোলো বিদায় নেবার, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে অক্ষম। ৫ই নবেম্বরে অবতরণ করব নিম্নভূমিতে। দুচারদিন কলকাতায় যখন থাকব দেখা হবে। রথীর শরীর এখানে এসে ভালো হয়েছে। বৌমা পুপু সহ বোম্বাইয়ে। আশা করি যখন ফিরব তিনি আমার ভার গ্রহণ করতে আসবেন।

প্রমথর বই ছাপা চলচে। তোর লেখাটা পরিচয়ের হাত থেকে উধার করে ছাপতে দেব।

জয়ার তিন সন্ততির নাম দিতে পারিস মঞ্জরী, গুঞ্জরী আর রঞ্জন।

আমার কোটরে ফিরে গিয়ে বেদগানে সুর দেবার চেষ্টা করব। ইতি ২৫।১০।৩৯

রবিকাকা

চতুর্থ পর্ব :

রবীন্দ্রনাথ ১৯৪০ সালে ২১ এপ্রিল চতুর্থবার মংপু এলেন। তাঁর দিনগুলি লেখাপড়ায়, হাসি ঠাট্টায় কেটে যায়। দৈনন্দিন জীবনের যে মাপ সেই মতই তিনি চলেন। একদিন একটা গদ্য ছন্দে কবিতা লেখা হয়েছে, সন্ধ্যেবেলা সেটা পড়া হোলো, তারপর আধুনিক কবিতা নিয়ে আলোচনা চলল। "তোমরা জান না

আমি 'প্রেমের অভিষেক' কবিতাটি প্রথম কি ভাবে লিখেছিলুম। অত্যন্ত realistic বর্ণনা ছিল। থাকলে তোমরা দেখতে যে তোমাদের আধুনিক কবিরাই এর প্রবর্তন করেন নি। সেখানে একজন সামান্য গরীব কেরানী, তার নগণ্য জীবন সাহেবের তাড়া খেয়ে কাটে, কি-তু তার ঘরে যেখানে যে প্রেমিক, সেখানে সে আর সামান্য নয়, সেখানে সেই প্রধান। তাকে নিয়েই জগৎ। একচ্ছত্র সম্রাট সে সেই প্রেমের রাজ্যে। প্রথম দিকটায় সেই কেরানীর জীবনের কথা ছিল, তখন মনে হয় ভালই ছিল, কি-তু লোকেন এমন ধিক্কার দিলে যে দিলুম সে সব ছেঁটে।" কবির এই প্রসঙ্গ পরে আবার আনছি। সে দিন সকালে একটি দীর্ঘ কবিতা লিখলেন, বললেন, "এই ছিল আমাদের ছেলেবেলা"। প্রকৃতই ছেলেবেলার কাহিনী। সেকারণ পাহাড়ের চিত্রকল্প অনুপস্থিত। পরদিন আবার তিনি গদ্য ছন্দ সম্পর্কে বললেন, "দেখ আবার ওটা নিয়ে পড়েছি। গদ্য কবিতার বেলা ওই হয়, ওর একটা নির্দিষ্ট ছাঁচ নেই ব'লে ওই বার বার ঠিক করতে হয়, কোন শব্দটা হচ্ছে কোনটা হচ্ছে না। এ যদি মিলের ছন্দ হত তাহলে কি একটা নিয়ে এমন তিন দিন ধরে পড়তুম? তার একটা ছাঁচ আছে, তার মধ্যে পড়লে হু হু করে চলল, কি-তু এ তা নয়। এ যে কি, কেন যে এটা ঠিক হচ্ছে আর ওটা হচ্ছে না, তা স্পষ্ট করে বলতে পারব না যদি জিজ্ঞাসা কর।"

'এই ছিল আমাদের ছেলেবেলা' কবিতা অনুষঙ্গে এত কথা বলা হল। মংপুর নির্জন পরিবেশ পেয়েই কবি কবিতায় কথায় মশগুল।

২৩ এপ্রিল ১৯৪০ তারিখে তিনি শেষ অভিসার' নামে একটি কবিতা লিখলেন। 'সানাই' কাব্যে ঐ কবিতাটি স্থান পেয়েছে। এই কাব্যের মূল সুরের সঙ্গে কবিতাটির তাৎপর্য স্বীকার করতে হয়। কবি সৃষ্টি ও মানবসত্তার তত্ত্ব নিরূপণ করার চেষ্টা করেছেন। তিনি জীবন ও মৃত্যুর গভীর রহস্য থেকে সহজ ও স্বাভাবিক চিন্তা ও তার প্রয়োগ সম্পর্কে অতীব সচেতন হয়েছেন। গীতিকাব্যের ভঙ্গী ও সুর সানাই কাব্যে অনেকখানি ফিরে এসেছে। রবীন্দ্রকাব্যের জগৎ জীবনের সৌন্দর্য-মাধুর্য-প্রেমের যুগটি আবার দেখতে পাচ্ছি। বিদায় বেলায় সেই পুরাতন প্রেম ও মাধুর্যের স্মৃতিকে অপরূপ সুন্দময় হয়ে উঠেছে। "এলোচুলে অতীতের বনগন্ধ মেলিয়া' সেই অভিসারিকা আজ এসেছে পুষ্প অর্ঘ্য সাজিয়ে, কি-তু কবির তা গ্রহণ করবার কোন ক্ষমতা নেই।

হে দূতী, এনেছ আজ গন্ধে তব যে-ঝড়ের বাণী
নাম তার নাহি জানি।
মৃত্যু-অন্ধকারময়
পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে আসন্ন তাহার পরিচয়।
তারি বরমালাখানি পরাইয়া দাও মোর গলে
স্তিমিতনক্ষত্র এই নীরবের সভাঙ্গন তলে;
এই তব শেষ অভিসারে
ধরণীর পারে
মিলন ঘটায়ে যাও অজানার সাথে
অন্তহীন রাতে।

(শেষ অভিসার)

'শেষ অভিসার' কবিতায় প্রথম অংশে কবি প্রকৃতির একটি সুন্দর চিত্র তুলে ধরেছেন। একটা দুর্যোগের প্রাক মুহূর্তের কথা অবশ্যই। কিছু অংশ তুলে ধরা হ'ল :

"আকাশে ঈশান কোণে মসী পুঞ্জ মেঘ।
আসন্ন ঝড়ের বেগ
স্তব্ধ রহে অরণ্যের ডালে ডালে
যেন সে বাদুড় পালে পালে।
নিষ্কম্প পল্লবঘন মৌনরাশি
শিকার-প্রত্যাশী
বাঘের মতন আছে থাবা পেতে
রুদ্ধ হীন আঁধারেতে।"

পাহাড়ে ঝড়ের রূপ ভিন্ন পর্যায়ের। উদ্দাম, বল্গাহীন, যা নাকি সমতলের সঙ্গে মেলে না। এটা উপলব্ধির বিষয়। রবী-দ্রনাথের বর্ণনায় তার পরিচয় পাওয়া গেল।

কবি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে একটা চিঠি লিখছেন ৪.৫.৪০ তারিখে মংপু থেকে। এই চিঠিতে তিনি ড: সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। সামান্য অংশ তুলে ধরি, 'বাংলা সাহিত্যের

সমগ্র পরিচয়ের এমন পরিপূর্ণ চিত্র ইতিপূর্বে আমি পড়িনি। গ্রন্থকার তার বিবৃতির সঙ্গে সঙ্গে আলোচিত পুস্তকগুলি থেকে যে দীর্ঘ অংশ সকল উদ্ধৃত করে দিয়েছেন তাতে করে তাঁর গ্রন্থ একসঙ্গে ইতিহাস এবং সঙ্কলনে সম্পূর্ণ রূপ ধরেছে। সেই কারণে - এই গ্রন্থ ছাত্রদের প্রয়োজন সিদ্ধ করবে এবং সাহিত্য রস সন্ধানীদের পরিতৃপ্তি দেবে। এই গ্রন্থে সাহিত্যের ইতিহাস বাংলাদেশের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ইতিহাসের পটভূমিকায় বর্ণিত হওয়াতে রচনার মূল্য বৃদ্ধি করেছে। গ্রন্থকারকে আমার সকৃতজ্ঞ অভিনন্দন জানাই।"
নির্জন প্রকৃতিরাজ্যে থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন চিন্তায় মগ্ন। আসলে তাঁর জীবনের বহুরকম ধারার সন্নিবেশ ছিল। একসঙ্গে অনেকগুলি বিষয় ভাবতে পারতেন। কাজও করতে পারতেন।

রবীন্দ্রনাথের মধুর স্মৃতির ভাণ্ডার অনেক। 'জন্মদিন' কাব্যের অন্তর্গত ৫, ৬, ৭ ও ৮ সংখ্যক কবিতা এখানে এসে লেখা। এই কবিতাবলীর সঙ্গে কবির জীবনকথার অনেক মিল আছে। এই কাব্যে তিনি নিজের জন্মদিন উপলক্ষ্য করে বিশ্বসৃষ্টির বিপুল ধারা, নিজের অন্তরতম রহস্য ও অপরিমেয়তা, এই ধরিত্রীর সঞ্চয়ের মূল্য প্রভৃতি পর্যালোচনা করেছেন। এই সঙ্গে কবিকৃতির মূল্য সম্বন্ধে দুই একটি কবিতা আছে। কয়েকটি কবিতায় বিগত বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলায় কবিমনের প্রতিক্রিয়া রূপলাভ করেছে।

তিনি নিজের বয়স সম্পর্কে সচেতন। ৫ সংখ্যক কবিতায় তিনি নিজের জীবনের কথা ও বলছেন।

"জীবনের আশি বর্ষে প্রবেশিনু যবে,
এ বিস্ময় মনে আজ জাগে —
লক্ষ্য কোটি নক্ষত্রের
অগ্নি নির্ঝরের যেথা নিঃশব্দ জ্যোতির বন্যাধারা
ছুটেছে অচিন্ত্য বেগে নিরুদ্দেশ শূন্যতা প্লাবিয়া
দিকে দিকে,
অযোধন অন্তহীন সেই আকাশের বক্ষস্তলে
অকস্মাৎ করেছি উত্থান
অসীম সৃষ্টির যজ্ঞে মুহূর্তের স্ফুলিঙ্গের মতো
ধারাবাহী শতাব্দীর ইতিহাসে।"

৬ সংখ্যক কবিতায় কবি জন্মদিনের আগের দিনের কথা ব্যক্ত করেছেন। এখানে পাহাড়ের কথা শুধু নয়, সেখানকার অধিবাসীদের প্রসঙ্গ এনেছেন। তাঁর কল্যাণে তাঁদের

কল্যাণ, কবি তা উপলব্ধি করেছেন। বুদ্ধকে কবি স্মরণ করেছেন। সেই মানবের কথা স্মরণ করে নিজের জীবনের অপরাহ্ন বেলার কথা ভাবছেন। মনুষ্য জীবনকে ধন্য করে গেছেন গৌতম বুদ্ধ। কবি ঐ কারণেই নিজেকে ধন্য মনে করছেন, আশি বছর পূর্ণ এই সুন্দর পৃথিবীতে আসার জন্য। কবি বললেন :

'কাল প্রাতে মোর জন্ম দিন
এ শৈল আতিথ্যবাসে
বুদ্ধের নেপালী ভক্ত এসেছিল মোর বার্তা শুনে।
ভূতলে আসন পাতি
বুদ্ধের বন্দনামন্ত্র শুনাইল আমার কল্যাণে—
গ্রহণ – করিনু সেই বাণী।
এ ধরায় জন্ম নিয়ে যে মহামানব
সব মানুষের জন্ম সার্থক করেছে একদিন,"

এবার মৈত্রেয়ী দেবীর বর্ণনায় আসা যাক। তাঁর কথায়, "জন্মদিন এগিয়ে এল, আয়োজন চলছে, রথীদারা শীঘ্র আসবেন, উনি খুশি হয়ে অপেক্ষা করে আছেন। পঁচিশে বৈশাখের দু-তিন দিন আগে রবিবার এখানে উৎসবের বন্দোবস্ত হোলো। সকাল বেলা দশটার সময় স্নান করে কালো জামা কালো রঙের জুতো পরে বাইরে এসে বসলেন। কাঠের বুদ্ধ মূর্তির সামনে বসে একজন বৌদ্ধ স্তোত্র পাঠ করল। কবি ঈশোপনিষদ্ থেকে অনেকটা পড়লেন। সেই দিন দুপুরবেলা "জন্মদিন" বলে তিনটি কবিতা লিখেছিলেন, তার মধ্যে বৌদ্ধবুদ্ধের কথা ছিল। বিকেলবেলা দলে দলে সবাই আসতে লাগল, —আমাদের পাহাড়ী দরিদ্র প্রতিবেশী, সানাই বাজাতে লাগল, গেরুয়া রঙের জামার উপর মালা–চন্দনভূষিত আশ্চর্য স্বর্গীয় সেই সৌন্দর্য সবাই স্তব্ধ হয়ে দেখতে লাগল। ঠেলা চেয়ারে করে বাড়ির পথ দিয়ে ধীরে ধীরে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, দলে দলে পাহাড়ীরা প্রণত হয়ে ফুল দিচ্ছিল। প্রত্যেকটি লোক শিশু বৃদ্ধ সবাই কিছু না কিছু ফুল এনেছে। ওরা যে এমন করে ফুল দিতে জানে তা আগে কখনো মনে করিনি। তিব্বতীরা পরালো 'খর্দা' গাছের সুতোয় বোনা স্কার্ফ, যা ওরা লামাদের পরায়। ফুলে প্রায় আবৃত হয়ে গিয়েছিলেন। শঙ্খ ধ্বনির মধ্যে 'শিলাতলে' এসে বসলেন, তিব্বতী আর ভুটানীরা শুরু করলে তাদের জংলী তাণ্ডব নাচ।"

মৈত্রেয়ী দেবীর এই বর্ণনার সঙ্গে 'জন্মদিন' কাব্যের ৭ সংখ্যক কবিতাটির সাদৃশ্য লক্ষণীয়। পুরো কবিতাটিতে পাহাড়ী পরিবেশের কথা বিধৃত। কবি অবশ্যই জড়িয়ে আছেন, সর্বত্র।

"অপরাহ্নে এসেছিল জন্মবাসরের আমন্ত্রণে
পাহাড়িয়া যত।
একে একে দিল মোরে পুষ্পের মঞ্জুরি
নমস্কার সহ।
ধরণী লভিয়াছিল কোন ক্ষণে
প্রস্তর আসনে বসি
বহু যুগ বহ্নিতপ্ত পরে এই বর,
এ পুষ্পের দান,
মানুষের জন্মদিনে উৎসর্গ করিবে আশা করি।
সেই বর, মানুষের সুন্দরের সেই নমস্কার
আজি এল মোর হাতে
আমার জন্মের এই সার্থক স্মরণ।
নক্ষত্র খচিত মহাকাশে
কোথাও কি জ্যোতিষ্ক সম্পদের মাঝে
কখনো দিয়েছে দেখা এ দুর্লভ আশ্চর্য সম্মান।"

অনৈশ্চর্য জন্মদিনে পাহাড় পরিবেশে প্রাণের আনন্দ, আন্তরিকতা পেয়ে গেছেন। যা নাকি তিনি বাকী জীবনে পাবেন কিনা, সন্দেহ। তিনি একে "দুর্লভ আশ্চর্য সম্মান' বলে অভিহিত করছেন। একটি বিষয় অবশ্যই মনে করা যেতে পারে, কবি গৌতম বুদ্ধের কথা ভুলতে পারছেন না এবং তাঁর ভক্তের দল তাঁকে স্মরণ করছেন। স্বভাবতই কবি যেন সেই মহামানবের সময়ে চলে গেছেন এবং নিজেকে উপলব্ধি করছেন হিমশীতল সরল পাহাড়িয়াদের মধ্যে অবস্থান করে এবং তাঁদের শরিক হয়ে। এই কবিতায় একই সঙ্গে জীবন, প্রকৃতি পরিবেশ সমভাবে ধরা পড়েছে। তিনি মুক্ত স্ফূর্তভাবে তা প্রকাশ করেছেন। আর অতিথি পরায়ণা স্নেহার্দ্রা, মৈত্রেয়ী দেবী তা উপলব্ধি করেছেন, যা চরম সত্য এবং স্মৃতিময়।

এই বিশেষ উৎসবের মধ্যে একটা খারাপ খবর ছিল, এবং তা কবিকে জানানো হয়নি। জন্মদিনের পরের দিন সুধাকর বাবু বললেন, "একটা খারাপ খবর আছে।"

"খারাপ খবর, কি খারাপ খবর? সুরেনের অসুখ বেড়েছে?" কবি বললেন।

"তিনি আর নেই। কালকেই খবর এসেছে, অত লোকজনের মধ্যে বলিনি।"

"ভালোই করেছ, তাহলে আর যাত্রা ভুলতে পারতুম না।"

সকলে চলে গেলে, কবি চুপচাপ বসে রইলেন। অশ্রু সংবরণ করলেন। "মৃত্যু" নাম দিয়ে একটা কবিতা লিখিলেন। ইন্দিরা দেবীকে একটি চিঠিতে এই মৃত্যু সম্পর্কে লিখছেন:

বিবি মংপু

তোরা বোধ হয় জানিস আমার নিজের ছেলেদের চেয়ে সুরেনকে আমি ভালো বেসে ছিলুম। নানা উপলক্ষ্যে তাকে আমার কাছে টানবার ইচ্ছা করেছি বারবার, বিরুদ্ধ ভাগ্য নানা আকারে কিছুতেই সম্মতি দেয়নি। এইবার মৃত্যুর ভিতর দিয়ে বোধহয় কাছে আসব, সেইদিন নিকটে এসেছে। ইতি ৬।৪।৪০

রবিকাকা

সন্ধ্যেবেলা চুপ করে বসেছিলেন। অন্ধকার বারান্দা, কী অসীম ধৈর্য নীরবে বেদনা বহন করছিলেন, ওঁর মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল। একবার বললেন, "কেউ জানল না সে কী আশ্চর্য মানুষ ছিল। এমন মহৎ, এমন একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ সকলের দৃষ্টির আড়ালে ছিল, অগোচরেই চলে গেল, যারা জানে শুধু তারাই বুঝবে—এমন হয় না, এমন দেখা যায় না।"

এই প্রসঙ্গ ধরেই "জন্মদিনে" ৮ সংখ্যক কবিতাটি তুলে ধরা হল।

"আজি জন্ম বাসরের বক্ষ ভেদ করি
প্রিয় মৃত্যু বিচ্ছেদের এসেছে সংবাদ;
আপন আগুনে শোক দগ্ধ করি দিল আপনারে
উঠিল প্রদীপ্ত হয়ে।
সায়াহ্নবেলার ডালে অস্ত সূর্য দেয় পরাইয়া

রক্তোজ্জ্বল মহিমার টিকা,
স্বর্ণময়ী করে দেয় আসন্ন রাত্রির মুখশ্রীরে,
তেমনি জ্বলন্ত শিখা মৃত্যু পরাইল মোরে
জীবনের পশ্চিম সীমায়।

আলোকে তাহার দেখা দিল
অখণ্ড জীবন, যাহে জন্ম মৃত্যু এক হয়ে আছে;
সে মহিমা উদবারিল যাহার উজ্জ্বল অমরতা
কৃপণ ভাগ্যের দৈন্যে দিনে দিনে রেখেছিল ঢেকে।"

নীল নির্জনে বসে কবি সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা ভেবে চলেছেন। তাঁর বিচ্ছেদ ব্যথায় কাতর হয়ে পড়েছেন। তাঁর মত মহামানবের এই সময় অশ্রুপাত মানায় না। তাই নিজের ব্যথা নিজের কাছে রেখে দেন। এটাই তাঁর স্বভাব। দুঃখ বা ব্যথা কে আত্মস্থ করবার ক্ষমতা তাঁর ছিল।

'মংপুতে বসে কবি অরণ্যের ছবি আঁকছেন। মৈত্রেয়ী দেবীকে বলছেন, "এই নও, তোমাদের সুরেনের বন। তুমি যে ভাবো আমি একেবারে আঁকতে পারিনে, আমার ছবি লোকে দয়া করে ভালো বলে, তোমার সে ধারণাটা ভাঙতে হবে। কী চুপ করে যে? বলো না, কী আশ্চর্য কখন তা বলুম, বা ঐ জাতীয় একটা কিছু? অন্তত ভদ্রতা করেও তো বলতে হয়।"
সুরেনের বনের ছবি আঁকার মধ্যে কবির প্রকৃতির ভালবাসার চিত্র ফুটে উঠেছে।
রবীন্দ্রনাথ ২৫.১১.৪০ তারিখে একটা কবিতা লিখলেন, শান্তিনিকেতন থেকে, মৈত্রেয়ী দেবীর জন্যে। মৈত্রেয়ী দেবীর কথা তাঁর মনে পড়তেই মংপুর কথা মনে পড়েছে। তারই প্রভাব কবিতাটিতে পড়েছে। কবি শান্তিনিকেতন বনে ও পাহাড়ের চিত্র কাগজে কলমে আঁকছেন, কবিতায়।

নগাধিরাজের দূর নেবু নিকুঞ্জের
রস পাত্রগুলি
আনিল এ শয্যাতলে
জনহীন প্রভাতের রবির মিত্রতা।
অজানা নির্ঝরিণীর —
বিচ্ছুরিত আলোকচ্ছটার
হির-ময় লিপি

সুনিবিড় অরণ্য বীথির
নিঃশব্দ মর্মরে বিজড়িত
স্নিগ্ধ হৃদয়ের দৌত্য খানি ।
রোগ পঙ্কু লেখনীর বিরল ভাষার
ইঙ্গিতে পাঠায় কবি আশীর্বাদ তার ।

(আরোগ্য , ২২ সংখ্যক)

'মংপুতে রবী-দ্রনাথ ' গ্রন্থে রবী-দ্রনাথ এক জায়গায় মৈত্রেয়ী দেবীকে বলছেন , "চলার বড়ি বানাচ্ছি গো , চলার বড়ি । বুঝতে পারলে না ? সব জিনিসের সংক্ষিপ্ত অস্তিত্ব হচ্ছে বড়ি ভাবে , —তা আমি এই চেয়ারে বসে বসে পা নাড়াচ্ছি , এতে বসে বসেই চলার কাজ হচ্ছে । তুমি যতক্ষণ ভাঁড়ার ঘরের রাজত্ব সামলাচ্ছিলে আমি ততক্ষণে দু'চার মাইল বেড়িয়ে এলুম এই চেয়ারে বসে । একে বলা যায় চলার বড়ি । যাক এখন একটা কথা আছে —

সমতট পরিহরি কতকাল যাপরী , —
শৈল শিখর পরে লাফবি ঝাফবি ?
ফুল যুরতি যেন পদ্যে ও পদ্যে
শ্যামলিম্ সিনকোনা — কুঞ্জের মধ্যে ।
নির্জন গিরি শিরে বিরচিলি চম্পু
তারেই কি নাম দিলি মংপু ?

কবি এই সময় ভাষাবিদ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়-কে চিঠি লিখছেন । ঐ চিঠিতে পাহাড় পরিবেশের কথা অবশ্য উল্লেখ নেই । তবে অন্যক্ষেত্রে চিঠিটি উল্লেখযোগ্য ।

কল্যাণীয়েষু ,

কিছুকাল থেকে দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণতাবশত ছাপার বা লেখার অক্ষর পড়ে ওঠা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়েছে । তবু ডাক্তার সুকুমার সেনের রচিত 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের মুদ্রিত যে অংশটুকু আমার হাতে এসেছে ধীরে ধীরে তা আমি পড়ে শেষ করেছি । শেষ পর্যন্ত আমার উৎসুক্য জাগরূক ছিল । বাংলা সাহিত্যের সমগ্র পরিচয়ের এমন পরিপূর্ণ চিত্র ইতিপূর্বে আমি পড়িনি । গ্রন্থকার তার বিবৃতির সঙ্গে সঙ্গে আলোচিত

পুস্তকগুলি থেকে যে দীর্ঘ অংশ সকল উদ্ধৃত করে দিয়েছেন তাতে করে তাঁর গ্র-হ এক সঙ্গে ইতিহাসে এবং সঙ্কলনে সম্পূর্ণ রূপ ধরেছে । সেই কারণে এই গ্র-হ ছাত্রদের প্রয়োজন সিদ্ধ করবে এবং সাহিত্যরস স-ধানীদের পরিতৃপ্তি দেবে । এই গ্র-হে সাহিত্যের ইতিহাস বাংলাদেশের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ইতিহাসের পটভূমিকায় বর্ণিত হওয়াতে রচনার মূল্য বৃদ্ধি করেছে । গ্র-হকারকে আমার সকৃতজ্ঞ অভিন-দন জানাই ।

এই উপলক্ষে একটা কথা বলে রাখি । "বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা"র এক জায়গায় লেখা হয়েছে দিনে-দ্রনাথ আমার রচিত অনেকগানে সুর বসিয়েছেন - কথাটা সম্পূর্ণই অমূলক । এই মিথ্যা জনশ্রুতি ইতিপূর্বেও অন্যত্র ছাপার অক্ষরে দেখেছি । মুখে মুখেও অনেকে চালনা করেন ।

অমিয় বলছিলেন আমার সঙ্গে সায়াসে ভ্রমণকালে তোমার খাতায় যে সকল তন্ন তন্ন বিবরণ জমিয়েছ তা প্রচুর এবং প্রকাশ যোগ্য । এগুলি হাতের অক্ষরে অন্ত : পুরে অবশুণ্ঠিত না থাকাই শ্রেয় মনে করি ।

ইতি ৪।৫।৪০

তোমাদের

রবী-দ্রনাথ ঠাকুর

কবি ৭ মে ১৯৪০ কালিম্পঙ ফিরলেন ।

।। উল্লেখপঞ্জী ।।

১. রবী-দ্র রচনাবলী-জ-মশতবার্ষিক সং —২৫ বৈশাখ ১৩৬৮ দশম খ-ড পৃ ৩৯

২. তদেব - পৃ: ১০০

৩. "আমি সেই দিনই সমস্ত মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ন নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ লিখিলাম । একটি অপূর্ব (অভূতপূর্ব) অদ্ভূত হৃদয়স্ফূর্তির দিনে "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" লিখিয়াছিলাম কি-তু সেদিন কে জানিত এই কবিতায় আমার সমস্ত কাব্যের ভূমিকা লেখা হইতেছে ।" প্রথম পা-ডুলিপি , দ্র.জীবনস্মৃতি ১৭।৩১৬ , পাদটীকা

৪. রবী-দ্ররচনাবলী —জ-মশতবার্ষিক সং ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮ দশম খ-ড পৃ: ১০১

৫. রবী-দ্র রচনাবলী - জ-মশতবার্ষিক সং ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮ প্রথম খ-ড পৃ: ৫১

৬. রবি জীবনী —প্রশা-তকুমার পাল- আন-দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড , কলকাতা-৯ প্রথম সংস্করণ , ১ বৈশাখ ১৩৯৪ - তৃতীয় খ-ড পৃ: ৭৩

৭. Robert Browning (B. 7 May, 1812, d. 12 Dec. 1889) A Blot in the 'Scutcheon (Part V of Bell and Prome. granates, 1843) A tragedy এই নাটক সম্বন্ধে চার্লস ডিকে-স লিখেছেন , " It is full of genius natural and great thoughts. I know nothing that is so affecting - nothing in any book I have ever read. " - E. Bevdoe. The Browning Cyclopaedia, 1892, P. 82-85.

৮. রবী-দ্ররচনাবলী জ-মশতবার্ষিক সং ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮ ত্রয়োদশ খ-ড পৃ: ৬১৭

৯. ১৮৮৭ সালে দার্জিলিঙ থাকার সময়ে রবী-দ্রনাথ 'মায়ার খেলা 'র গানগুলি লিখতে শুরু করেছিলেন , বৎসরাধিককাল পরে অভিনয়ের প্রাক্কালে অভিনয়পত্রী হিসেবে সেটি পু-স্তকাকারে প্রকাশিত হল ; বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তকতালিকা অনুযায়ী প্রকাশের তারিখ 22 Dec 1888 (শনি ৮ পৌষ) পৃষ্ঠা সংখ্যা : (২) 'বিজ্ঞাপণ ' ও 'সংক্ষিপ্ত ' আখ্যায়িকা ' । ৵ ৬৪ ।"

১০. 'দারজিলিং ' ভারতী ও বালক , জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫ । ১৬

১১. ভারতী , বৈশাখ ১৩০৫ , গল্প গুচ্ছ - সপ্তম খ-ড পৃ: ৩৩৫ জ-মশতবার্ষিক সংস্করণ

১২. চিঠিপত্র ১ । ১৪—১৫ , পত্র ৪৫

১৩. The Calcutta Municipal Gazette - Tagore Memorial Special suppliment - The Calcutta Municipal Corporation May,1986 P.98.

১৪. রবী-দ্র রচনাবলী - জ-মশতবার্ষিক সং ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮ তৃতীয় খ-ড পৃ: ১৮

১৫. অদেব পৃ: ৪১

১৬. অদেব , পৃ: ২৪১

১৭. রবী-দ্ররচনাবলী - জ-মশতবার্ষিক সং ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮ দ্বিতীয় খ-ড , পৃ: ৭১২

১৮. অদেব পৃ: ৫৩৭

১৯. রবী-দ্র রচনাবলী - জ-মশতবার্ষিক সং ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮ চতুর্থ খ-ড পৃ: ৩৩৩

২০. রবী-দ্ররচনাবলী - জ-মশতবার্ষিক সং ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮ দ্বিতীয় খ-ড পৃ: ৮২৫

২১. রবী-দ্ররচনাবলী - জ-মশতবার্ষিক সং ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮ সপ্তম খ-ড পৃ: ৮৫৭

২২. অদেব পৃ: ৭৫৫

২৩. ২৫ বৈশাখ ১৩১৭ । যদুনাথ সরকার কে লিখছেন , "আপনার প্রেরিত বইগুলিও পত্র কিছুকাল হইল পাইয়াছি ।.....'রাসমালা' পড়িতে আরম্ভ করিয়াছি ।..... অক্সিত ম্যাজেস্টার বৃত্তি পাইয়া আগামী সেপ্টেম্বর (১৯১০) অক্সফোর্ড যাত্রা করিবেন ।' প্রবাসী , ফাল্গুন ১৩৫২ , পৃ: ৩৯০ ।

রাসমালা । Rasamala : Hindu Annals of the Province of Goozerat in Western India by Alexander Kinloch Forbes,1856. Edited with historical notes and appendices by H.G.Rawbinson, Oxford,Vols. I,II. 1924. Original illustrations, bibliography, Map.

রবী-দ্রনাথ প্রথম সংস্করণ যদুনাথ সরকারের কাছ থেকে পেয়েছিলেন ।

২৪. কলকাতায় রচিত "তোরা শুনিস নি কি', ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ । গীতাঞ্জলি ৬২ ।

২৫. চিঠি : বিময় - জীবনকে সত্য , মহৎ , পবিত্র ও ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে উপদেশ ও আশীর্বাদ । পত্রাবলী - ৪ ।। শারদীয়া 'দেশ' পত্রিকা - ১৩৬৫ পৃ: ৭৮

২৬. অনুবাদচর্চা : রবী-দ্রভাবনা—বিজিতকুমার দত্ত - কথা সাহিত্য শারদীয় ১৩৮৭ পৃ: ১৪৭

২৭. রবী-দ্রভবনে রক্ষিত প্রতিলিপি

২৮. "মংপুতে -রবী-দ্রনাথ "—মৈত্রেয়ী দেবী পরিবর্ধিত সংস্করণ ২৫ বৈশাখ ১৩৬৪ পৃ: ৭

২৯. রবী-দ্র রচনাবলী - জ-মশতবার্ষিক সং প্রথম খ-ড পৃ: ৬১৮

৩০. এই পরিবেশে তাঁরা প্রত্যেকেই খুব খুশী। অনিলকুমার চন্দ এই মায়াময়, সুন্দর পরিবেশ সম্পর্কে লিখেছেন: Another great thing; it has no Cinema here and meritricious posters of scantily draped Cinema stars do not obtrude upon you as you go out for a walk. What a relief! (A letter from Kalimpong. A. K. C. Visva Bharati News, June, 1938).

৩১. সুধীরচন্দ্র করকে কবি তেইশে বৈশাখ যে চিঠি লেখেন, তার একাংশে আছে: প্রত্যেক পর্যায়ের গান সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করতে বলেছি। ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ের শিরোনামা দেওয়া সম্ভব হয় নি, অথচ ইঙ্গিতে তাদের ভিন্নতা রক্ষিত হয়েছে। সংখ্যামালার পরিবর্তনে পর্যায়ের পরিবর্তন নীরবে নির্দিষ্ট হতে পারবে—ভাবুক লোকের পক্ষে সেই যথেষ্ট।

৩২. মধুসূদনের চিঠি ইংরেজিতে লিখিত, সে জন্যে তাঁর পত্রমালা বাংলা সাহিত্যের উদাহরণ স্থল নয়; বঙ্কিম চন্দ্রের সাহিত্যিক গুণ-সমন্বিত চিঠিপত্রের সন্ধানও অজ্ঞাত; ফলে রবীন্দ্রনাথের চিঠিতেই বাংলা পত্রসাহিত্যের সূচনা।

৩৩.

উৎসর্গ

ডাক্তার সার নীলরতন সরকার

বন্ধুবরেষু

অন্ধতামসগহ্বর হতে
ফিরিনু সূর্যালোকে।
বিস্মিত হয়ে আপনার পানে
হেরিনু নূতন চোখে।
মর্তের প্রাণরঙ্গভূমিতে
যে-চেতনা সারারাতি
সুখ দুঃখের নাট্যলীলায়
জ্বেলে রেখেছিল বাতি
সে আজি কোথায় নিয়ে যেতে চায়
অচিহ্নিতের পারে,
নব প্রভাতের উদয়সীমায়
অরূপ লোকের দ্বারে।

৩৪. কবিকণ্ঠে জন্মদিনের কবিতা বেতারে প্রচার করবার জন্যে বেতার কর্তৃপক্ষ খুব তৎপর হয়েছিলেন। এই বিশিষ্ট অনুষ্ঠান প্রচারের জন্যে শান্তিনিকেতনে টেলিফোন লাইন প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছিল। কবি কালিম্পঙ চলে গেলে সমস্ত আয়োজন পাহাড়ী উপত্যকায় স্থানান্তরিত হয়।

৩৫. সুকুমার সেন তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস'এ উল্লেখ করেছেন অপরাজিতা দেবী ছদ্ম নামে রাধারানী দেবীই কবিতা লিখতেন।

৩৬. রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি আপিলের দুটি খসড়া বয়ান রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে ছিলেন। ঐ দুটি তুলে ধরা হল।

Gouripur Lodge,
25.6.28. Kalimpong.

The growing infirmity of my age compels me at last to appeal to the public kindly to release me from the responsibility of correspondence and numerous other claims causing constant strain upon my body and mind when they urgently need rest.

Rabindranath Tagore.

কিম্বা

The constant strain of attending to my correspondence is growing too painful for the present state of my health which, at last, compels me to appeal to the public kindly to relieve me of this burden of responsibility and to excuse me if I claim a much needed rest for the few days that still remain to me.

৩৭. 'নির্বাণ' বিশ্বভারতী ১৯৪৩ পৃ: ১২

৩৮. 'চিত্রভানু' রবীন্দ্রনাথের বাড়ী বলে অনেকের ধারণা। তা নয়। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল, তাঁর মৃত্যুর পর এটা তৈরী হয়। প্রতিমাদেবী শেষ বয়সে গ্রীষ্মে এসে এখানে থাকতেন। এই বাড়ীর জমি লীজ নেওয়া হয়েছিল। তার তথ্য নিম্নরূপ :

থানা	:	কালিম্পঙ
মৌজার নাম	:	কালিম্পঙ টাউন খাসমহল
তৌজি নম্বর	:	১০৮০

নীজ গ্রাহক	:	শ্রীমতী প্রতিমা দেবী শ্রী রথী-দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী পো: শান্তিনিকেতন বীরভূম ।
ম্যাপে ও খসড়ায়		
প্লট নম্বর	:	এইচ ১২১
পাট্টার তারিখ	:	১২.৩.৪২
বর্তমান নীজের		
সময়কাল	:	১.১.১৯৪২ থেকে ১০ বৎসর
আদেশের তারিখ	:	১৫.১১.৪১
অধিকার	:	১.১.৪২ থেকে
জমির শ্রেণী	:	প্রথম শ্রেণী
জমির পরিমাণ	:	এক একর (প্রথমে) .৭৮ একর (১৯৫০ ? এর ধসে জমির ক্ষতির পর)
বার্ষিক খাজনা	:	১৫০.০০ টাকা(এক একরের জন্য) ১১৭.০০ টাকা(.৭৮ একরের জন্য দার্জিলিঙের ডেপুটি কমিশনারের আদেশ অনুসারে)
সেলামী	:	২০০০.০০ টাকা এই টাকা মোট তিনটি কিস্তিতে দেওয়া হয় ।
প্রথম কিস্তি	:	২০.১২.৪১. —১০০০.০০ টাকা
দ্বিতীয় কিস্তি	:	৮.১.৪২. - ৫০০.০০ টাকা
তৃতীয় কিস্তি	:	১২.১.৪২. —৫০০.০০ টাকা

এই তথ্যের ভিত্তিতে বোঝা যায় প্রতিমা দেবী 'চিত্রভানু'র সঙ্গে অধিক জড়িত এবং তাঁকে কে-দ্র করেই সব আয়োজন । এই বাড়ি ও জমির সঙ্গে রবী-দ্রনাথের কোন সম্পর্ক ছিল না । এই বিষয়ে সব পরিকল্পনা ও রূপায়ন কবির মৃত্যুর পর হয় । প্রতিমাদেবী জড়িয়ে আছেন বলেই রবী-দ্রনাথের নাম ওখানেই আছে ।

তবু কালিম্পঙে রবী-দ্র-স্মরণিকা বলতে 'চিত্রভানু'কে সকলেই মনে করেন ।